বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান

(The Contribution of Maolana Karamat Ali Zawnpuri (R.) to preaching and spread of Islam and to remove religious superstition in Bangladesh**)**

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন
রেজি. নং-১৫২/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান" (The Contribution of Maolana Karamat Ali Zawnpuri (R.) to preaching and spread of Islam and to remove religious superstition in Bangladesh) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

.....

(মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন)
রেজি.নং- ১৫২/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান" (The Contribution of Maolana Karamat Ali Zawnpuri (R.) to preaching and spread of Islam and to remove religious superstition in Bangladesh) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যত্র ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

.....

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যার একান্ত মেহেরবাণীতে আমি আমার "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান"
(The Contribution of Maolana Karamat Ali Zawnpuri (R.) to preaching and spread of Islam and to remove religious superstition in Bangladesh) শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। অগণিত দুরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে আজমাঈন, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনসহ কিয়ামত পর্যন্ত যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তার অনুসরণ করবেন তাদের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন স্যারের প্রতি। যিনি আমাকে হাতে-কলমে গবেষণাকর্ম শিখিয়েছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে তিনি আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন। তার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। যিনি নিরলস সময় ব্যয় করে এ অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে তা প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি, অধ্যায় বিন্যাস এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তারই আন্তরিক সহযোগিতায়।

এছাড়া আমি মরহুম অধ্যাপক আব্দুল মালেক, অধ্যাপক ড. আ. র. ম আলী হায়দার, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাকি, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল লতিফ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফিক আহমদ, অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদ আলম, বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম এবং সকল শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা জনাব মরহুম মোঃ আবদুর রহমান ও মমতাময়ী মা হাসিনা আক্তারকে। তাদের দু'আ আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে রয়েছে। সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তাদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমন এক স্মরনীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার পিতার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি। পাশাপাশি আমার বৃদ্ধ মাতার সুস্থ্য, সুন্দর এবং দীর্ঘ নেক হায়াত প্রত্যাশা করছি পরম করুনাময়ের নিকট।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহধর্মিণীকে যার অকৃত্রিম ত্যাগ, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা আমার এ গবেষণাকর্মকে সুন্দর করেছে। আমার গবেষণাকর্ম নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে তার ত্যাগ অতুলনীয়। আমার একমাত্র মেয়ে নাখলু জাতুল আকমাম, সে আমার কাজকে গতিশীল এবং সাবলীল করার ক্ষেত্রে প্রায়শই পিতৃস্নেহ থেকে নিজেকে দূওে সরিয়ে রেখেছে, আমার এ গবেষণা কাজটি তার কাছেও কৃতজ্ঞতাবদ্ধ।

গবেষণা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন বই ও সাময়িকী অনুসন্ধানের জন্য আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধরনের লোকের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়েছি। বিশেষত আমি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)-

এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও উত্তরাসূরীগণ এবং তার গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ী অনুসারী পরম্পরার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের একান্ত সহযোগিতা ছাড়া আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন দুঃসাধ্য হতো। সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, আল আরাফা ইসলামি ব্যাংক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রতি যারা আমাকে হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

- মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا =অ/আ	غ = গ
ب = ব	ف = ফ
ت = ত	ق = ক্ব/ক্
ث = স	ك = ক
ج = জ	ل = ল
ح = হ	م = ম
خ = খ	ن = ন
د = দ	و = ও/ব
ذ = য	ه = হ
ر = র	ء = ’
ز = য	ي = য়
س = স	
ش = শ	
ص = স	
ض = দ/য	
ط = ত	
ظ = য	
ع = ‘	

বি.দ্রঃ

> উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন কোন বানান বাংলা ভাষায় বেশি প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

> যেসব আরবি শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুর'আন, ১০:২০	প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
আ.	আলায়হিস্ সালাম
খ্রি.পূ	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
(র.)/(র.)	রহমাতুল্লাহ আলায়হি
(রা.)	রাদিয়াল্লাহু আনহু/ 'আনহুম/'আনহা/'আনহুমা/'আনহুন্না
(স.)/ (স.)	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
ইমাম বুখারী	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবু দাউদ	আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশ আশ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ
ইমাম ইবন মাজাহ	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইবন হাম্বল
ইবন কাছীর	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবন কাসীর
ইমাম ত্বাহাবী	আবু জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী
ইবন জারির	আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী
কুরতুবী	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবু বকর ইবন ফাররাহ আল-কুরতুবী
তাবারানী	আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমদ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইবন হুসায়ন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন 'উসমান আয-যাহাভী
রাযী	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসায়ন ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তা.বি	তারিখ বিহীন
ed.	Ediotor(s) /Edited
Ibid.	Ibidem
N.D	No Date.
Op.ci.	Opera citato
P. pp	page/ pages.
Vol.	Volume(s)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা		
প্রথম অধ্যায়	ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কুরআন সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা	০-১
	'দা'ওয়াহ্' এর আভিধানিক অর্থ	১-২
	'দা'ওয়াহ্' এর পারিভাষিক অর্থ	৩-৪
	ইসলাম প্রচারে আল কুর'আনের নির্দেশনা	৫-১০
	ইসলাম প্রচারে রাসূলের নির্দেশনা	১১-২১
	একজন প্রকৃত দাঈ এর গুনাবলি	২১
	ঈমানদার হওয়া	২১-২৩
	নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার	২৪-২৫
	বিনয় ও কোমলতা	২৫-২৬
	আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য	২৬-২৭
	উত্তম চরিত্র	২৭-২৯
	হিজরত তথা নাফরমানী পরিত্যাগ করা	২৯
	বুদ্ধিমত্তার সাথে কার্য সম্পাদন করা	২৯-৩১
	আল্লাহভীতি ও ইখলাস	৩১-৩৪
	আমানত প্রবণতা	৩৪-৩৫
	শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা	৩৫-৩৮
	ধৈর্য ও সংযম	৩৮-৪০
	ক্ষমা	৪০-৪৩
	সত্যবাদিতা	৪৩-৪৪
	স্নেহশীলতা ও দয়া	৪৪-৪৫
	দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি	৪৫
	সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্তে পৌছার সামর্থ	৪৬
	আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালবাসা	৪৬-৪৭
	জিহাদি চেতনা	৪৭-৪৮
	পরামর্শের মনোবৃত্তি	৪৮
	ছিদ্রান্বেষণ না করা	৪৯-৫০
	সৎকাজের সহযোগিতা করা	৫০-৫১
	প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা	৫১
	সালাম দেয়া	৫১-৫৩
	আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা	৫৩-৫৪
	প্রতিবেশির হক আদায় করা	৫৪-৫৫
	সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা	৫৫-৫৬
	মেহমানের সমাদর করা	৫৬-৫৭

	ত্যাগের মানসিকতা	৫৭-৫৯
	নবি ও রাসূলগণের দাওয়াত	৬০-৬২
দ্বিতীয় অধ্যায়	তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার	৬৩
	বিদ'আতের পরিচয়	৬৩-৬৫
	মাওলানা সাহেবের সময়ে প্রচলিত কিছু বিদ'আত	৬৫-৬৭
	বর্তমান সমাজে প্রচলিত আরো কিছু কুসংস্কার	৬৭-৭১
তৃতীয় অধ্যায়	কুসংস্কার দূরীকরণে শরয়ী নির্দেশনা	৭২
	বিদ'আতের বিরুদ্ধে কুর'আনুল কারিম	৭২-৭৪
	বিদ'আতের বিরুদ্ধে রাসূল (স.) এর হাদিস	৭৫-৭৮
	বিদ'আতের বিরুদ্ধে সাহাবি-তাবিয়ীগণের বক্তব্য	৭৯-৮৩
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলায় ইসলামের আগমন	৮৪
	ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের আগমন	৮৪-৮৯
	ইসলামের বাণী প্রচারে মুসলিমদের আগমন	৮৯-১০০
	দেশ জয়ের জন্য আগমন	১০১-১১২
পঞ্চম অধ্যায়	মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর পরিচিতি	১১৩
	হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) সাহেবের শুভ জন্ম	১১৩-১১৪
	নসবনামা (বংশ পরিচিতি)	১১৪-১১৫
	শাজরানামা (খেলাফত নামা)	১১৫
	শৈশবকাল	১১৫-১১৬
	প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বভাব	১১৬
	বিদ্যা শিক্ষা	১১৭
	ইলমে তাজবীদের চর্চা	১১৭
	ফনে কিতাবাত বা লিখন কৌশল	১১৭-১১৮
	সৈনিক বিদ্যা	১১৮-১২০
	রায়বেরেলি গমন এবং সৈয়দ সাহেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ	১২০-১২২
	জৌনপুরের জামে মসজিদের আবাদী ও পবিত্রতা	১২২-১২৪
	হানাফী মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন	১২৪-১২৫
	আলী হতে কারামত আলী হওয়ার কারণ	১২৫-১২৮
	মাওলানা সাহেবের ওপর জীবন নাশমূলক আক্রমণ	১২৮-১২৯
	মাওলানা সাহেবের একটি প্রকাশ্য কারামত	১২৯
	১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ	১২৯-১৩১
	হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তিতে সমর্থন	১৩১
	মাওলানা সাহেবের লিল্লাহিয়াতের একটি মিসাল (উপমা)	১৩১-১৩২
	একজন অশিক্ষিত লোকের শুভ ধারণা	১৩২-১৩৩
	শত্রুদের একটি ধোকা	১৩৩-১৩৪

	সাধারণভাবে বোধগম্য হওয়া দলিলের একটি উদাহরণ	১৩৫
	জৌনপুর প্রত্যাবর্তন	১৩৫-১৩৬
	মাওলানা সাহেবের ইন্তেকাল, একটি বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান	১৩৬-১৩৭
	ছেলে মেয়েদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৩৮-১৪০
	মাওলানা সাহেবের আকৃতি, শারীরিক গঠন	১৪০
	অভ্যাস ও স্বভাব	১৪০-১৪১
	মাওলানা সাহেবের 'সনদের' বর্ণনা	১৪১
	হযরত সৈয়দ সাহেবের ফযিলত সম্বন্ধে মাওলানা সাহেবের উক্তি সমূহ	১৪২-১৪৬
	সৈয়দ সাহেবের হানাফী মাযহাবলম্বী হওয়ার বিষয়ে মাওলানা সাহেবের মতামত	১৪৬-১৪৭
	তরিকায়ে মোহাম্মদীয়ার বিষয়ে মাওলানা সাহেবের মতামত	১৪৭-১৪৯
	তাকবিয়াতুল ঈমান নামীয় কিতাব সম্বন্ধে মাওলানা সাহেবের মতামত	১৪৯-১৫০
	মাওলানা সাহেবের খলিফাগণের বিবরণ	১৫০-১৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান	১৫৪
	হেদায়েতের উদ্দেশ্যে মাওলানা সাহেবের বাংলাদেশ ভ্রমণ	১৫৪-১৫৬
	যুক্তিতর্ক (বাহাস) এর মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলন	১৫৬-১৬০
	ভ্রাম্যমান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা	১৬০
	ধর্ম প্রচারক দলের জন্য বিভিন্ন বোট	১৬০-১৬১
	বিদ'আতিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৬২-১৬৪
	ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস' প্রসঙ্গে	১৬৪-১৬৬
সপ্তম অধ্যায়	বাংলাদেশী মুসলিমদের মাঝে কুসংস্কার দূরীকরণে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান	১৬৭
	বাংলা ও আসামের বিশৃংখল অবস্থা	১৬৭-১৬৯
	নোয়াখালী ভ্রমণ ও সেখানকার লোকদের অবস্থা	১৬৯-১৭০
	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা	১৭০-১৭১
	জুম'আর সালাত অমান্যকারীগণ	১৭১-১৭৩
	খারেজিদের বিবাদ এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস	১৭৩-১৭৪
	উলঙ্গ আসামবাসীদেরকে কাপড় দান	১৭৪-১৭৫
	মাওলানা সাহেবের প্রথম ভ্রমণ বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে আঠার বছর পর্যন্ত ছিল	১৭৫-১৭৬
	সুফিবাদ	১৭৬-১৭৭
অষ্টম অধ্যায়	ওয়ায-নসীহত ও লেখালেখিতে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)	১৭৮
	মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর লেখনী শক্তি	১৭৮-১৭৯
	মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহ	১৭৯-১৮২
	অজিফা সমূহ	১৮২-১৮৩
	নসীহত সমূহ	১৮৩-১৮৪
উপসংহার		১৮৫-১৮৬
গ্রন্থপঞ্জি		১৮৭-১৯১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের মহান অধিপতি, পরম করুণাময় এবং দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি। যিনি এ বিশ্বজগতকে সুনিপুনভাবে সৃষ্টি করত সেখানে তার প্রিয় বান্দা এবং বন্ধু রাসূলে আকরাম (স.) কে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর মানবজাতিকে তার প্রতি অসংখ্য দুরুদ ও সালামের ধারাবাহিকতা রক্ষার পথ বলে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সাহাবিগণ (রা.), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, সালফে সালেহীন, উলামায়ে হক্কানীয়ীন(র.) বিশেষত ইলমে তাসাউফ চর্চার অন্যতম প্রবাদ পুরুষ, অক্লান্ত সাধক, কঠোর অধ্যবসায়ী, ত্যাগ তিতীক্ষার মূর্ত প্রতীক, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণে অগ্রনায়ক মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর প্রতি। তিনি রংপুরের গর্ব। বাংলার জনসমাজে কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন, সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলার মানুষকে। এ জন্য তাকে হাদীয়ে বাঙাল বলা হয়। তিনি বাংলায় 'মাওলানা সাহেব' হিসেবেও পরিচিত।

তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। সুশৃঙ্খল, সুপরিকল্পিত এবং সুদূরপ্রসারী একটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে একজন উত্তম সংগঠক ছিলেন। তার লেখা বইগুলোর একটি ছিলো পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কীয়। ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারে, মানুষের মধ্যে সমাজের মূল্যবোধ, চেতনা জাগিয়ে তুলতে তার অবদান ছিলো অসামান্য। তিনি শুধু আধ্যাত্মিকতার জগতেই মহান ছিলেন না, মহান ছিলেন সমাজের প্রতি তার অপরিসীম চেতনাবোধও।

তিনি শুধু মানুষের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোই বিতরণ করেননি বরং বস্ত্রহীন মানুষকে বিনা মূল্যে পোশাক বিতরণ করে কাপড় পড়ার মাধ্যমে সভ্য হতে শিখিয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পবিত্র কুর'আনুল কারিমের অমোঘ বাণী- "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন : "তোমরা তোমাদের প্রয়াত ব্যাক্তিবর্গের সুন্দর আচরণগুলো স্মরণ কর" এছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন, যে আমার কোন কথা (হাদিস) শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবে অন্যজনের কাছে পৌছে দিয়েছে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, মূল হাদিস শ্রবণকারীর চেয়ে যাদের কাছে বর্ণনা করা হয়, তাদের অনেকে বেশি বোধ সম্পন্ন ও সংরক্ষণকারী হন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সাহাবাগণ ইসলামের প্রথম যুগে অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেও দ্বীন ইসলামের প্রচার থেকে বিরত থাকেননি। রাসূল (স.) নিজেও দাও'য়াতি কাজে তায়েফের মাটিতে রক্তাক্ত হয়েছেন। অবস্থাদৃষ্টে তিনি কতিপয় সাহাবিকে হিজরতেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূল (স.)-এর পরবর্তী যুগে যেসব অলি আউলিয়া ইসলাম প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন, তাদের উপরও দমন পীড়ন চলেছে নির্বিচারে। এরকম অসংখ্য অলি আউলিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্ঠার ফল আমাদের আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ও আসামে ইসলামের তাবলিগ-প্রচারে বিখ্যাত পীর মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তার জবান ও কলম দ্বারা যে বলিষ্ঠভাবে জিহাদি ভূমিকা পালন করেন, এদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তা এক স্বতন্ত্র

অধ্যায়রূপে পরিগণিত হয়। তার সমগ্র জীবনের ৭৫ বছরের ৫১ বছরই তিনি ইসলাম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। এ গোটা সময়টাই তিনি শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন এবং অসংখ্য লোক এ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তিনি তার ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বারা বাংলার মানুষের মাঝে ইসলামের অনন্য স্বাদ আস্বাদনের সুসংবাদ পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে মুসলিম ঐতিহ্যকে ভুলতে বসা এক জাতিকে তিনি নতুন আলোর দিশা দিয়েছিলেন। তার জ্বেলে দেয়া সেই আলোর প্রভাবেই বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ আমাদের বাংলাদেশ। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এখনো বাংলার আনাচে কানাচে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর শ্রম, ঘাম ও নিষ্ঠার চিহ্ন রয়ে গেছে প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে।

বস্তুতপক্ষে, সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীনচিত্তে রুখে দাড়ানো, সমাজের সর্বত্র গজিয়ে উঠা ভন্ড পীর নামক বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটনকারী, অন্যায় অবিচার ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন এ মহৎ ব্যক্তির জীবন ও কর্ম বিশদ পর্যালোচনার মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য তার অবদানসমূহ তুলে ধরার উদ্দ্যেশেই আলোচ্য অভিসন্দর্ভের রচনা।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কুর'আন সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন নিজেকে দাওয়াতি কাজের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এমনকি এ কাজে নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর অশেষ রহমতে ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশ ও আসামে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এজন্য এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামি দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করব।

'দা'ওয়াহ্' এর আভিধানিক অর্থ

দা'ওয়াহ্ (دعوة) আরবি শব্দ। এর বহুবচন হলো (دعوات) এবং مادة হলো (د-ع-و)অর্থ ডাক, আহ্বান, আমন্ত্রণ, অনুরোধ, নিমন্ত্রণ, প্রচার ইত্যাদি।[১]

"দাওয়াত (দা'ওয়াহ নামেও পরিচিত; আরবি: دعوة 'আমন্ত্রণ') অর্থ ধর্মপ্রচার বা ইসলামের প্রচার। দাওয়াত এর আক্ষরিক অর্থ হল একটা সমন জারি করা বা একটি আমন্ত্রণের কাজ করা, এটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হওয়ার কারণে বিভিন্ন অর্থ বোঝায়-ডাকা বা আহ্বান করা, যার ক্রিয়ামূল হচ্ছে (د-ع-و)। একজন মুসলিম যিনি দাওয়াতের কাজ করেন, একজন ধর্মীয় কর্মী হিসাবে বা স্বেচ্ছাসেবী সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা হিসাবে, যেভাবেই হোক তাকে বলা হয় একজন দা'ঈ।"[২]

A Dictionary of Modern Written Arabic এ দা'ওয়াতের অর্থ লেখা হয়েছে-Call, Appeal, demand, request, Convocation.[৩]

ড. আব্দুল খালিক বলেন :

"দা'ওয়াহ্' শব্দের অর্থ হলো কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসা।"[৪]

পবিত্র কুর'আনে 'দা'ওয়াহ্' শব্দের বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। যেমন:

- আহ্বান করা। যেমন পবিত্র কুর'আনে এসেছে-

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا-

"রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গন্য করো না।"[৫]

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮)

২. উইকিপিডিয়া

৩. J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (বৈরুত : মাকতাবাতু লিবানান-১৯৭৪)

৪. ড. আব্দুল খালিক, *আহাম্মিয়াতদ-দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ ফিল ইসলাম* (কায়রো : মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৩), পৃ.৬

৫. আল-কুর'আন, ২৪:৬৩

- দু'আ করা। যেমন-

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"[৬]

- কোন মত বা পথের দিকে আহ্বান করা। তা ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। যেমন-

وَ یٰقَوْمِ مَا لِیْۤ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَ تَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَى النَّارِ-

"হে আমার সম্প্রদায়, কী আশ্চর্য, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহ্বান কর অগ্নির দিকে।"[৭]

- প্রার্থনা করা। যেমন-

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ-

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।"[৮]

- শেষ বিচারের দিবসে মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে উঠার আহ্বান করা। যেমন-

ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ-

"অতঃপর তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্য তোমাদের ডাক দিবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।"[৯]

কুর'আনের মত হাদিসেও এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন:

- দু'আ অর্থে-

"তুমি নিপীড়িতের দু'আ সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।"[১০]

- মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করার অর্থে-

" তাদেরকে তুমি এ কথার দা'ওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"[১১]

- কখনও কারো বাড়িতে আপ্যায়ন করার অর্থে-

"কেউ দা'ওয়াত করলে তা গ্রহণ করা।"[১২]

---

৬. আল-কুর'আন, ৪০:৬০

৭. আল-কুর'আন, ৪০:৪১

৮. আল-কুর'আন, ২:১৮৬

৯. আল-কুর'আন, ৩০:২৫

১০. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ্ ইবন বারদিযবাহ্ আল-বুখারী, *সহীহ্ আল বুখারী* , অনু: হুসাইন বিন সোহ্রাব (ঢাকা : হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১১), হাদীস নং-১৪৯৬

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

১২. ওলীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ্*,অনু: মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০৩), কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৪৪২৩

'দা'ওয়াহ' এর পারিভাষিক অর্থ

ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় ইহকালীন কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির জন্যে মানব জাতিকে ইসলামি জীবন বিধানের দিকে আহ্বান করাকে 'দা'ওয়াহ্' বলে। যুগে যুগে যখনই মানুষ আল্লাহর বিধান সম্পর্কে গাফেল হয়ে পাপাচারে নিমজ্জিত হয়েছে, তখনই আল্লাহ সে সকল পথভ্রষ্ট জাতিকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দানের জন্য অসংখ্য নবি রাসূল পাঠিয়েছেন। আর সকল নবি-রাসূলের প্রথম কাজই ছিল তাওহিদের বাণী প্রচার করা। শেষ নবির ওফাতের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ হলেও প্রত্যেক যুগে আল্লাহর একদল খাটি বান্দা দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের এ কাজকে পৃথিবীতে জারি রেখেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

- ইমাম ইবন মানযূর বলেন :

"ইসলামের দা'ওয়াত এমন একটি সাক্ষ্যমূলক বাক্য যার দিকে কাফির সম্প্রদায়কে আহ্বান করা হয়।"[১৩]

ইমাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন :

"আল্লাহর দিকে দাওয়াত হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তারা যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সেসব সত্য বলে স্বীকার এবং যেসব তারা আদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার দিকে আহ্বান জানানো।"[১৪]

- ড. আব্দুল খালিক বলেন :

"ইসলামি দা'ওয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে অন্যের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য নিজের কর্মক্ষমতা ও বাকশক্তিকে সার্বিকভাবে ব্যবহার করা।"[১৫]

- The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic World গ্রন্থের ভাষায়-

"Dawah means the call to become a member of the only righteous Islamic community within the Muslim Ummah."[১৬]

- শায়খ খিজির হুসাইন বলেন:

"মানুষকে কল্যাণ, হেদায়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি উৎসাহিত করা।"[১৭]

- Frederick M. Denny বলেন:

"A religious outreach or mission to exhort people to embrace Islam"[১৮]

---

১৩. ইমাম ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত : দারু সাদির, ২০০৪), খ.৫, পৃ.২৬৭

১৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, *মাজমু আল-ফাতওয়া আল-কুবরা* ১৫/১৫৭ (ইবনে তাইমিয়াহ এর প্রদানকৃত ফাতওয়ার একটি বড় সংকলন,মোট ৩৬ খন্ড)

১৫. *আহাম্মিয়াতুদ দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত পৃ.৬

১৬. *The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York : Oxford University Press1995), Volume-1, Page-34

১৭. শায়খ খিজির হুসাইন, *আদ-দাওয়াত ইলাল ইসলাহ*, পৃ.১৭

১৮. *The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic World,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫০

শায়খ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম মুন্সি বলেন :

"মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী ও অভিপ্রায় পৌছে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাকে দা'ওয়াত বলে।"[১৯]

ইসলামি বিশ্বকোষ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থ সে আহ্বান যা আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবি ও রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের প্রতি করেছেন, প্রকৃত সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দা'ওয়াত আহ্বান। (কুর'আন-১৪:৪৪) সকল নবি রাসূলের ধর্মই হলো ইসলাম (আল-কুর'আন, ৩:১৯) এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব দা'ওয়াত ছিল। হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর মিশন ছিল এ দা'ওয়াতি আহ্বান পুনরুজ্জীবিত করা। এটাই হলো দা'ওয়াতুল ইসলাম।"[২০]

শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসায়মীন[২১] বলেন : "এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র, সৎ আমল, হক সংরক্ষণ এবং প্রাপকের যথাযথ হক ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান জানানো। যাতে পূর্ণাঙ্গ আকিদা ও শরী'আতের বিধি-বিধান উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল আকিদা, জাহেলি নিয়ম-কানুন ও নিকৃষ্ট বিধানসমূহ দূরীভূত হয়।"

দাওয়াত মানে হচ্ছে মানব রচিত মতবাদ মূলোৎপাটন করা, দাওয়াত মানে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, মিথ্যার পুতিগন্ধময়তা দূর করা, দাওয়াত মুসলিম উম্মাহর সংশোধনের কথা বলে। দাওয়াত উম্মাহর শত্রুদের শনাক্ত করে। দাওয়াত মানে জান্নাতের রাস্তা দেখানো। এ দাওয়াতই প্রচার করেছেন যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী এবং রাসূল। এ কার্যক্রমের মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল আনাচে কানাচে দ্বীন ইসলামের আলো দ্যুতি ছড়িয়ে ছিল স্বমহিমায়। পথভ্রষ্ট মানব সম্প্রদায় পেয়েছিল সঠিক পথ, মত ও জীবন পদ্ধতি।

ইসলাম প্রচারে কুর'আন সুন্নাহর নির্দেশনা

সমগ্র মানব জাতিকে সৃষ্টির উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছে দিতে পারে একমাত্র ধর্ম ইসলাম। শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে খুব দ্রুত এটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। তবে পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ তথা খোলাফায়ে রাশেদিন এবং আউলিয়ায়ে কেরামের আন্তরিক প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেসকল মহান ব্যক্তিদের দা'ওয়াত প্রচারের গল্পগুলো এখনো দা'ওয়াতি কাজে রত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ উদ্দীপনার বিষয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুর'আনে ইসলামের প্রচার, প্রসারে তাগিদ দিয়েছেন। তেমনিভাবে রাসূল (স.) তার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে কালজয়ী নির্দেশনা দিয়েছেন। কুর'আন ও সুন্নাহর সেসকল আদেশ, নির্দেশ এবং সার্বিক অনুপ্রেরণা সম্পর্কেই আলোচ্য পরিচ্ছেদের অবতারণা।

---

১৯. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম মুন্সি, *দাওয়াতে তাবলীগ কি ও কেন* (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০১২), পৃ.১৭

২০. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭), খ.১৩, পৃ.৭৫

২১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান ইবন আব্দুর রহমান আল উসাইমীন আত তামিমি (৯ই মার্চ, ১৯২৫-১০ই জানুয়ারি, ২০০১) সৌদি আরবের একজন সালাফি আলেম।

ইসলাম প্রচারে আল কুর'আনের নির্দেশনা

দাওয়াতে দ্বীন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। মানবজীবনে ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে দা'ওয়াতি কাজের ওপর। আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে যত নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের সকলেরই দায়িত্ব ছিল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন ও সফলতার বন্ধ তালা একমাত্র দাওয়াতে দ্বীন খুলে দিতে পারে। মানবতার বিবেক ও মানব উন্নয়ন ও বিকাশ এর মাধ্যমে সম্ভব। দা'ওয়াতি কাজ মানে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজ। দা'ওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মুসলিম জাতির বিস্তৃতি লাভ করে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানব জাতির জন্য যে দ্বীন অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন, সেটাই ইসলাম। ইসলাম কোন আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ গতানুগতিক এবং অনর্থক ধর্ম নয়। ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, প্রগতিশীল, সর্বকালীন শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। কুর'আন মাজিদে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।"[২২]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক জীবন যেমন অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল, তেমনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাও আমাদেরকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সে বর্বর সমাজচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটনের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানবতার মুক্তির দূত হিসাবে মুহাম্মাদ (স.) কে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মানব সমাজকে আল্লাহর নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান করেন এবং জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন :

مَآ اَرۡسَلۡنَا فِيۡكُمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيۡكُمۡ وَ يُعَلِّمُكُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمۡ مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ -

"এজন্যই আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল মনোনীত করে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, যে আমার সত্যবাণী তোমাদেরকে শোনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেয়। আর তোমাদের সে সত্যসমূহ জানায়, যা তোমরা জানতে না।"[২৩]

আর এ শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুশীলন, অনুসরণ, প্রচার এবং প্রসারে দোজাহানের কামিয়াবি হাসিল করার পরামর্শ এসেছে আল কুর'আন থেকে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا -

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিজনকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো।"[২৪]

২২. আল-কুর'আন, ৩:১৯
২৩. আল-কুর'আন, ২:১৫১
২৪. আল-কুর'আন, ৬৬:৬

প্রথম ওহি নাযিলের প্রায় তিন বছর পর থেকে নিয়মিত ওহি নাযিল হতে থাকে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে। ওহি নাযিলের এ পর্যায়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার নির্দেশ দিলেন।

আল কুর'আন বলছে :

قُمْ فَاَنْذِرْ-وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ-

"(হে রাসূল), আপনি উঠুন এবং সতর্ক করুন, আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।"[২৫]

এমনকি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে দল-মত, দেশ-জাতি, পাড়া-মহল্লা, পরিবার-আত্মীয় স্বজন সকলকে অর্ন্তভুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র কুর'আনে :

وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ-

"হে রাসূল, আপনার নিকটাত্মীয়গণকে সতর্ক করে দিন।"[২৬]

দিশেহারা মানবজাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বানের পথ বাতলে দিয়েছে পবিত্র কুর'আন। জোর জবরদস্তি নয় বরং মানুষের অন্তরে আঘাত করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ-

"তোমার রবের পথে আহ্বান করো হিকমতের সঙ্গে এবং সুন্দর সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে, আর ওদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে সদ্ভাবে।"[২৭]

সব নবি রাসূলই দাওয়াত, তাবলিগ, তালিম ও তারবিয়াতের কাজ করেছেন। যেহেতু নতুন কোন নবি ও রাসূল আর আসবেন না, তাই কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াত, তালিমে দ্বীনের কাজ আখেরি নবির উম্মত তথা উম্মতে মুহাম্মদীকেই করে যেতে হবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন :

وَلْتَکُنْ مِّنْکُمْ اُمَّةٌ یَّدْعُوْنَ اِلَی الْخَیْرِ وَ یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

"তোমাদের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠী হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।"[২৮]

দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নিজের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করা এবং সকলের সাথে সুসম্পর্কের বিষয়টিও রাব্বুল আলামিন কুর'আনে সুস্পষ্ট করে বলেছেন :

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَی اللّٰ

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে।"[২৯]

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রচার করা মূলত সমগ্র মুসলিম উম্মার দায়িত্ব। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর খাটি বান্দাদের দ্বারা এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম পৃথিবীতে তরতাজা থাকবে। পবিত্র কুর'আনের ভাষায় :

---

২৫. আল-কুর'আন, ৭৪:২-৩
২৬. আল-কুর'আন, ২৬:২১৪
২৭. আল-কুর'আন, ১৬:১২৫
২৮. আল-কুর'আন, ৩:১০৪
২৯. আল-কুর'আন, ৪১:৩৩

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ

"হে রাসূল আপনি বলে দিন এটাই আমার রাস্তা আমি জেনে বুঝে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি, এটা আমার কাজ এবং তাদের কাজ যারা আমার অনুসারী তথা আমার উম্মত।"[৩০]

মুসলিম উম্মাকে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হিসাবে ঘোষণা করেছে আল কুর'আন। তার কারণ এ জনগোষ্ঠীর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য হল ইসলামি আকিদা, মূল্যবোধের প্রচার এবং প্রসার। আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে কারিমা সেটিই ব্যক্ত করে :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে।"[৩১]

নিজেদের জ্ঞানগরিমা, যোগ্যতা ও সামর্থের ওপর আত্মতৃপ্ত হওয়া যাবে না। সদাসর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। দাওয়াত ও তাবলিগের উদ্দিষ্টদের জন্য দোয়া করতে হবে এবং নিজেদের ভুলত্রুটি অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও অপারগতার জন্য প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে শরমিন্দা থাকতে হবে ও ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের বর্ণনায় :

وَ الْعَصْرِ- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পর একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যধারণের পরামর্শ প্রদান করে।"[৩২]

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) দ্বীন ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সর্বদাই বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তবুও আদিষ্ট কর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। আল কুর'আনের কঠিন নির্দেশনা :

وَ لَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَ ادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

"আর তোমার ওপর আল্লাহর বাণী নাযিল হওয়ার পর, তা পালনে যে কোনকিছুই তোমাকে নিবৃত্ত করতে না পারে। বরং তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকেই সবাইকে আহ্বান করো, আর সর্বাবস্থায়ই শরিককারীদের মধ্যে শামিল হওয়া থেকে বিরত থাকো।"[৩৩]

নবি-রাসূল, অলি আউলিয়া প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক প্রথম এবং প্রধান নির্দেশনা ছিল ইসলামের সুমহান বাণী মানুষের মাঝে প্রচার করা। সে মহান দায়িত্ব তারা কার্যকর এবং সফলভাবেই পালন করেছেন। পবিত্র কুর'আনে কারিমে আল্লাহ বলেন :

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ-

"আসলে রাসূলদের কর্তব্য তো শুধু সত্যবাণী সবার কাছে পৌছে দেয়া।"[৩৪]

---

৩০. আল-কুর'আন, ১২:১০৮

৩১. আল-কুর'আন, ৩:১১০

৩২. আল-কুর'আন, ১০৩:১-৩

৩৩. আল-কুর'আন, ২৮:৮৭

৩৪. আল-কুর'আন, ১৬:৩৫

আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌছে দেয়াই ছিল রাসূলের মূল দায়িত্ব। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন। আল কুর'আনের ভাষায় রাসূলের বক্তব্য :

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ-

"আমি তো তোমাদের কাছে প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিচ্ছি এবং তোমাদের সৎ-উপদেশ দিচ্ছি। কারণ আল্লাহর কাছ থেকে (ওহির মাধ্যমে) আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।"[৩৫]

দাওয়াতি কাজকে নবিগণের মূল পেশা হিসেবে আখ্যা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :

یٰۤاَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে (কুর'আনের বিধি-নিষেধ) তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তবে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।"[৩৬]

প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর নিকট প্রেরিত নবি রাসূলদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল দ্বীন ইসলামের প্রচার। তারা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে যেমন সতর্ক করেছেন, তেমনি সৎকর্মের পুরস্কারের সুসংবাদও দিয়েছেন।
আল কুর'আনের বর্ণনা :

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا وَّ دَاعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِیْرًا

"হে নবি, আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তার পথে দাওয়াত দানকারী হিসাবে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।"[৩৭]

সারা জাহানের মহান অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো ইসলামের বাণী পরস্পরের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। কুর'আনের ভাষায় :

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

"অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়ার উপদেশ দেয়।"[৩৮]

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যত বাধা বিঘ্নই আসুক, যত অবাধ্যতাই আসুক তাবলিগের কাজ চালিয়েই যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই অলস বা বিমুখ হওয়া যাবে না। আল কুর'আনের ঘোষণা :

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ-

"আর তুমি বুঝাতে থাক। কারণ বুঝানো ঈমানদারদের উপকারে আসে।"[৩৯]

---

৩৫. আল-কুর'আন, ৭:৬২
৩৬. আল-কুর'আন, ৫:৬৭
৩৭. আল-কুর'আন, ৩৩:৪৫-৪৬
৩৮. আল-কুর'আন, ৯০:১৭
৩৯. আল-কুর'আন, ৫১:৫৫

ইসলাম প্রচার সম্পর্কে সকল নবি রাসূলের প্রতি একই নির্দেশনা ছিল। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা এবং তার ইবাদতে আগ্রহী করায় তারা নিরলস কাজ করে গেছেন। আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَاَنْذِرْ- وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ-

"হে বস্ত্রাবৃত, উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।"[৪০]

মুনাফিক এবং মুশরিক সম্প্রদায় যে আচরণই করুক না কেন দ্বীন প্রচারের কাজ জারি রাখতে হবে। নবি রাসূলগণ তাদের জীবদ্দশায় তাই করে গেছেন। আল কুর'আনে আল্লাহ বলেন :

فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلٰٓی اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِیْثِ اَسَفًا

"তারা যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস না করে তবে তাদের পেছনে মনস্তাপ করতে করতে হয়ত তুমি প্রাণপাত করবে।"[৪১]

অবাধ্য জাতি গোষ্ঠীর কষ্টদায়ক আচরণকে ক্ষমার চোখে দেখে দ্বীনের প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আল্লাহ তা'য়ালা আল কুর'আনে দিয়েছেন এভাবে :

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِیْنَ-

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।"[৪২]

স্রষ্টায় বিশ্বাসী নারী ও পুরুষদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সর্বদাই তাবলিগের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ ۘ یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

"আর বিশ্বাসী পুরুষগণ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে।"[৪৩]

সততা, ধার্মিকতা, আল্লাহভীরুতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রামাণক হলো ইসলামের মর্মবাণীগুলো মানবসমাজে প্রচার করা। ভাল মন্দ কাজ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং নিজেরা সৎকর্মের অনুশীলন করা। আল কুর'আনের ঘোষণা :

لُعِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْۢ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ ۭ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَّ کَانُوْا یَعْتَدُوْنَ

کَانُوْا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْکَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ-

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চই তা নিকৃষ্ট।"[৪৪]

---

৪০. আল-কুর'আন, ৭৪:১-৩

৪১. আল-কুর'আন, ১৮:৬

৪২. আল-কুর'আন, ৭:১৯৯

৪৩. আল-কুর'আন, ৯:৭১

৪৪. আল-কুর'আন, ৫:৭৮-৭৯

আল্লাহ তা'য়ালা নবি রাসূলদেরকে শুধুমাত্র সত্যের বাণী পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মানা, না মানা একান্তই নিজস্ব ব্যাপার, যার হিসাব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং গ্রহন করবেন। পবিত্র কুর'আনের বাণী :

وَ قُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكُمۡ ۫ فَمَنۡ شَآءَ فَلۡيُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ

"বলে দাও, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।"[৪৫]

আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় নবিকে সবরকম দ্বিধা, ভয় ছুড়ে ফেলে প্রকাশ্যে মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে সাহস যুগিয়েছেন। আল কুর'আনের ভাষায় :

فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর।"[৪৬]

দ্বীন ইসলাম প্রচারে ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে আল কুর'আনের তাগিদ :

وَ تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَ التَّقۡوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَ الۡعُدۡوَانِ-

"সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না।"[৪৭]

বর্তমান সময়ে ইসলামের দাওয়াত অন্যের নিকট পৌছাবার গুরুত্ব মোটেও গৌণ করে দেখার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটে দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধিত হয়। নির্মিত হয় ইসলামি সমাজ ও সভ্যতা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের আদি পিতা হযত আদম (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছিল এর রশ্মি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ, তার প্রিয় নবি-রাসূলদের অক্লান্ত ত্যাগ, কুরবানি, পরিশ্রম ও ব্যাপক দাওয়াতি কাজ। উম্মাহর উত্থানে দ্বীনি দাওয়াতি কাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে উম্মাহর পতনের কারণও হল দাওয়াতি কাজের দুর্বলতা। একমাত্র ইলাহই মানবতার সকল সমস্যা ও অশান্তির শেকড় উপড়ে ফেলতে পারে। খুলে দিতে পারে শান্তির পায়রা। দাওয়াত মুসলিম উম্মাহর পুষ্টি সাধন করে, বিশালতা দান করে। দাওয়াতে দ্বীন ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের প্রাথমিক সোপান। এটি ইসলামের প্রকৃত অনুশীলনের প্রেরণা যোগায়। দাওয়াতে দ্বীন উম্মাহর স্থবিরতা দূর করে গতিশীলতা আনয়ন করে। দাওয়াত ব্যক্তি ও সমাজকে জাগিয়ে তুলে। জাতির বুকে স্বপ্ন জাগায়। আশার আলো দেখায়। জাহেলিয়াতের আধার কাটে। সত্যের সোনালী সূর্যোদয় দান করে।

৪৫. আল-কুর'আন, ১৮:২৯

৪৬. আল-কুর'আন, ১৫:৯৪

৪৭. আল-কুর'আন, ৫:২

ইসলাম প্রচারে রাসূলের নির্দেশনা

এমন কোন জাতি নেই যাদের নিকট নবিগণ দাওয়াত নিয়ে যাননি। এ কঠিন দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে ময়দানে নবি-রাসূলগণ শাহাদত বরণ করেছেন। কারো মাথাকে করাত দিয়ে দিখন্ডিত করা হয়েছে, কাউকে জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, আমাদের নবিকে তায়েফের ময়দানে পাথরের আঘাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তাক্ত করা হয়েছিল। দেশান্তরী হতে হল প্রিয় নবিকে। এ দাওয়াত গ্রহণ না করার কারণে কোন সম্প্রদায়কে জীবন্ত বানরে পরিণত করা হয়েছে। তবে যারা দাওয়াত দিয়েছেন তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সফলকাম হয়েছেন।

আমাদের সমাজও আজ জাহেলি যুগের ন্যায় অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। মানব রচিত কোন তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে তমসাচ্ছন্ন এ সমাজকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র বিশ্ব সংস্কারক মুহাম্মাদ (স.) প্রদর্শিত পন্থায় দাওয়াত দানের মাধ্যমে এ সমাজের উত্তরণের পথ উন্মোচিত হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) নির্দেশিত পদ্ধতিতে মানবতাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আহ্বান করতে হবে। দ্বীন ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলে করিম (স.) সর্বদাই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। হিজরতের পর মদিনা রাষ্ট্র গঠন এবং পরবর্তীতে বিশ্বদরবারে ইসলামের বিস্তৃতিতে রাসূল (স.) সকলকে দিয়েছেন বিশ্বনন্দিত কিছু নির্দেশনা। ইসলামের বৈশ্বিক প্রচার এবং প্রসারে সেসকল নির্দেশনা যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে যাচ্ছে আজ অবধি। আলোচ্য পরিচ্ছেদ নবি করিম (স.) এর সেসমস্ত হাদিস বর্ণনার প্রয়াস।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَه لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئاً -رواه مسلم

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি উত্তম সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকি পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকি পাবে, তাদের সমপরিমাণ নেকি তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো নেকি কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালু করবে, সেজন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না।"[৪৮]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবি করিম (স.) এর নিকট এসে বলল, আমার সওয়ারি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাকে একটি সওয়ারি দান করুন। তিনি বললেন, সওয়ারি আমার কাছে নেই। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.), আমি তাকে এমন লোকের কথা বলে দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারির পশু দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে।"[৪৯]

৪৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহিহ মুসলিম, হদীস নং-৬৯৮০

৪৯. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হদীস নং-৫০০৭

ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) মু'আয (রা.)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসাবে) প্রেরণ করেন। এ সময় তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর দিনে ও রাতে পাচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সম্পদে সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে।"[৫০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ رواه مسلم-

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[৫১]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ رواه مسلم-

ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমার আগে আল্লাহ যে কোন নবিকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তার (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তার সুন্নাতের ওপর আমল করত এবং তার আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে, তা করে না এবং তারা তা করে, যার আদেশ তাদেরকে দেয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।"[৫২]

عَنْ أَبِي الوَلِيدِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ فِي العُسْرِ واليُسْرِ والمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ-

আবু অলীদ উবাদাহ ইবন সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এ মর্মে বাই'য়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের ওপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেয়ার অবস্থায় আমরা তার পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার লড়াই করব না;

৫০. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৯৫৬

৫১. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৮৬

৫২. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৮৮

যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরি দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।"[৫৩]

عَن أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِندِ بِنتِ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نُقَاتِلهم؟ قَالَ لاَ، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ رواه مسلم-

উম্মুল মুমেনিন উম্মে সালামাহ হিন্দ্ বিনতে আবী উমাইয়া হুযাইফা থেকে বর্ণিত, নবি (স.) বলেন : "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের ওপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।" সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না ? তিনি বললেন, "না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে।"[৫৪]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَسَنِ البَصرِي : أَنَّ عَائِذَ بنَ عَمرٍو دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَاد فَقَالَ : أي بُنَيَّ إِنِّي سَمِعتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُإِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ : اجلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ فَقَالَ : وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ رواه مسلم-

আবু সাঈদ হাসান বাসরী থেকে বর্ণিত, আয়েয ইবন আমর (রা.) (ইরাকের গভর্নর) উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর (উপদেশ স্বরূপ) বললেন, বেটা, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চই নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো। যিয়াদ তাকে বলল, আপনি বসুন, আপনি তো মুহাম্মাদ (স.) এর সাহাবিদের চাল আটার অবশিষ্ট ভুসি (অপদার্থ), তিনি বললেন, তাদের মধ্যেও কি ভুসি আছে ? (কখনই না) বরং ভুসি তো তাদের পরবর্তী এবং তারা ছাড়া অন্যদের মধ্যে আছে।"[৫৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ رواه أَبُو داود والترمذي وَقالَ حديث حسن-

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (স.) বলেন, "অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"[৫৬]

عَنْ أَبِي عَبدِ الله طَارِقِ بن شِهَابٍ البَجَلِيِّ الأَحْمَسِيّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ وَقَد وَضَعَ رِجلَهُ فِي الغَرْزِ: أيُّ الجِهادِ أفضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ رواه النسائي بإسناد صحيح-

৫৩. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৭২০০

৫৪. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হদীস নং-৪৯০৬

৫৫. প্রাগুক্ত, হদীস নং-৪৮৩৮

৫৬. আবু ঈসা তিরমিযী, জামে'আত-তিরমিযী, হাদিস নং-২১৭৪

আবু আব্দুল্লাহ তারেক ইবন শিহাব বাজালী আহমাসী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবি (স.) কে জিজ্ঞাসা করল এমতাবস্থায় যে, তিনি (সওয়ারির ওপর আরোহণ করার জন্য) পাদানে পা রেখে দিয়েছিলেন, কোন্ জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, "অত্যাচারী বাদশাহর সামনে হক কথা বলা।"[৫৭]

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ القَائِمِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيعاً رواه البخاري

নুমান ইবন বশির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (স.) বলেছেন : "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক ওপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণত পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে ওপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা ওপর তলায় যেতে লাগল। (ওপর তলার লোকদের ওপর পানি পড়লে তারা তাদের ওপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না। নিচের তলার লোকেরা বলল, আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে দিন, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর ওপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এ পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি ওপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (ওপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না) পক্ষান্তরে ওপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেচে যায় এবং সকলকেই বাচিয়ে নেয়।"[৫৮]

عَن أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ الحَكَمِ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا : أن النَّبيّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَيلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثلَ هذِهِ وحلّق بِأُصبُعيهِ الإبهامِ وَالَّتِي تَلِيهَا فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ-

উম্মুল মুমিননিন উম্মুল হাকাম যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা নবি (স.) তার নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেন, "আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আরবের জন্য ঐ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া'জূজ-মা'জূজের দেয়াল এতটা খুলে দেয়া হয়েছে।" এবং তিনি (তার পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধা ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা (গোলাকার) বৃত্ত বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব? তিনি বললেন, "হ্যা, যখন নোংরামি বেশি হবে।"[৫৯]

৫৭. ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ, সুনানু আন-নাসাঈ, হাদিস নং-৪২০৯

৫৮. জামে'আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২১৭৩

৫৯. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৩৪৬,৩৫৯৮

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللِ مَا لَنَا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ نتحدث فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا : وما حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ غَضُّ البَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلامِ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهيُ عن المُنْكَرِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (স.) বলেন : "তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক।" সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, "যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় কর।" তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।"[৬০]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى منْ أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ : فَكُلُّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالمعرُوفِ صَدَقةٌ ونَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقةٌ وَيُجزِىءُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَى رواه مسلم-

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদাকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদাকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদাকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদাকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশতের দুরাকাত নামায যথেষ্ট হবে।"[৬১]

وَعَنْهُ : أَنَّ نَاساً قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَأَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقةً وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ ؟ قَالَ أرَأيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ-

উক্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত, কিছু সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ধনীরাই তো বেশি নেকির অধিকারি হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা সিয়াম রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এ করছে যে) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদাকাহ করছে। তিনি বললেন, "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদাকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদাকাহ, প্রত্যেক তাকবির সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহলিল সাদাকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া সাদাকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদাকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদাকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন করে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে? তিনি

৬০. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৪৬৫,৬২২৯

৬১. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৭০৪

বললেন, "কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চই হবে) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।"[৬২]

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ يُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ -

আব্দুর রহমান ইবন হাযবরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (স.) বলেছেন : "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে পূর্বের (সাহাবার) মত সওয়াব দান করা হবে। তারা মন্দকাজে বাধাদান করবে।"[৬৩]

عَن حُذَيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ رواه الترمذي، وَقالَ حديث حسن-

হুযাইফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (স.) বলেন : "তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে, তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তা'য়ালা তার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তার কাছে দু'আ করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না।"[৬৪]

عَنْ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنّكُم لتَقرَؤُون هَذِهِ الآيَة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ - وَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُإِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُرواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة-

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত, হে লোক সকল, তোমরা এ আয়াত পড়েছ, "হে মুমিনগণ, তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সূরা মায়েদাহ, ১০৫) কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, "যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন।"[৬৫]

عن جَرِيرِ بن عبد الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِي وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لاَ يُغَيِّرُونَ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابٍ -

জারির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন : "যে সম্প্রদায় যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকে, যার বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাদেরকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে), তাহলে (তাদের জীবদ্দশাতেই) মহান আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপকভাবে তার কোন শাস্তি ভোগ করান।"[৬৬]

---

৬২. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৩৭৬

৬৩. আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-১৬৫৯২

৬৪. জামেআত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২১৬৯

৬৫. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সাজিস্তানী, সুনানু আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৩৪০

৬৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল কাযবানী, সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৪০০৯

বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত,
অন্য শব্দে, "যে কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপাচার চলতে থাকে, তখন তারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা না করে, তাহলে আল্লাহ ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে আযাব প্রেরণ করে থাকেন।"[৬৭]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ رواه البخاري -

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَيُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ رواه البخاري

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, (মহান আল্লাহ বলেছেন) "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে।" (সূরা আল ইমরান, ১১০) এর ব্যাখ্যায় তিনি (আবু হুরায়রা) বলেছেন যে, মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তাদের গর্দানে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে এবং পরিশেষে তারা ইসলামে প্রবেশ করে।"[৬৮]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ -

হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত,আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন : "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলো দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।"[৬৯]

وَعَنْ أَبِي زَيدٍ أُسَامَةَ بن زيد بنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُيُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُ تَأمُرُ بالمعْرُوفِ وَتنهَى عَنِ المُنْكَرِ ؟ فَيقُولُ : بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ وأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ متفقٌ عليه -

আবু যায়েদ উসামাহ ইবন যায়েদ ইবন হারেসা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে।

৬৭. সুনানু ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩২৩৮
৬৮. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪৫৫৭
৬৯. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হদীস নং-৩৮৬

তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, ওহে অমুক, তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে? সে বলবে, অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম।"[৭০]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ -

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (স.) বলেন : "আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল, ওরা কারা? তিনি বললেন, ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দিত, অথচ ওরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন করত, তবে কি ওরা বুঝত না।"[৭১]

عَنْ أَبِي بُرْزَةَ وَجُنْدب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْفَتِيلَة تُضِيءُ لِلنَّاسِ وَتُحْرِقُ نَفْسَهَا-

আবু বারযাহ আসলামী (রা.) ও জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে সে ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) সলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে।"[৭২]

وعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى يَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي الْبَحْرِ، وحَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُونَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أُولَئِكَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودِ النَّارِ -

উমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন : "ইসলাম বিজয় লাভ করবে। যার ফলশ্রুতিতে বণিকদল সমুদ্রে বাণিজ্য সফর করবে। এমনকি অশ্বদল আল্লাহর পথে (জিহাদে) অবতরণ করবে। অতঃপর এমন একদল লোক প্রকাশ পাবে; যারা কুর'আন পাঠ করবে (দ্বীনী ইলম শিক্ষা করে ক্বারী ও আলেম হবে)। তারা (বড়াই করে) বলবে, আমাদের চেয়ে ভালো ক্বারী আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় ফকীহ (দ্বীন-বিষয়ক পন্ডিত) আর কে আছে? অতঃপর নবি (স.) সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "ওদের মধ্যে কি কোন প্রকারের মঙ্গল থাকবে?" সকলে বলল, আল্লাহ এবং তার রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন, "ওরা তোমাদেরই মধ্য হতে এ উম্মতেরই দলভুক্ত। কিন্তু ওরা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।"[৭৩]

---

৭০. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৭৬৭৪

৭১. মুসনাদে আহমাদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১২২১১

৭২. আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী, সহিহ তারগীব, অনুবাদ: হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক, হাদিস নং-১৩০

৭৩. সহীহ তারগীব, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৩৫

عَنْ أَبِي عَمرٍو جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَار أَوْ العَبَاء مُتَقَلِّدِي السُّيُوف عَامَّتُهُمْ مِن مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ رَسُولُ الله ﷺ لمَاَ رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَة فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخر الآية إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ، والآية الأُخْرَى التي في آخر الحَشْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرهمِهِ، مِنْ ثَوبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعجِزُ عَنهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الإِسلامِ سنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ رواه مسلم -

আবু আমর জারির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ছিলাম। অতঃপর তার নিকট কিছু লোক এল, যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা 'আবা' (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারি তারা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাদের বেশিরভাগ মুযার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির ভিতর) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে লোকদেরকে (সম্বোধন করে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সে আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চাওয়া এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা নিসা, ১) অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি সূরা হাশরের শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চই তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" (সূরা হাশর, ১৮) সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা' গম ও এক সা' খেজুর থেকে সাদাকাহ করে। এমনকি তিনি বললেন, খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা যে দান করে)। সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যে তা ধারণ করতে পারছিল না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষম ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দুটি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর চেহারা যেন সোনার মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার ওপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার ওপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার ওপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।"[৭৪]

৭৪. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৯৯৮

عَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا مَا عَمِلَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ إِثْمُهَا حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَرَى لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

ওয়াসিলাহ ইবন আসকা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি কোন ভালো রীতি প্রবর্তন করে তার জন্য নির্দিষ্ট সওয়াব রয়েছে, যতদিন সে রীতির ওপর আমল হতে থাকবে; তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরেও; যতক্ষণ না তা বর্জিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতির প্রচলন করে তার জন্য রয়েছে তার নির্দিষ্ট পাপ, যতক্ষণ না সে রীতি বা কর্ম বর্জন করা হয়েছে। আবার যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের সওয়াব জারি থাকে।"[৭৫]

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . رضى الله عنه . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ".

উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র.) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবি (স.) বলেছেন, "যে কোন প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তান (কাবীল) এর ওপর বর্তাবে। কেননা, সে হত্যার রীতি সর্বপ্রথম চালু করেছে।"[৭৬]

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ فِي حِجةِ الوَداعِ: « ..إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْيُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم واللفظ له، ومسلم برقم-

আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বিদায় হজ্জের সময় বলেন : "তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা (আমার এ বাণী) যে অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌছে দেয়। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির নিকট পৌছাবে, যে এ বাণীকে তার চেয়ে বেশি অনুধাবন করতে পারবে।"[৭৭]

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». أخرجه البخاري برقم-

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবি (স.) বলেন, "আমার কথা পৌছে দাও, যদি তা এক আয়াতও হয়। আর বাণী ইসরাঈলের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারো, এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামকেই তার ঠিকানা বানিয়ে নেবে।"[৭৮]

---

৭৫. সহিহ তারগীব, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬২

৭৬. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৩৩৫

৭৭. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৭

৭৮. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৪৬১

বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স.) এর সর্বশেষ বাক্য ছিল, "তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছ তারা যে অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দাও।"[৭৯]

রাসূল (স.) বলেন : "আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম"[৮০]

রাসূল (স.) আরো বলেন : "দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে রাস্তায় চললে প্রতি কদমে সাতশত নেকি হাসিল হয় এবং বেহেশতের পথে সাতশত দরজা বৃদ্ধি করা হয় আর তার আমলনামা থেকে সাতশত গুনাহ মুছে ফেলা হয়।"[৮১]

বর্তমান সমাজ ক্রমশ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ অপসংস্কৃতি জেকে বসেছে। ন্যায়-নীতি এখানে বিলুপ্ত প্রায়। যুলুম-অত্যাচার, গুম, হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপাচারের বিষবাষ্পে জাতি আজ দিশেহারা। এক্ষণে এ ভয়াবহ পরিস্থিতির কোপানল থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। রাসূল (স.) এর মত, পথ অনুসরণ করে সর্বোচ্চ ত্যাগ তিতীক্ষার মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করে পথহারা এ জাতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসা মুসলিম হিসাবে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাসূলের কথা, কাজ ও সার্বিক জীবনাচরণেই রয়েছে মূলত ইহলৌকিক শান্তি, শৃঙখলা এবং পরকালীন সাফল্য এবং মুক্তি।

একজন প্রকৃত দা'ঈ এর গুণাবলি

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির পরপরই মহান রবের পক্ষ থেকে দ্বীন ইসলাম প্রচারের নির্দেশনা লাভ করেন। অত্যন্ত প্রতিকুল পরিবেশে শুরু করেও একদিন তিনি গোটা আরবের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অনুসারী বানিয়েছিলেন। জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগে নয় বরং মহান কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ঠের মাধ্যমে তিনি সেটি করেছিলেন। একজন মুমিনকে দেখে অপর একজন বিধর্মী ঈমান গ্রহণ করে, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই। তাই তাকে অবশ্যই কতিপয় গুনাবলি বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারি হতে হবে, যা দ্বারা মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। সেসকল গুনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

ঈমানদার হওয়া

ঈমান একজন মানুষকে আল্লাহ, তার রাসূল (স.) সহ যাবতীয় বিষয়ের প্রতি দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ আস্থাশীল করতে শেখায়। একজন ঈমানদার নিজেকে এবং তার ধ্যান ধারণা, আবেগ, অনুভূতি সবকিছুকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন। ঈমান তাকে সব সময় কর্তব্য কাজে নিয়োজিত রাখে এবং ভাল কাজে উৎসাহ দেয়। এ ঈমানের বলে বলিয়ান হয়েই সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (স.) এর নেতৃত্বে মাত্র ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র একটি নিরস্ত্র দল অস্ত্রে-সস্ত্রে

৭৯. আবু মুহাম্মদ আবদ আল মালিক বিন হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম, অনু-আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-১২০৫

৮০. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫৯৬৭

৮১. আলী ইবনে আব্দুল মালিক আল-হিন্দ, কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খন্ড, পৃ.৩১৪

সজ্জিত কাফিরদের বদর প্রান্তরে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন মুমিনকে তার আদর্শের ওপর দৃঢ় ও অবিচল ঈমান রাখতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন :

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

"আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।"[৮২]

وَ لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহি হয়েছে, তুমি আল্লাহর শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[৮৩]

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

"আমি আপনার আগে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এ ওহি ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[৮৪]

তিনি আরো বলেন :

وَ الَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

"যারা তাগুতের ইবাদত করা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ।"[৮৫]

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى * لَا انْفِصَامَ لَهَا-

"সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, নিশ্চই সে এমন শক্ত হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাঙ্গার নয়।"[৮৬]

রাসূলে করিম (স.) তার হাদিসে বলেছেন :

عَن أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ -

আবু মালিক তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলল (স্বীকার করল) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পুজিত বাতিল মাবুদসমূহকে অস্বীকার করল, তার মাল ও জান হারাম হয়ে গেল। (অর্থাৎ, সে মুসলিম বলে গণ্য হয়ে গেল)। আর তার (বাকি) হিসাব আল্লাহর ওপর।"[৮৭]

---

৮২. আল-কুর'আন, ১৬:৩৬
৮৩. আল-কুর'আন, ৩৯:৬৫-৬৬
৮৪. আল-কুর'আন, ২১:২৫
৮৫. আল-কুর'আন, ৩৯:১৭
৮৬. আল-কুর'আন, ২:২৫৬
৮৭. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৩৯

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "পাচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (স.) তার বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ পালন করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা।"[৮৮]

وَعَن سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَكَ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّه ثمَّ اسْتَقِم. رَوَاهُ مُسلم-

সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ আস সাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি চুড়ান্ত কথা বলে দেন, যে সম্পর্কে আপনার পরে; অপর এক বর্ণনায় আছে, আপনি ছাড়া আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি (রাসূল) বললেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তুমি এ কথা বল এবং এ ঘোষণায় দৃঢ় থাক।"[৮৯]

সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ (র.) বলেন, "কোন মানবিয় বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে নয়; বরং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই তার নবিকে প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াতি কার্যক্রম শুধু আকিদা-বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। তাই আল্লাহর নবি প্রাথমিক পর্যায়ে দা'ওয়াত শুধু কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সাথে সাথে মানুষের কাছে সত্যিকার মা'বূদের যথার্থ পরিচয় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন এবং তার একনিষ্ঠ গোলামীর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। মানবীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানে হয়তো মনে হতে পারে যে, এ ছোট একটি বাক্য প্রথমে আরবদের চিন্তার জগতে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে বাস্তব কথা হলো, শাব্দিক উচ্চারণের মাধ্যমে এ কালিমা অনারবদের মনে প্রভাব বিস্তার যদিও কিছুটা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ব্যাপার, তবে আরবদের নিজস্ব মাতৃভাষার শব্দ 'ইলাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিপ্লবী ঘোষণাটি অনুধাবন করতে মোটেই কসরত করতে হয়নি। তারা ভালো করেই জানতো যে, 'উলুহিয়্যাত' বলতে বুঝায় একচ্ছত্র অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব এবং এ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতি নিবেদন করার অর্থই হলো তাদের ধর্মীয় নেতা,পীর-পুরোহিত, গোত্রীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ধনী শাসকদের থেকে সকল প্রকার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে এনে একমাত্র আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। এর অনিবার্য ফল হলো মানুষের সকল কাজে-কর্মে চিন্তা-চেতনায়, বিচার-আচারে, লেনদেনে,ব্যবসা-বাণিজ্যে, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তথা মানুষের দেহ ও আত্মার সবটুকু জুড়ে আল্লাহর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার। তারা জানতো যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই' এ ঘোষণা দেয়ার অর্থ হলো, বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা ও তার নেতৃত্বের সামনে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া এবং প্রতিষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা।"[৯০]

ঈমানের দৃঢ়তাই একজন দাঈকে তার অভীষ্ট লক্ষে পৌছাতে সাহস যোগায়। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দ্বীনের দা'ওয়াত মানুষের মাঝে পৌছে দিতে হয়।

---

৮৮. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৮

৮৯. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত. হাদিস নং-৩৮

৯০. সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ, আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র (ঢাকা : পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ২০০৯), লেখকের ভূমিকা

নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার

একজন দা'ঈ ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতহীন আচরণ নিশ্চিত করবেন। এ ক্ষেত্রে তাকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আঞ্চলিকতা কিংবা জাতীয়তার উর্ধ্বে থাকতে হবে। এর মাধ্যমে দা'ঈর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا -

"নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত পৌছে দাও তার প্রাপকদের কাছে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে। আল্লাহ যে উপদেশ তোমাদের দেন তা কত উত্তম। নিশ্চই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।"[৯১]

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ

"নিশ্চই আল্লাহ তা'য়ালা হুকুম দিচ্ছেন ন্যায়বিচারের এবং সদ্ব্যবহারের।"[৯২]

وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

"যখন কোন (বিবদমান) বিষয়ে তোমাদের কোন কিছু বলতে কিংবা মীমাংসা করতে হয়, তখন ন্যায়বিচার করবে যদিও (বিবদমান পক্ষ) তোমাদের কোন নিকটাত্মীয় হয়।"[৯৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর।"[৯৪]

و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ عَنْ حَدِيْثِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَصَاحَ بِيْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ أَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করেছিল। তখন তারা বলল, এ ব্যাপারে কে নবি (স.) এর সঙ্গে কথা বলতে পারবে? কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই কথা বলার সাহস করল না। উসামাহ (রা.) এ সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তখন নবি (স.) বললেন, "বনী ইসরাইল তাদের গণ্যমান্য পরিবারের

৯১. আল-কুর'আন, ৪:৫৮
৯২. আল-কুর'আন, ১৬:৯০
৯৩. আল-কুর'আন, ৬:১৫২
৯৪. আল-কুর'আন, ৫:৮

কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। এবং দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। ফাতেমা (রা.) হলেও অবশ্যই আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।"[৯৫]

হযরত ওমর ফারুক (রা.) কাযী শুরায়হ-এর নামে একটি আদেশ লেখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (রা.) লেখেন "বিচার সভায় দরকষাকষি করবে না, কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং রাগান্বিত অবস্থায় তুমি দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে না।"[৯৬]

বিনয় ও কোমলতা

একজন মুসলিম হবেন অত্যন্ত বিনয়ী ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি অন্যান্য মুমিনদেরকে বটবৃক্ষের মত ছায়া দান করবেন যেন তার মাধ্যমে অন্যকে স্বীয় আদর্শে আকৃষ্ট করা যায়। আর কঠোরতা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও নবিদের সর্দার হওয়া সত্ত্বেও মহানবি (স.) এর আচরণ ছিল বিনয়পূর্ণ ও কোমলতায় ভরপুর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনের বাণী :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ-

"আর আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত থাকার দরুন আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, কিন্তু যদি আপনি কর্কশ স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের মাফ করে দেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"[৯৭]

নম্রতা-ভদ্রতা ও কোমলতা আদর্শ মানুষের গুণ। দ্বীনের দা'ঈর মধ্যে অবশ্যই এ গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এ গুণের অধিকারী দা'ঈগণ দাওয়াতি কাজে সহজে মানুষের মাঝে প্রভাব ফেলতে পারে। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে কোমলতা অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের সাথে কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা মূসা ও হারুন (আ.) এর উদ্দেশ্যে বলেন :

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى- فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى-

"তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকটে যাও, নিশ্চই সে সীমালংঘন করেছে। অতঃপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীতি অবলম্বন করবে।"[৯৮]

ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা মানব জীবনের এক মহৎ গুণ। বিনয়-নম্রতা মানব চরিত্রের ভূষণ। এসব গুণের কারণে মানুষ সমাজে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়। আর এসব গুণের অভাবে মানুষ নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নিন্দিত হয়। মহান আল্লাহ নিজে নম্র, তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন, ভালবাসে। তাই প্রত্যেক দা'ঈ, মুমিন ও মুসলিমের উচিত সকল ক্ষেত্রে নম্রতাকে অবলম্বন করা। রাসূল (স.) এর হাদিস শরীফে এসেছে :

---

৯৫. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৭৩৩

৯৬. তানতাবী, ওমর ইবনুল খাত্তাব, পৃ.৩০৭

৯৭. আল-কুর'আন, ৩:১৫৯

৯৮. আল-কুর'আন, ২০:৪৩-৪৪

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ-

আদি ইবন হাতিম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি (স.) এর কাছে ছিলাম, এমন সময় দুজন সাহাবি আসলেন, তাদের একজন দারিদ্রের অভিযোগ করছিলেন আর অপরজন রাহাজানির অভিযোগ করছিলেন। নবি (স.) বললেন: "রাহাজানির অবস্থা এমন যে, কিছুদিন পর এমন সময় আসবে যখন কাফিলা মক্কা পর্যন্ত বিনা পাহারায় পৌছে যাবে। আর দারিদ্রের অবস্থা এমন যে, তোমাদের কেউ সদাকাহ নিয়ে ঘুরাফেরা করবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। এমন সময় না আসা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। অতঃপর (বিচার দিবসে) আল্লাহর নিকট তোমাদের কেউ এমনভাবে খাড়া হবে যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকবে না বা কোন ব্যাখ্যাকারী দোভাষীও থাকবে না। অতঃপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দানকারিণী? সে অবশ্যই বলবে হ্যা। এরপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল প্রেরণ করিনি? সে অবশ্যই বলবে হ্যা, তখন সে ব্যক্তি ডান দিকে তাকিয়ে শুধু আগুন দেখতে পাবে, তেমনিভাবে বাম দিকে তাকিয়েও আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সদকাহ) দিয়ে হলেও যে আগুন হতে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায় তবে যে উত্তম কথা দিয়ে হলেও।"[৯৯]

এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় জানা যায়, "নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ঐ ব্যক্তি যে তার অধীনস্ত লোকদের প্রতি কঠোর। তোমরা সতর্ক থাকবে যাতে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়।"[১০০]

জারির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যাকে কোমলতা বা নম্রতা হতে বঞ্চিত করা হয় তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।"[১০১]

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

একজন মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা ও তার রাসূলের আনুগত্য করতে হবে এবং তিনি প্রতিটি পদক্ষেপেই ইসলামের নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করবেন। দ্বীনের দা'ঈ এর জন্য এটি বাধ্যতামূলক। কেননা এসকল গুনাবলির মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا-

৯৯. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৪১৩

১০০. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ১৩৯

১০১. সুনানু আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪১৭৫

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর।"[১০২]

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ-

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[১০৩]

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا

"শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌছানো এবং তার রিসালতের বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।"[১০৪]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"[১০৫]

হাদিস শরীফেও এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে :

من أطاعني فقد أطاع الله. ومن يعصني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে প্রকারান্তরে আল্লাহর আনুগত্য করলো, তেমনিভাবে যে আমার অবাধ্য হলো সে যেন আল্লাহর অবাধ্য হলো। আর যে আমীরের আনুগত্য করলো সে যেন আমারই আনুগত্য করলো, যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে প্রকারান্তরে আমারই অবাধ্য হলো।"[১০৬]

উত্তম চরিত্র

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। বক্তৃতা, বিবৃতি ও ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে যা সম্ভব হয় না তা চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে অর্জিত হয়। এ জন্য মুমিনকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। কথা ও কাজের সাদৃশ্য থাকবে। আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ-

১০২. আল-কুর'আন, ৪:৫৯
১০৩. আল-কুর'আন, ৫৯:৭
১০৪. আল-কুর'আন, ৭২:২৩
১০৫. আল-কুর'আন, ৪৭:৩৩
১০৬. সহিহ আল বুখারী, হাদিস নং-৫৮৮

“হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না তা কেন বল।”[১০৭]

আর এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে মুহাম্মাদ (স.) কে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর’আনে বলেন :

وَ اِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیۡمٍ-

“আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।”[১০৮]

وَ قُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا

“মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলো।”[১০৯]

হাদিস শরীফের ভাষ্য :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “প্রতিটি ভালকাজই সাদকারূপে গণ্য। তোমার ভাইয়ের সাথে সহাস্য মুখে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র ভর্তি করে দেয়াও ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত।”[১১০]

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ -- دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।”[১১১]

عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق

---

১০৭. আল-কুর’আন, ৬১:০২

১০৮. আল-কুর’আন, ৬৮:৪

১০৯. আল-কুর’আন, ২:৮৩

১১০. জামে’আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৯৭০

১১১. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৯৫৬

হযরত কাকা ইবন হাকিম আবি সাহেল থেকে আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "আমি কেবল সচ্চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[১১২]

অন্য হাদিসে এসেছে :

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحسنَكم أَخْلَاقًا

"মুমিনদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।"[১১৩]

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (স.) অশ্লীল ভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।"[১১৪]

হিজরত তথা নাফরমানি পরিত্যাগ করা

আমরা হিজরত বলতে দেশত্যাগ বুঝি। তা যেমন সত্য তেমনি আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানি থেকে পালিয়ে তার সন্তুষ্টি লাভের দিকে অগ্রসর হওয়াও হিজরত। সকল ধরনের নাফরমানী থেকে মুক্ত থাকতে হবে একজন প্রকৃত দা'ঈকে। নাফরমানদের ব্যাপারে কুর'আনের ঘোষণা-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ-

"যারা কুফরি করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনবে না।"[১১৫]

এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে-
আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করা হল সর্বোত্তম হিজরত কি? জবাবে রাসূল (স.) বললেন: "তুমি সে সব কাজ পরিহার করবে যা আল্লাহ তা'য়ালা অপছন্দ করেন।"[১১৬]

মূলত ভিতরের বিদ্রোহী তথা নিজের কূপ্রবৃত্তি যদি অনুগত না হয়, তাহলে মানুষের দেশত্যাগ করা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিতান্তই মূল্যহীন। অতএব ঈমানদারকে এ মহৎ গুণটি অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

বুদ্ধিমত্তার সাথে কার্য সম্পাদন করা

একজন দা'ঈ ও মুমিনকে অবশ্যই মেধাবী হতে হবে। কেননা যদি মেধাবী শক্তিতে সে অপরিপক্ক হয় তাহলে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হতে পারে। কুর'আনে এ বুদ্ধিমত্তাকে হিকমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটি হলো আল্লাহ প্রদত্ত একটি নি'য়ামত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

---

১১২. আবু বাকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-খোসরোযেরদী আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল কুবরা, হাদিস নং-৮৯৪৯
১১৩. সুনানু আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪৮৩
১১৪. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৫৫৯
১১৫. আল-কুর'আন, ২:৬
১১৬. সুনানু আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ১১৯৬

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ-

"তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় সে তো প্রচুর কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।"[১১৭]

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ-

"বল, অন্ধ ও চক্ষুসমান কি সমান? অথবা আধার ও আলো কি সমান?"[১১৮]

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ-

"যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? বস্তুত বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"[১১৯]

দাওয়াতের কাজে দা'ঈ ব্যক্তির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল কুর'আন, হাদিস এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা। পাশাপাশি লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য মাথায় রেখে সে জ্ঞানের প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন নিশ্চিত করা। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তার পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।"[১২০]

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

"বল, এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে–আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর শরিক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[১২১]

ইবরাহীম (আ.) যখন নমরুদকে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন, নমরুদ ইবরাহীম (আ.) এর সাথে বিতর্কের আয়োজন করল। নমরুদ ইবরাহীম (আ.) এর জ্ঞানের কাছে চুপ হয়ে গেল হযরত ইবরাহীম (আ.) কতৃক নমরুদকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের ঘটনাটি প্রনিধানযোগ্য। পবিত্র কুর'আনে ঘটনাটি মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেন :

---

১১৭. আল-কুর'আন, ২:২৬৯
১১৮. আল-কুর'আন, ১৩:১৬
১১৯. আল-কুর'আন, ১৩:১৯
১২০. আল-কুর'আন, ১৬:১২৫
১২১. আল-কুর'আন, ১২:১০৮

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِىۡ حَآجَّ اِبۡرٰهٖمَ فِىۡ رَبِّهٖۤ اَنۡ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الۡمُلۡكَ ۘ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىۡ يُحۡىٖ وَ يُمِيۡتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحۡىٖ وَ اُمِيۡتُ ؕ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاۡتِىۡ بِالشَّمۡسِ مِنَ الۡمَشۡرِقِ فَاۡتِ بِهَا مِنَ الۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىۡ كَفَرَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ -

"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি? যে ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বির্তকে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও তো। অতঃপর যে কুফরি করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১২২]

তাছাড়া যুবক ইবরাহীম (আ.) এর মূর্তি ভাঙ্গা এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন দিয়ে নমরুদের কাওমের চিন্তা জগতে ব্যাপক নাড়া দেয়ার ঘটনাটি জাতির সামনে প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেন:

فَجَعَلَهُمۡ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيۡرًا لَّهُمۡ لَعَلَّهُمۡ اِلَيۡهِ يَرۡجِعُوۡنَ - قَالُوۡا مَنۡ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ - قَالُوۡا سَمِعۡنَا فَتًى يَّذۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لَهٗۤ اِبۡرٰهِيۡمُ- قَالُوۡا فَاۡتُوۡا بِهٖ عَلٰۤى اَعۡيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡهَدُوۡنَ - قَالُوۡۤا ءَاَنۡتَ فَعَلۡتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰۤاِبۡرٰهِيۡمُ- قَالَ بَلۡ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيۡرُهُمۡ هٰذَا فَسۡـَٔلُوۡهُمۡ اِنۡ كَانُوۡا يَنۡطِقُوۡنَ - فَرَجَعُوۡۤا اِلٰۤى اَنۡفُسِهِمۡ فَقَالُوۡۤا اِنَّكُمۡ اَنۡتُمُ الظّٰلِمُوۡنَ- ثُمَّ نُكِسُوۡا عَلٰى رُءُوۡسِهِمۡ ۚ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا هٰۤؤُلَآءِ يَنۡطِقُوۡنَ - قَالَ اَفَتَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُكُمۡ شَيۡـًٔا وَّ لَا يَضُرُّكُمۡ- اُفٍّ لَّكُمۡ وَ لِمَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ-

"অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ কে করল? সে নিশ্চই সীমালংঘনকারী। কেউ কেউ বলল, এক যুবককে এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইবরাহীম। তারা বলল, তাকে উপস্থিত কর লোকসম্মুখে, যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে। তারা বলল, হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ? সে বলল, বরং এদের এ প্রধান, সে-ই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তারা কথা বলতে পারে। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী। অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল, তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না। ইবরাহীম বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না।"[১২৩]

আল্লাহভীতি ও ইখলাস

দ্বীনী কাজে একনিষ্ঠতা ব্যতীত কখনও দাওয়াতি কাজে সফলতা আসবে না। আর ইখলাস বা একনিষ্ঠতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা। মহান আল্লাহ বলেন :

قُلۡ اِنِّىۡۤ اُمِرۡتُ اَنۡ اَعۡبُدَ اللّٰهَ مُخۡلِصًا لَّهُ الدِّيۡنَ-

১২২. আল-কুর'আন, ২:২৫৮

১২৩. আল-কুর'আন, ২১:৫৮-৬৭

"বল, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।"[১২৪]

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্য বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন।"[১২৫]

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ-

"কখনোই আল্লাহর নিকট পৌছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।"[১২৬]

আল্লাহর নেক বান্দাগণ যুগে যুগে দ্বীনের বাণী প্রচার করে গেছেন। বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই চাননি। হযরত নূহ (আ.) মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে দীর্ঘ প্রায় নয়শত বছর আল্লাহর দিকে ডেকেছেন। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ-وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল, তোমারা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[১২৭]

হুদ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ- وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা হুদ তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[১২৮]

সালিহ্ (আ.) একই কথা বলেছেন :

---

১২৪. আল-কুর'আন, ৩৯:১১

১২৫. আল-কুর'আন, ৯৮:৫

১২৬. আল-কুর'আন, ২২:৩৭

১২৭. আল-কুর'আন, ২৬:১০৬-১০৯

১২৮. আল-কুর'আন, ২৬:১২৩-১২৭

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ - اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ - وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ -

"যখন তাদের ভ্রাতা সালিহ্ তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[১২৯]

লূত (আ.) এর দা'ওয়াত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ لُوۡطٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ- اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ- وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ -

"যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[১৩০]

এমনিভাবে শু'আইব (আ.) বলেছেন :

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ شُعَیۡبٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ- اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ-وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ -

"যখন শু'আইব তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[১৩১]

মুহাম্মাদ (স.) কেও ঠিক একই নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে :

قُلۡ لَّاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ اَجۡرًا ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِکۡرٰی لِلۡعٰلَمِیۡنَ-

"বল, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এটা তো শুধু বিশ্বজগতের উপদেশ।"[১৩২]

اتَّبِعُوۡا مَنۡ لَّا یَسۡـَٔلُکُمۡ اَجۡرًا وَّ هُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ-

"অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।"[১৩৩]

দাওয়াতি কাজে এ দুটি বিষয় এতই গুরুত্ব বহন করে যে, এগুলো ব্যতীত অন্য কোন কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) এর হাদিস-

---

১২৯. আল-কুর'আন, ২৬:১৪২-১৪৫
১৩০. আল-কুর'আন, ২৬:১৬১-১৬৪
১৩১. আল-কুর'আন, ২৬:১৭৭-১৮০
১৩২. আল-কুর'আন, ৬:৯০
১৩৩. আল-কুর'আন, ৩৬:২১

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. رضى الله عنه .عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

আলকামাহ ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (র.) হতে বর্ণিত। আমি উমর ইবনল খাত্তাব (রা.)-কে মিম্বারের ওপর দাড়িয়ে বলতে শুনেছি : আমি আল্লাহর রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি "কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়্যাত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।"[১৩৪]

সকল নবি রাসূল, অলি আউলিয়ায়ে কেরাম নিজেদের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে সব ধরনের বাধা বিঘ্ন দূরে ঠেলে সমগ্র মানবজাতিকে এক আল্লাহর পথে ডেকেছেন দৃঢ় চিত্তে। তাদের দেখানো পথে তাবলিগ করলেই দ্বীন প্রচারে আসবে কাঙ্খিত সফলতা।

আমানত প্রবণতা

আমানত প্রবণতা মুমিনের জীবনে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অপরিহার্য গুণ। এটাই একজন মুমিনের বড় পরিচয়। আর যারা খিয়ানতকারী তাদের কথায় মানুষ আস্থা পোষণ করে না। আমানতের খিয়ানতকারীকে ঈমানহীন বলা হয়েছে। সেজন্য প্রত্যেককে আমানত রক্ষা করে চলতে হবে। খিয়ানতকারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ-

"আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।"[১৩৫]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে খিয়ানত কর না এবং নিজেদের আমানতের খিয়ানত কর না।"[১৩৬]

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا-

"আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন মালিকের নিকটে আমানত পৌছে দেয়ার জন্য।"[১৩৭]

আমাদের প্রিয় নবি (স.)ও আমানতের ওপর বেশ গুরুত্ব দিয়ে সাহাবাদের মাঝে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। রাসূলের হাদিস :

১৩৪. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-০১

১৩৫. আল-কুর'আন, ২৩:৮

১৩৬. আল-কুর'আন, ৮:২৭

১৩৭. আল-কুর'আন, ৪:৫৮

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا

হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) আমাদের কাছে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। একটির (বাস্তবায়ন) আমি দেখেছি এবং দ্বিতীয়টির অপেক্ষা করছি। নবি করিম (স.) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের কেন্দ্রে সংরক্ষিত। তারপর তারা কুর'আন থেকে জ্ঞান লাভ করে। অতঃপর তারা নবি (স.) এর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান লাভ করে। নবি (স.) আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে, যে ব্যক্তিটি এক সময় নিদ্রা গেল, তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। আবার ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে তাতে কিছুই থাকবে না। মানুষ বেচাকেনা করতে থাকবে বটে, কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই না জ্ঞানী, কতই না হুশিয়ার, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষা দানার পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।"

(বর্ণনাকারী বলেন) আমার ওপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সঙ্গে বেচাকেনা করতে একটুও চিন্তা করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে ইসলাম তাকে (প্রতারণা হতে) ফিরিয়ে রাখবে। আর সে খ্রিষ্টান হলে তার শাসকই তাকে (প্রতারণা হতে) ফিরিয়ে রাখবে। অথচ এখন অবস্থা এমন যে, আমি অমুক অমুককে ব্যতীত বেচাকেনা করি না।[১৩৮]

শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা

কাপুরুষতা একজন পরিপূর্ণ মুমিনের গুণ নয় বরং সাহসিকতাই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। একজন দা'ঈকে অবশ্যই শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। দা'ঈ তার কার্যক্রম ও দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। প্রবল সাহসিকতার সাথেই দ্বীনী দাওয়াতের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক। তবেই কেবল কাঙ্খিত প্রচার সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۔ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

১৩৮. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৪৯৭

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে অচিরেই আল্লাহ এমন এক কাওম নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাকে ভালবাসবে; তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল হবে আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।"[১৩৯]

হযরত লুকমান তার সন্তানকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল :

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ-

"সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও আর অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটা তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১৪০]

ইবরাহীম (আ.) এর জন্মই হয়েছিল এক মূর্তিপূজকের ঘরে। ছোটকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন এবং এগুলো পছন্দ করতেন না। তিনি খুব সাহসের সাথেই তার জাতির সামনে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। আল কুর'আনের ভাষায় :

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ-

"যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, এ মূর্তিগুলো কী? যাদের পূজায় তোমরা রত আছ?"[১৪১]

কাওমের লোকজন স্বভাবসূলভ উত্তর দিল :

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ-

"তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের ইবাদত করতে দেখেছি।"[১৪২]

ইবরাহীম (আ.) আবার দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-

"তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।"[১৪৩]

সাহসিকতার সাথে এ ধরনের বাহাসের পরও যখন তাদের গোমরাহি দূর হচ্ছিল না তখন তিনি মূর্তি ভাঙ্গার মত চুড়ান্ত পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। পবিত্র কুর'আনের বর্ণনা :

وَ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ-

"শপথ আল্লাহর, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।"[১৪৪]

---

১৩৯. আল-কুর'আন, ৫:৫৪
১৪০. আল-কুর'আন, ৩১:১৭
১৪১. আল-কুর'আন, ২১:৫২
১৪২. আল-কুর'আন, ২১:৫৩
১৪৩. আল-কুর'আন, ২১:৫৪
১৪৪. আল-কুর'আন, ২১:৫৭

ইবরাহীম (আ.) দৃঢ়কণ্ঠে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নমরুদকে মোকাবেলা করলেন। তাদের ভুল ইবাদতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সমস্ত উপাস্যদের প্রতি ধিক্কার জানালেন। পবিত্র কুর'আনের বাণী :

اُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-

"ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?"[১৪৫]

ইবরাহীম (আ.) এর এ ধরনের যৌক্তিক ও দৃঢ়চেতা বক্তব্য শুনে নমরূদ বুঝতে পারল, বুঝিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এ যুবককে ফিরানো সম্ভব নয়। কঠিন সিদ্ধান্ত না নিলে সে দেশের মানুষকে তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম থেকে তার নতুন ধর্মে নিয়ে যাবে। এ জন্য সে তার অনুসারীদেরকে গভীর গর্ত করে বড় বড় গাছ কেটে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দিল। নির্দেশ অনুযায়ী আগুন জ্বালানো হলে অগ্নিশিখা যখন আকাশচুম্বী হয়ে উঠল এবং ওর পাশে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল যে কেমন করে ইবরাহীমকে সেখানে নিক্ষেপ করবে? শেষ পর্যন্ত পারস্যের কুর্দিস্তানের এক বেদুঈনের পরামর্শক্রমে একটি লোহার দোলনা তৈরি করা হয় এবং তাকে সেখানে বসিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। এমন কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েও হযরত ইবরাহীম (আ.) সাহস হারা হননি, বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছেন। চোখের সামনে যখন তিনি আগুন দেখছিলেন, আগুনের ভয়ে ভীত না হয়ে তিনি বলে উঠলেন :

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।"[১৪৬]

মহান আল্লাহ আদেশে হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের কাছে তাওহিদের দা'ওয়াত নিয়ে গেলেন। ফেরাউন মূসা (আ.) কে তার দ্বীন প্রচার থেকে বিরত থাকতে বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মুসা (আ.) সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। হযরত মূসা (আ.) এর লাঠির মুজিজায় ফেরাউনের যাদুকরগণ ঈমান আনল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ফেরাউন মুসা (আ.) কে হত্যা করার হুমকি দিল। আল কুর'আনের বর্ণনা :

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ -

"ফেরাউন বলল, কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? সে-ই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।"[১৪৭]

ফেরাউনের এ হুঙ্কার শুনে মূসা (আ.) ও তার অনুসারীরা ভয় পাননি। তাদের ঈমান আরো মজবুত হয়। তারা পরিষ্কার ভাষায় জওয়াব দিয়ে দিলেন :

قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۚ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ- اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী।"[১৪৮]

---

১৪৫. আল-কুর'আন, ২১:৬৬-৬৭

১৪৬. হাফিয ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর, তাফসির ইবন কাছীর, অনু-ড.মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকা : হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ২০১২) খ. ১৪. পৃ.৩৫০

১৪৭. আল-কুর'আন, ২৬:৪৯

১৪৮. আল-কুর'আন, ২৬:৫০-৫১

মুমিনদের এ ধরনের উক্তি ফেরাউনের মানসিক অবস্থাকে তছনছ করে দিল। ফেরাউন তার শক্তিশালী সৈন্যদেরকে উপস্থিত করার পরও মূসা (আ.) বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং তার দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِیَ رَبِّیۡ سَیَهۡدِیۡنِ-

"মূসা বললেন, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার প্রতিপালক, সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।"[১৪৯]

মূসা (আ.) দৃঢ়তার সাথে এ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ তাকে ওহি নাযিল করে বললেন :

فَاَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی اَنِ اضۡرِبۡ بِّعَصَاکَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرۡقٍ کَالطَّوۡدِ الۡعَظِیۡمِ-

"অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহি করলাম, তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।"[১৫০]

মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনেও সাহসিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ওহি পাওয়ার পর প্রথম তিন বছর গোপনে দা'ওয়াত প্রচার করতে থাকেন। তিন বছর পর মহান আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন, এখন আর গোপনে নয় প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে। এ নির্দেশ পেয়ে তিনি সাফা পাহাড়ে গিয়ে মক্কার সকলকে ডাকলেন। কুরাইশদের সব নেতা সেখানে উপস্থিত ছিল। মুহাম্মাদ (স.) সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে তাওহিদের পথে আসার আহ্বান করলেন। মুহাম্মাদ (স.) সেখানে একাই গোটা জাতির সামনে এ বিপ্লবী ঘোষণা দেন। মনের ভিতরে সামান্য ভয় বা সংশয় ছিল না।[১৫১]

ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ এভাবেই সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে সাহসিকতা, দৃঢ়তার সাথে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ধৈর্য ও সংযম

মানবজীবনে ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। এটি একজন মুমিনের জন্য একটি অপরিহার্য গুণ। এটি মুমিনের মেরুদন্ডস্বরূপ। কেননা এ কাজে বিভিন্ন মেজাজের লোকদের সাথে মেলা-মেশা করা প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সংযম ব্যতীত এ কাজ সম্ভব নয়। আর ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে আল-কুর'আনে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

فَاصۡبِرۡ کَمَا صَبَرَ اُولُوا الۡعَزۡمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسۡتَعۡجِلۡ لَّهُمۡ ؕ کَاَنَّهُمۡ یَوۡمَ یَرَوۡنَ مَا یُوۡعَدُوۡنَ ۙ لَمۡ یَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنۡ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلۡ یُهۡلَکُ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡفٰسِقُوۡنَ -

"অতএব আপনি সবর করুন যেভাবে দৃঢ়চেতা রাসূলগণ সবর করেছিলেন এবং ওদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখবে, তখন তাদের মনে হবে যে তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি পৃথবীতে অবস্থান করেনি। এটা সংবাদ পৌছে দেয়া মাত্র। তারাই ধ্বংস হবে, যারা পাপাচারী।"[১৫২]

---

১৪৯. আল-কুর'আন, ২৬:৬২

১৫০. আল-কুর'আন, ২৬:৬৩

১৫১. আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪

১৫২. আল-কুর'আন, ৪৬:৩৫

পবিত্র কুর'আনে নবিগণের ধৈর্যের ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন :

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ-

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসেনি। অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তার সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রাখ অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।"[১৫৩]

وَ لَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٌ مِّنۡ قَبۡلِكَ فَصَبَرُوۡا عَلٰى مَا كُذِّبُوۡا وَ اُوۡذُوۡا حَتّٰۤى اَتٰهُمۡ نَصۡرُنَا ۚ وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ لَقَدۡ جَآءَكَ مِنۡ نَّبَاِى الۡمُرۡسَلِيۡنَ -

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহর আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে।"[১৫৪]

যখনই রাসূল (স.) মক্কার মানুষের নিকট ইসলাম প্রচারে ব্রত হলেন, তখনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার যুগে আলামীন উপাধী পাওয়া ব্যাক্তিটির ওপর অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে। পরিচিত লোকেরাও তাকে অশিষ্ট বাক্যবানে জর্জরিত করতে দ্বিধাবোধ করল না। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ তাদের এ অপকর্মের কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন :

وَ قَالُوۡا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىۡ نُزِّلَ عَلَيۡهِ الذِّكۡرُ اِنَّكَ لَمَجۡنُوۡنٌ ؕ لَوۡ مَا تَاۡتِيۡنَا بِالۡمَلٰٓئِكَةِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ-

"তারা বলল, ওহে, যার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তো নিশ্চই উন্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফিরিস্তাগণকে উপস্থিত করছ না কেন?"[১৫৫]

وَ عَجِبُوۡۤا اَنۡ جَآءَهُمۡ مُّنۡذِرٌ مِّنۡهُمۡ ۫ وَ قَالَ الۡكٰفِرُوۡنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ- اَجَعَلَ الۡاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىۡءٌ عُجَابٌ- وَ انۡطَلَقَ الۡمَلَاُ مِنۡهُمۡ اَنِ امۡشُوۡا وَ اصۡبِرُوۡا عَلٰۤى اٰلِهَتِكُمۡ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىۡءٌ يُّرَادُ- مَا سَمِعۡنَا بِهٰذَا فِى الۡمِلَّةِ الۡاٰخِرَةِ ۚ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا اخۡتِلَاقٌ -

"তারা বিস্ময় বোধ করল যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? এটাতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তাদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচল থাক। নিশ্চই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।"[১৫৬]

কাফিরদের এসব মিথ্যা অপবাদ, যুলুম-নির্যাতন চলাকালীন সময়ে রাসূলকে (স.) সান্ত্বনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

---

১৫৩. আল-কুর'আন, ২:২১৪

১৫৪. আল-কুর'আন, ৬:৩৪

১৫৫. আল-কুর'আন, ১৫:৬-৭

১৫৬. আল-কুর'আন, ৩৮:৪-৭

وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا-

"লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারন কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার কর।"[১৫৭]

হাদিস শরীফে এসেছে : হযরত খাব্বাব ইবন আরত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দরবারে এসে অভিযোগ করলাম (মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে) তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দু'আ করবেন না? তিনি বললেন : "তোমাদের পূর্ববর্তীদের (ঈমানদার) অবস্থা ছিল এমন যে, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত করা হতো এবং ঐ গর্তে তাদেরকে পুতে রেখে করাত দিয়ে তাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এ (নির্মম নির্যাতনও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। লোহার চিরুনি দিয়ে আচড়িয়ে শরীরের হাড় পর্যন্ত মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। এ (অমানুষিক নির্যাতন) তাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ এ দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখনকার দিনের একজন উষ্টারোহী সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত (নিরাপদে) ভ্রমণ করবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশঙ্কা করবে। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।"[১৫৮]

ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক ছিলেন প্রথম দিকে ঈমান আনা রাসূল (সা.) এর সাহাবাগণ। বিভিন্ন বর্ণনায় তাদের ত্যাগের বিষয়টি উঠে এসেছে-

"এ ধরনের অশালীন কথাবার্তায় রাসূল (স.) কে যখন তারা থামাতে পারল না তখন শুরু করল শারীরিক নির্যাতন। প্রথম দিকে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাদের মধ্যে বিলাল (রা.) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন দাস। ইসলাম কবুল করার অপরাধে তাকে উত্তপ্ত বালু, পাথরকুচি ও জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দেয়া হতো। গলায় রশি বেধে ছাগলের মত শিশু–কিশোরেরা মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াতো। আবু জাহেল তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠের ওপর পাথরের বড় চাক্কি রেখে দিত। দুপুরে সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, আবু জাহেল বলত, বিলাল, এখনো মুহাম্মাদের আল্লাহ থেকে ফিরে আস। এমন কঠিন মুহূর্তে বিলাল (রা.) তার পবিত্র মুখ থেকে শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' ধ্বনি উচ্চারণ করতেন।"[১৫৯]

সুতরাং ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্তে সততা ও একনিষ্ঠতার সাথে সকল প্রতিবন্ধকতার শিকল ছিড়ে এগুতে হবে। আল কুর'আনের বাণী এবং রাসূলের হাদিস শরিফ এসব বিষয়েরই প্রামাণ্য দলিল।

ক্ষমা

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। মুমিনকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেয়ার মত মহৎ গুণের অধিকারী হতে হবে। এতে মানুষের মনের বিদ্বেষ ভাব দূরীভূত হয়ে মুমিনের সাথে গড়ে উঠবে নিবিড় সম্পর্ক, অগাধ ভালবাসা ও বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ۔اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-

১৫৭. আল-কুর'আন, ৭৩:১০

১৫৮. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৩৫১

১৫৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০৯)

"ভাল ও মন্দ সমান নয়। যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করুন, ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে।"[১৬০]

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ মুমিনদের গুনাবলি বর্ণনা করে বলেন :

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসে।"[১৬১]

হযরত ইউসুফকে (আ.) এর সাথে তার ভাইয়েরা যে নির্মম আচরণ করেছিল, তিনি মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধীষ্ঠিত হওয়ার পর চাইলে কড়ায় গন্ডায় তার হিসাব বুঝে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করে মহত্বের পরিচয় দেন।

তিনি বললেন :

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ-

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে বেশি দয়ালু।"[১৬২]

মক্কায় ইসলামের দাওয়াত প্রচারকালে রাসূল (স.) ও সাহাবিগণ বিভিন্ন ধরনের জেল, যুলুম, অপবাদ, নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা চাইলে সময় বুঝে সেগুলোর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তারা তা না করে আল্লাহর নির্দেশ পালনে ব্রত থাকলেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেন :

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ-

"অতএব পরম সৌজন্যের সাথে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।"[১৬৩]

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ-

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।"[১৬৪]

ইমাম ইবন জারির তাবারী (র.) বর্ণনা করেছেন: "এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূল (স.) হযরত জিবরাঈল (আ.) কে এর তাফসির জিজ্ঞাসা করলেন। জিবরাঈল (আ.) আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করে এ উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে আপনাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যারা আপনার ওপর যুলুম করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর যে আপনাকে কিছুই দেয় না আপনি তাদেরকে দান করুন এবং যে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তাকেও আপনার সঙ্গে জুড়ে রাখুন।

---

১৬০. আল-কুর'আন, ৪১:৩৪
১৬১. আল-কুর'আন, ৩:১৩৪
১৬২. আল-কুর'আন, ১২:৯২
১৬৩. আল-কুর'আন, ১৫:৮৫
১৬৪. আল-কুর'আন, ৭:১৯৯

ইবন মারদূইয়াহ হযরত সা'আদ ইবন উবাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, "উহুদ যুদ্ধে যখন রাসূল (স.) এর প্রিয় চাচা হযরত হামজা (রা.) কে শহিদ করা হলো এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের সম্মানহানী ঘটানো হলো, তখন রাসূল (স.) লাশের এ অবস্থা দেখে বলেছিলেন, যারা হামজার সঙ্গে এমন দুরাচার করেছে আমি তাদের সত্তর ব্যক্তিকে এ পরিণতির শিকার করে ছাড়ব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, এটি আপনার শান নয়। আপনার শান হলো ক্ষমা করে দেয়া এবং মানুষের অন্যায়কে উপেক্ষা করে চলা।"[১৬৫]

আজকের পাশ্চাত্যঘেষা অনেক বুদ্ধিজীবীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন, মক্কায় যেহেতু মুসলিমদের ক্ষমতা ছিল না তাই তারা ক্ষমার মত মহৎ গুণটিকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মদিনায় গিয়ে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলে ঠিকই সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। কুর'আনের আয়াতের ধারাও পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন আর ক্ষমার কথা বলা হয় না। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের নীতিই বলা হয়েছে। তাদের এ অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন। মদিনায় যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু ক্ষমার বিধান রহিত করে নয়। যুদ্ধ তো তাদের জন্য যারা মুসলিমদের সুন্দর ব্যবহার, উদারতা, মহানুভবতা ও যৌক্তিক আলোচনা করেও এ পথে না এসে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। মানুষের জীবন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। যুদ্ধ ছাড়া তাদের বিপর্যয় থামানোর আর কোন পথ থাকে না। যুদ্ধ কেবল তাদের বিরুদ্ধেই। যুদ্ধের ময়দানেও মুসলিমদেরকে ক্ষমা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (স.) কোন যুদ্ধে যাওয়ার আগে সাহাবিদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিতেন- "কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না তাদেরকে হামলা করা যাবে না।"[১৬৬]

ক্ষমা মুসলিমদের স্বভাব-চরিত্রের একটি অংশ। এটি যে তাদের কোন কৌশল নয় এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সাথে রাসূল (স.) এর আচরণ। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। মক্কার কোন যোদ্ধা রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেয়ার সাহস পেল না। যে মক্কায় রাসূলকে অত্যাচার করা হয়েছিল, অনেক মুসলিম সাহাবিকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল, আজ সে মক্কা মুহাম্মাদ (স.) এর দখলে। সে অত্যাচারী মুশরিকদের অনেকেই এখনো মক্কায় বেচে আছে। রাসূল যদি শুধু হাতের ইশারা করেন তাহলে ঐ অত্যাচারীদের রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। রাহমাতুল্লিল আলামীন এমন প্রতিশোধের নীতি অবলম্বন করলেন না। ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে এ কথা প্রমাণ করলেন যে, জীবনের পরম শত্রুকেও ক্ষমা করা আমাদের আদর্শ। কা'বা শরীফে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। রাসূল (স.) কী করেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য কুরাইশরা কা'বা ঘরের সম্মুখে ভীড় করল। তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দিলেন :

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তার কোন শরিক নেই। তিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রেখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজিদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা আমার এ দুপদতলে রইল। স্মরণ রেখ, ভুলবশত হত্যা যা লাঠি সোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোনিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশ উট দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

---

১৬৫. তাফসির ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৮-১১, পৃ.৪৮০-৪৮১

১৬৬. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩০১৪-৩০১৫

হে কুরাইশগণ, আল্লাহ তোমাদের হতে যাহিলিয়্যাত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ.) এর সন্তান এবং তিনি মাটির তৈরি। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী।" (আল-কুর'আন, ৪৯:১৩)

এরপর রাসূল (স.) বললেন : "হে কুরাইশ জনগণ, তোমাদের কী ধারণা, তোমাদের সঙ্গে আমি কিরূপ ব্যবহার করব বলে মনে করছ? সকলে বললো, খুব ভাল। আপনি সদয় ভাই এবং সদয় ভাইয়ের পুত্র। রাসূল (স.) তখন বললেন : "তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ কথাই বলছি যেমনটি ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের সঙ্গে বলেছিলেন যে, আজ তোমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই। যাও, আজ তোমাদের সকলকে মুক্তি দেয়া হলো।"[১৬৭]

ক্ষমা নামক মহৎ গুণে গুণান্বিত হয়ে ইসলামের দাঈগণ পৃথিবীর সকল প্রান্তে দ্বীনের আলো পৌছে দিয়ে মানুষকে পরকালীন মুক্তির স্বাদ গ্রহনে সহযোগিতা করবে এটাই কাম্য।

সত্যবাদিতা

আল্লাহর পথের দা'ঈকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। দা'ঈর মধ্যে যদি মিথ্যার লেশমাত্র পাওয়া যায় তাহলে তার দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে না। কুর'আন ও হাদিসে সত্যবাদীতার বহু ফযিলত বর্ণিত হয়েছে এবং মুমিনদেরকে সত্যবাদীদের সাথী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"[১৬৮]

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا

"আল্লাহ বলবেন, এ সে দিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যের জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।"[১৬৯]

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

"আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবি, সত্যনিষ্ঠ, শহিদ ও সৎকর্মপরায়ণ-যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন-তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী।"[১৭০]

---

১৬৭. আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৪-৪৬৫

১৬৮. আল-কুর'আন, ৯:১১৯

১৬৯. আল-কুর'আন, ৫:১১৯

১৭০. আল-কুর'আন, ৪:৬৯

সত্যবাদিতা এমন এক গুণ যার ব্যাপারে কুর'আন-হাদিসে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কথা-বার্তায় সত্যবাদীতা মুমিনের অপরিহার্য গুণাগুণ। এ প্রসঙ্গে হাদিসের বর্ণনায় এসেছে :

عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন : "সত্য কথা বলা তোমাদের ওপর কর্তব্য। কেননা সত্যবাদীতা মানুষের নেক কাজের পথ উন্মুক্ত করে। আর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। কোন ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্য কথা বলার চেষ্টা অব্যাহত রাখে তখন এভাবে একসময় আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকবে, কেননা মিথ্যা পাপ কাজের পথ দেখায়। আর পাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তখন এক সময় সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবেই লিপিবদ্ধ হয়।"[১৭১]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ، عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও আমর ইবন আলী (র.) হাকীম ইবন হিযাম (রা.) সূত্রে, নবি (স.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।"[১৭২]

স্নেহশীলতা ও দয়া

দয়া-মমতা আল্লাহ তা'য়ালার একটি মহৎ গুণ। যা গোটা সৃষ্টি জগতব্যাপী বিস্তৃত। তাই মানব সমাজেও পরস্পরে দয়া মমতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। আর এটি মহানবি (স.) এর একটি মহান গুণ ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল। তার পক্ষে অতি দুঃসহ-দুর্বহ সে সব বিষয় যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে। তিনি তোমাদের অতিশয় হিতকামী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, খুবই দয়ালু।"[১৭৩]

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

১৭১. জামে'আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৮৯৪

১৭২. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৭৫০

১৭৩. আল-কুর'আন, ৯:১২৮

নিশ্চই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"[১৭৪]

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا. وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"তখন আদম দম্পতি বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের নিজেদের ওপরই যুলুম করেছি। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।"[১৭৫]

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি

মানুষ যা কিছু চিন্তা করে তা তার ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। এ ইচ্ছা শক্তিতে প্রবৃত্তির তাড়না অলসতা বা আরামপ্রিয়তা বা ভীতি ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। তাই অনেক সময় মানুষ দুর্বল চিত্ত হয়ে পড়ে। এ ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রজ্ঞা ও শরী'আতের বিধি-বিধান অনুসারে। আর এটি একজন মুমিনের একটি মহৎ গুণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

"তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে আপনি জানবেন যে, তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ তো যালিম লোকদেরকে পথ দেখান না।"[১৭৬]

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۟ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

"হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চই আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি (এ বলে) যে, তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের পাপসমূহ মোচন করুন এবং আমাদেরকে পূণ্যবানদের সঙ্গে মৃত্যু দান করুন।"[১৭৭]

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

"যে ব্যক্তি তার ঈমানের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করে (তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ), তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যাকে (কুফরির জন্যে) বাধ্য করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানে প্রশান্ত, কিন্তু যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) কুফরির জন্য তার বক্ষ প্রশস্ত করে তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।"[১৭৮]

---

১৭৪. আল-কুর'আন, ২:১৪৩
১৭৫. আল-কুর'আন, ৭:২৩
১৭৬. আল-কুর'আন, ২৮:৫০
১৭৭. আল-কুর'আন, ৩:১৯৩
১৭৮. আল-কুর'আন, ১৬:১০৬

সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্তে পৌছার সামর্থ

একজন দা'ঈর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছার সামর্থ অর্জন করতে হবে। এ সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীকে আল-কুর'আনে 'বাসীরাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

"আপনি বলুন, এটাই আমার পথ, আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি প্রমাণের ওপর কায়েম থেকে-আমি ও আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ মহান পবিত্র। আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।"[১৭৯]

আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালবাসা

মুমিনকে আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালবাসা থাকতে হবে। সে প্রেরণা নিয়ে কাজ করলে তিনি অনেক সমস্যা থেকে বেচে যেতে পারেন। আর মুমিনগণ আল্লাহকেই বেশি ভালবাসে। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস একজন দা'ঈকে অনন্য উচ্চতায় পৌছে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ-

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তার (আল্লাহ) সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসতে হয় সেরূপ তাদের ভালবাসে। কিন্তু যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর যালিমরা যেমন বুঝবে এখন যদি তারা তেমন বুঝত, নিশ্চই সব শক্তি শুধু আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।"[১৮০]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"[১৮১]

রাসূলে আকরাম (স.) হাদিস শরিফেও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন :

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» . قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا. مُتَّفق عَلَيْهِ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি (স.) বললেন, "তোমার জন্য পরিতাপ। কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করেছ?" সে জবাবে বলল, আমি কিছুই করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তার (স.) কে ভালোবাসি। তিনি (স.) বললেন, তুমি তার সাথেই হবে যাকে তুমি

১৭৯. আল-কুর'আন, ১২:১০৮

১৮০. আল-কুর'আন, ২:১৬৫

১৮১. আল-কুর'আন, ৩:৩১

ভালোবাসো। (রাবী) আনাস (রা.) বলেন, ইসলাম আবির্ভাবের পর মুসলিমদেরকে আমি কোন কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি, যতটা তারা খুশি হয়েছিল রাসূল (স.) এর এ বাণীতে।[১৮২]

জিহাদি চেতনা

মুমিনকে অবশ্যই জিহাদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। একজন মুমিনের জিহাদ তার কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, শয়তানি কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে, শয়তানি শক্তি তথা তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে। আর জিহাদ হবে কথা, কৌশল, ধনসম্পদ, কলম ও অস্ত্রের দ্বারা। সর্বোতভাবে জিহাদ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

"তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, স্বল্প সরঞ্জামের সাথে কিংবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল দিয়ে ও নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।"[১৮৩]

وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

"তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরিক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।"[১৮৪]

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"[১৮৫]

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

"সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করনা এবং তুমি কুর'আনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।"[১৮৬]

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রব হতে জীবিকা প্রাপ্ত।"[১৮৭]

আবদুল্লাহ ইবন হুবশী বলেন :

قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِه وَنَفْسِه قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهَرِيقَ دَمُه وَعُقِرَ جَوَادُه

১৮২. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬১৬৭

১৮৩. আল-কুর'আন, ৯:৪১

১৮৪. আল-কুর'আন, ৩১:১৫

১৮৫. আল-কুর'আন, ২৯:৬৯

১৮৬. আল-কুর'আন, ২৫:৫২

১৮৭. আল-কুর'আন, ৩:১৬৯

লোকেরা রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করলো, কোন জিহাদ উত্তম? তিনি (স.) জবাব দেন, জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? তিনি (স.) জবাব দিলেন, ওই ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে তার সওয়ারি ঘোড়ার পাও কেটে ফেলা হয়।[১৮৮]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (স.) বলেন : "আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।" সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দুটি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূল (স.) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রাহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবন ফুলাইহ্ (র.) তার পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর ওপর রয়েছে আরশে রাহমান।[১৮৯]

পরামর্শের মনোবৃত্তি

একজন দা'ঈ ও মুমিনকে পরস্পর পরামর্শের মনোবৃত্তি অর্জন করতে হবে এবং কোন কাজে অগ্রসর হতে হলে তাকে এ সকল পরামর্শের ভিত্তিতেই অগ্রসর হতে হবে। আর এটি মূলত: মুমিনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বটে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

"আর যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে পারস্পরিক কর্ম সম্পাদন করে এবং যে রিযিক আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"[১৯০]

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ

"হে নবি, (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) আপনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।"[১৯১]

---

১৮৮. সুনানু আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৪৫১

১৮৯. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৭৯০

১৯০. আল-কুর'আন, ৪২:৩৮

১৯১. আল-কুর'আন, ৩:১৫৯

ছিদ্রান্বেষণ না করা

প্রতিটি মানুষের মাঝে কিছু না কিছু দুর্বল দিক থাকে। একজন পরিপূর্ণ মুমিনের উচিত হবে মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। অপরের ছিদ্রান্বেষণ না করা। নিন্দা না-করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা বেশি বেশি অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চই কোন কোন অনুমান পাপজনক হয়ে থাকে। আর তোমরা কারও দোষ অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের গীবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চই আল্লাহ বড়ই তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[১৯২]

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।"[১৯৩]

দুঃখের কথা হলো, আমাদের সমাজের সিংহভাগ মানুষ এ জঘন্য কাজে জড়িত। এমন লোক খুজে পাওয়া কষ্টসাধ্য, যে গিবতের সাথে জড়িত নয়। ঘরবাড়ি, অফিস-কারখানা, রাস্তাঘাট সবখানে গিবত বা পরনিন্দার চর্চা হচ্ছে জোরেশোরে। আল্লাহ তা'য়ালা এ ধরনের লোক থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়েছেন। আল কুর'আন বলে :

وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ- هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ- عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ

"আর তুমি আনুগত্য করো না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির, যে বেশি কসমকারী, লাঞ্চনা, পেছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখোরী করে বেড়ায়, ভালো কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ।"[১৯৪]

রাসূলে করিম (স.) এর হাদিসেও আমরা এ সংক্রান্ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাই :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

আদম ইবন আবু ইয়াস (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, "যে ব্যাক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানী বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার আগে যে দিন তার কোন দ্বীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোন সৎকর্ম

১৯২. আল-কুর'আন, ৪৯:১২

১৯৩. আল-কুর'আন, ১০৪:১

১৯৪. আল-কুর'আন, ৬৮:১০-১৩

থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।"[১৯৫]

এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহর কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন।"[১৯৬]

সৎকাজে সহযোগিতা করা

ভাল কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিযোগিতা করা মুমিনের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এতে কর্মীরা কাজের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ -

"আর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি দিক, যে দিকে সে মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রে সমবেত করবেন। নিশ্চই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[১৯৭]

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

"সুতরাং তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর।"[১৯৮]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِیْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-

"আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্যসহ এ কিতাব যা সত্যায়নকারী পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের এবং সংরক্ষণকারী তাতে যা আছে তার। সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি নির্দিষ্ট শরিয়াত ও নির্দিষ্ট পন্থা। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার মাধ্যমে। অতএব নেক কাজের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে বিষয় যাতে তোমরা মতভেদ করতে।"[১৯৯]

---

১৯৫. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২২৮৭

১৯৬. সুনানু ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৫৩৬

১৯৭. আল-কুর'আন, ২:১৪৮

১৯৮. আল-কুর'আন, ৫:৪৮

১৯৯. আল-কুর'আন, ৫:৪৮

হাদিস শরীফে এসেছে : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন : "তোমরা সৎকাজে দ্রুত অগ্রসর হও। শীঘ্রই অন্ধকার রাতের মত ফেতনা দেখা দিবে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, সকাল বেলা একজন মানুষ মুমিন থাকবে আর সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। তারা পার্থিব সামান্য স্বার্থে নিজের ধর্ম বিক্রি করে দিবে।"[২০০]

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা

ওয়াদা দিয়ে তা রক্ষা করা একজন মুমিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। একজন দাঈর জন্য তা অত্যাবশ্যক। তিনি সর্বদাই কথা দিয়ে কথা রাখার চেষ্টা করবেন। আর প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা মুনাফেকীর লক্ষণ। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ -

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু, সেগুলো ছাড়া যা তোমাদের কাছে বর্ণিত হচ্ছে, তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হালাল মনে করবে না। নিশ্চই আল্লাহ আদেশ করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।"[২০১]

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

"আর প্রতিশ্রুতি পালন করো, নিশ্চই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[২০২]

এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল (স.) বলেছেন : "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।"[২০৩]

সালাম দেয়া

পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে প্রত্যেক জাতির মাঝে সালাম বা অভিবাদনের রীতি প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে এ রীতি-পদ্ধতির মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। ইসলামি সালাম রীতি একই যা আদি পিতা আদম(আ.) থেকে চলে আসছে। মুসলিমদেরকে সালামের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً-

"যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন।"[২০৪]

---

২০০. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৬৪

২০১. আল-কুর'আন, ৫:১

২০২. আল-কুর'আন, ১৭:৩৪

২০৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৩৭৬

২০৪. আল-কুর'আন, ২৪:৬১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং তার বাসিন্দাকে সালাম কর। ওটা তোমাদের জন্য উত্তম। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[২০৫]

وَ اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا-

"যখন তোমরা সালাম কর উত্তম পন্থায় সালাম কর। অথবা সালাম দাতার কথাগুলোই উত্তরে বলে দিবে।"[২০৬]

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ-

"তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম।"[২০৭]

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ -

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনয়ন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন উপায় নির্দেশ করব না, যা অবলম্বন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে।"[২০৮]

عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ . متفقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِي: وَالصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ-

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন : "আরোহী পায়ে হাটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে।"

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "ছোট বড়কে সালাম দেবে।"[২০৯]

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ، فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ . رواه الترمذي -

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূল (স.) বললেন, "হে বৎস, তোমার বাড়িতে যখন তুমি প্রবেশ করবে, তখন সালাম দাও, তাহলে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য তা বরকতময় হবে।"[২১০]

---

২০৫. আল-কুর'আন, ২৪:২৭

২০৬. আল-কুর'আন, ৪:৮৬

২০৭. আল-কুর'আন, ৫১:২৪-২৫

২০৮. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪৬৩১

২০৯. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬২৩১

২১০. জামে'আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৬৯৮

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا انْتَهى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقّ مِنَ الآخِرَةِ -

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "যখন তোমাদের কেউ সভায় পৌছবে তখন সালাম দেবে। আর যখন সভা ছেড়ে চলে যাবে, তখনও সালাম দেবে। কেননা, প্রথম সালাম শেষ সালাম অপেক্ষা বেশি উত্তম নয়।"[২১১]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বিষয়ে সতর্ক-সাবধান থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবিরা গুনাহ। কুর'আন-হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একজন মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ও মেলবন্ধন টিকিয়ে রাখা। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করলে তাদের প্রাপ্য হক বিনষ্ট হয়। আল্লাহ এ হক রক্ষা করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَ اٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا-

"আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হক তাদের দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরকেও।"[২১২]

وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ

"এবং যারা আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা সংযুক্ত রাখে (আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে), নিজেদের প্রভুকে ভয় করে ও কঠিন হিসাবের আশংকায় থাকে।"[২১৩]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে রাসূল (স.) হাদিসে কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন :

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي، سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ. وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ فَهْوَ لَكِ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)".

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবি (স.) বলেছেন : "আল্লাহ যাবতীয় সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। যখন তিনি সৃষ্টি কাজ সমাধা করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠলো, সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার আশ্রয় লাভকারীদের এটাই যথাযোগ্য স্থান। তিনি (আল্লাহ) বললেন, হ্যা তুমি কি এতে খুশি নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। সে (রক্ত সম্পর্ক) বললো, হ্যা আমি সন্তুষ্ট হে আমার রব, আল্লাহ বললেন, তা হলে এ মর্যাদা তোমাকে

২১১. সুনানু আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫২০৮
২১২. আল-কুর'আন, ১৭:২৬
২১৩. আল-কুর'আন, ১৩:২১

দেয়া হলো। রাসূল (স.) বলেছেন, তোমরা ইচ্ছে করলে (এ আয়াতটি) পড় "ক্ষমতা পেলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭/২২)[২১৪]

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ . فَقَالَ " لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ "

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশার (র.) ..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.), আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি; কিন্তু তারা আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করে থাকি; কিন্তু তারা আমার অপকার করে। আমি তাদের সহনশীলতা প্রদর্শন করে থাকি আর তারা আমার সঙ্গে মূর্খসুলভ আচরণ করে। তখন তিনি বললেন, "তুমি যা বললে, তাহলে যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয় তুমি যেন তাদের ওপর জলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করছ। আর সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবে, যতক্ষণ তুমি এ অবস্থায় বহাল থাকবে।"[২১৫]

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (স.) বলেছেন : "সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যে বিনিময়ের স্বার্থে তা রক্ষা করে। বরং সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী যার সাথে তা ছিন্ন করার পর পুনঃস্থাপন করে।"[২১৬]

প্রতিবেশির হক আদায় করা

প্রতিবেশি আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরাখবর নেয়া জরুরী। যারা প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়, তারা জান্নাতে যাবে না। এ গুনটির মাধ্যমে একজন দা'ঈ সমাজের অন্য লোকদের প্রিয়ভাজন হতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুর'আনে বলেন :

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا

"আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরিক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিনসকিনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশি ও দূর প্রতিবেশি এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চই আল্লাহ অহংকারী-দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।"[২১৭]

২১৪. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫৯৮৭

২১৫. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৫৫৮

২১৬. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫৫৩২

২১৭. আল-কুর'আন, ৪:৩৬

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ "

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশিকে জ্বালাতন না করে। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।"[২১৮]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ـ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (স.) বলতেন, "হে মুসলিম মহিলাগণ, কোন প্রতিবেশি মহিলা যে তার অপর প্রতিবেশি মহিলাকে (হাদিয়া ফেরত দিয়ে) হেয় প্রতিপন্ন না করে। তা ছাগলের পায়ের ক্ষুরই হোক না কেন।"[২১৯]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধ করা মুসলিমদের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ। তিনি বলেন :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম।"[২২০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

মুমিন পুরুষ ও নারী তারা পরস্পরের বন্ধু শুভাকাঙ্খী। তারা ভালকাজের আদেশ করে এবং মন্দকাজের নিষেধ করে। তারা আল্লাহকে মান্য করে, তার রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। নিশ্চই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[২২১]

হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন :

২১৮. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬০১৮
২১৯. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬০১৭
২২০. আল-কুর'আন, ৩:১০৪
২২১. আল-কুর'আন, ৯:৭১

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ -.

"সে সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তোমাদের ওপর তার পক্ষ থেকে বিশেষ শাস্তি পাঠাবেন। তখন তোমরা তাকে ডাকবে; অথচ তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না।"[২২২]

জাবির (রা.) বলেন, নবি করিম (স.) বলেছেন : "শহিদদের সর্দার হচ্ছেন হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিব এবং সে ব্যক্তিও শহিদদের সর্দার যে অত্যাচারী নেতার নিকটে গেল এবং তাকে ভাল কাজের আদেশ করল এবং মন্দ কাজের নিষেধ করল। তখন সে তাকে হত্যা করল।"[২২৩]

মেহমানের সমাদর করা

অতিথি নিকটাত্মীয় হোক কিংবা দূর সম্পর্কের আত্মীয় হোক তাদের মর্যাদানুসারে সাধ্যমত আদর-যত্ন করা এবং যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য একান্ত কর্তব্য। মেহমান আপ্যায়নের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কেই সচেষ্ট হতে হবে।অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা সর্বাধিক। তারা প্রয়োজনীয় উপকরণ এনে দিলে ঘরের মহিলারা তা প্রস্তুত করে দিতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সদিচ্ছার অভাবে ঘরে পর্যাপ্ত দ্রব্যাদি থাকার পরেও অতিথি আপ্যায়ন যথাযথ হয় না। তাই নর-নারী উভয়কেই অতিথি আপ্যায়নে সচেষ্ট হতে হবে। উভয়ের প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছায়ই অতিথি আপ্যায়ন যথোপযুক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা বেশি থাকা প্রয়োজন। মেহমান আপ্যায়নের ব্যাপারে ইবরাহীম (আ.) এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন :

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ- فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ- فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ -

"তোমাদের নিকট কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানের কথা পৌছেছে? যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করল, তখন তারা বলল, সালাম। তিনিও বললেন, সালাম। তারা ছিল অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি ঘরে গিয়ে ভুনাকৃত একটি বাছুর এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন এবং বললেন, তোমরা খাচ্ছ না কেন?"[২২৪]

ইবরাহীম (আ.) এর নিকট আগত মেহমানগণ ছিলেন ফেরেশতা। তারা মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তারা ছিলেন অপরিচিত। ইবরাহীম (আ.) তাদের জন্য দ্রুত খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যত দ্রুত সম্ভব অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা জরুরী। মেহমানদের সমাদর করার ব্যাপারে রাসূল (স.) অতীব গুরুত্বারোপ করেছেন :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ . فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ . فَقَالَ " مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ . قَالَتْ لاَ إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي . قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ

২২২. জামে'আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২১৬৯

২২৩. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৩০২

২২৪. আল-কুর'আন, ৫১:২৪-২৭

بِشَىْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ . قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স.) এর নিকট এসে বলল, আমি ক্ষুধার্ত। তখন রাসূল (স.) তার কোন স্ত্রীর কাছে খাবারের খোজে লোক পাঠালে তিনি বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ, আমার নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তারপর তিনি অন্য এক স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তারা সকলেই একই কথা বললেন। তখন রাসূল বললেন, আজ রাতে কে লোকটির মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। এসময়ে জনৈক আনসার ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.), আমি। এরপর লোকটিকে নিয়ে আনসারী নিজ গৃহে গেলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে, তখন আলোটা নিভিয়ে দিবে। তুমি তাকে দেখাবে যে আমরাও খাচ্ছি। সে যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন আলোর নিকট গিয়ে তা নিভিয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা বসে রইল। আর মেহমান খেতে লাগল। সকালে আনসার লোকটি যখন রাসূল (স.) এর নিকট আসল, তখন রাসূল (স.) বললেন : "আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমরা দুজনে যে আচরণ করেছ, তাতে আল্লাহ তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।"[২২৫]

ত্যাগের মানসিকতা

ত্যাগ তিতীক্ষা ছাড়া পৃথিবীতে মহান কোন বিষয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উশৃংখল এবং পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য প্রত্যেক যুগে নবি রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। দ্বীন ইসলামের প্রচারের জন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে লাঞ্চিত হয়েছেন সকলেই। এমনকি অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন এবং প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে দেশত্যাগেও বাধ্য হয়েছেন অনেকেই। দ্বীন প্রচারে নবি রাসূলগণের অসামান্য ত্যাগের এসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ কুর'আনুল কারিমে। পবিত্র কুর'আনে নূহ (আ.) এর কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِیۡ لَیۡلًا وَّ نَهَارًا - فَلَمۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَآءِیۡۤ اِلَّا فِرَارًا - وَ اِنِّیۡ کُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوۡۤا اَصَابِعَهُمۡ فِیۡۤ اٰذَانِهِمۡ وَ اسۡتَغۡشَوۡا ثِیَابَهُمۡ وَ اَصَرُّوۡا وَ اسۡتَکۡبَرُوا اسۡتِکۡبَارًا -ثُمَّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا - ثُمَّ اِنِّیۡۤ اَعۡلَنۡتُ لَهُمۡ وَ اَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ اِسۡرَارًاۙ-

"তিনি (নূহ) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে আঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি তাদেরকে আহ্বান করি প্রকাশ্যে, পরে আমি উচ্চস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।"[২২৬]

ব্যাক্তিগত স্বার্থ, ভোগ বিলাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে দিন রাত এক করে হযরত নূহ (আ.) কিভাবে তার কাওমকে একক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরন এ আয়াতে কারিমা।

২২৫. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫১৮৬

২২৬. আল-কুর'আন, ৭১:৫-৯

হযরত ইবরাহীম (আ.) অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও এক মূহুর্তের জন্য বিচলিত হননি। বরং মহান রবের ওপর ভরসা রেখে নিজেকে জ্বলন্ত আগুনের গর্ভে সপে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় তিনি বলে উঠলেন :

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[২২৭]

প্রায় বার্ধক্যে পৌছে আল্লাহর নিকট থেকে অমূল্য উপহার হিসাবে পাওয়া একমাত্র সন্তানকে মহান আল্লাহর নির্দেশে মক্কার মরুভূমির ভিতরে রেখে আসলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। আল্লাহর আদেশ পালনে কোন ধরনের মনুষ্য আবেগ উনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্ত্রী সন্তানকে দূরে রাখার সিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন অবিচল। তাদেরকে রেখে আসার সময় তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করলেন :

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡزُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ-رَبَّنَآ اِنَّکَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِیۡ وَ مَا نُعۡلِنُ ؕ وَ مَا یَخۡفٰی عَلَی اللّٰہِ مِنۡ شَیۡءٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ-

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক, এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আামাদের প্রতিপালক, তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।"[২২৮]

সন্তান একটু বড় হয়ে মক্কায় ফেরার পর আবারো তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। আদরের সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করার হুকুম আসল। তিনি এখানেও কালক্ষেপন করলেন না। প্রিয় সন্তানকে ডেকে এনে আল্লাহর নির্দেশের কথা জানালেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَہُ السَّعۡیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیۡۤ اَرٰی فِی الۡمَنَامِ اَنِّیۡۤ اَذۡبَحُکَ فَانۡظُرۡ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ ۫
سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ مِنَ الصّٰبِرِیۡنَ-فَلَمَّاۤ اَسۡلَمَا وَ تَلَّہٗ لِلۡجَبِیۡنِ- وَ نَادَیۡنٰہُ اَنۡ یّٰۤاِبۡرٰہِیۡمُ-قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡیَا ۚ اِنَّا
کَذٰلِکَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ-اِنَّ ہٰذَا لَہُوَ الۡبَلٰٓؤُا الۡمُبِیۡنُ-

"অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বলল, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইব্রাহীম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।"[২২৯]

২২৭. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪৫৬৩

২২৮. আল-কুর'আন, ১৪:৩৭-৩৮

২২৯. আল-কুর'আন, ৩৭:১০২-১০৬

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনী ত্যাগ তিতীক্ষার এক মহাকাব্য। দ্বীন প্রচার থেকে বিরত রাখতে কাফির মুশরিকরা তাকে ভোগ বিলাসী জীবনের প্রস্তাব দিতে থাকেন একের পর এক। তিনি সব প্রস্তাবকে নির্দ্বিধায় পদদলিত করেছেন। তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন :

"চাচাজান, আল্লাহর শপথ, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু আমি কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।"

রাসূল (স.) এর সাথে সাহাবিগণ ত্যাগ ও কুরবানির দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হিজরতের আগে মক্কায় থাকাবস্থায় যে সকল সাহাবি ইসলাম কবুল করেছেন তাদের বেশিরভাগকেই ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। বিলাল (রা.) কে মরুভূমির উত্তপ্ত বালির ওপর বস্ত্রহীন শরীরে শুইয়ে রাখা হত। খাবয়াব (রা.) কে জ্বলন্ত কয়লার উপরে রেখে বুকের ওপর বড় পাথর দ্বারা চাপা দেয়া হত। এমনিভাবে ইসলামের জন্য মক্কায় প্রায় দশ বছর সাহাবিগণ ত্যাগ স্বীকার করেছন। হিজরতের রাতে রাসূল (স.) আবু বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। মক্কার একটু দূরে সাওর গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আবু বকর প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। গর্তের ভিতরটা ভাল করে পরিষ্কার করে রাসূল (স.) কে ডাকলেন। গর্তের এক পাশে কিছু ছিদ্র ছিল। নিজের কাপড় টুকরো টুকরো করে তিনি ছিদ্রপথের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দুটো ছিদ্র মুখ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আবু বকর (রা.) ছিদ্র দুটোর মুখে নিজ পদদ্বয় স্থাপন করলেন। রাসূল (স.) আবু বকর (রা.) এর উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে আবু বকর (রা.) এর পায়ে সাপ কিংবা বিচ্ছু দংশন করল। তিনি বিষের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন অথচ নড়াচড়া করলেন না এ ভয়ে যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। এদিকে বিষের তীব্রতায় তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং সে অশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ল রাসূল (স.) এর পবিত্র মুখমণ্ডলের ওপর। এর ফলে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর, তোমার কী হয়েছে? আবু বকর (রা.) উত্তর দিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, গর্তের ছিদ্র পথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে।"[২৩০]

সাইয়েদ কুতুব শহিদ (র.) বলেন, "স্বর্ণ যেমন পুড়িয়ে খাটি করা হয় তেমনি প্রথম যুগের তাওহিদি কাফেলার সদস্যদেরও যুলুম-নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট করে প্রথমে খাটি মানুষে পরিণত করা হয়েছিল। এমনিভাবে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে যখন আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রমাণিত হলো, যখন তারা তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককে যথার্থরূপে চিনতে শিখলেন, নফসের কুপ্রবৃত্তির আনুগত্যসহ আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কর্তৃপক্ষের আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভ করলেন, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ছাপ তাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে গেল, তখনই তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নুসরাত বা সাহায্য আসা শুরু হলো।"[২৩১]

এগুলোই আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের সঙ্গীদের ত্যাগ তিতীক্ষার বর্ণনা। ইসলাম প্রচারে ব্রত ব্যক্তিগণ এসকল কাহিনী থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবেই আসবে সফলতা।

---

২৩০. আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত,পৃ.১২১

২৩১. প্রাগুক্ত, পৃ.২০৯

নবি ও রাসূলগণের দাওয়াত

পৃথিবীতে প্রেরিত প্রত্যেক নবি রাসূলই নিজ নিজ কওম তথা জাতির নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিয়েছেন মহান রবের নির্দেশনা মোতাবেক। এ দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে অনেক অত্যাচার, নির্যাতন, অবহেলা, অবজ্ঞা, লাঞ্চনা, বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। তারপরও তারা এক মুহূর্তের জন্য 'এক ইলাহ' এর বাণী প্রচার থেকে বিরত থাকেননি। পথহারা কোন জাতির নিকট যখনই কোন নবি রাসূল এসেছেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে, ঠিক তখনই তার কওমের লোকজন তাকে পাগল বা উন্মাদ বলে সাব্যস্ত করেছে। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে নবি রাসূলগণের দাওয়াতের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে নিম্নরূপ :

হযরত নূহ (আ.) এর দাওয়াত

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

"আমি নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন, হে জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের জন্য একটি বড় আযাবের ভয় পোষণ করি।"[২৩২]

হযরত হুদ (আ.) এর দাওয়াত

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ-

"এবং 'আদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'হুদ' কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। এর পরেও কি তোমরা ভয় করে চলবে না।"[২৩৩]

হযরত সালেহ (আ.) এর দাওয়াত

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ-

"এবং 'সামুদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'সালেহ' কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই।"[২৩৪]

হযরত লুত (আ.) এর দাওয়াত

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ-

"এবং লুত যখন নিজ জাতির লোকদের বললেন, তোমরা এমন সব নির্লজ্জ কাজ করছো যে, তোমাদের আগে দুনিয়ায় কেউ এ কাজ করেনি। তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম বাসনা চরিতার্থ করছো; বরং তোমরা সীমালংঘনকারী একটি জাতি।"[২৩৫]

---

২৩২. আল-কুর'আন, ৭:৫৯

২৩৩. আল-কুর'আন, ৭:৬৫

২৩৪. আল-কুর'আন, ৭:৭৩

২৩৫. আল-কুর'আন, ৭:৮০-৮১

হযরত শোয়াইব (আ.) এর দাওয়াত

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ-

"আর মাদিয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছি। তিনি বলেন; হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল এসে গেছে। অতএব ওজন ও পরিমাপ পূর্ণমাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্থ করে দিওনা এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন তা সংশোধন ও সংস্কার হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।"[২৩৬]

হযরত ইউসুফ (আ.) এর দাওয়াত

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭاِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭاَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-

"হে কারা বন্ধুগণ, বিভিন্ন রব কি উত্তম না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে অবাস্তব নামের পুজা করছ, যাদেরকে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, আল্লাহ তো সেগুলো সমন্ধে কোন প্রমাণ পাঠাননি। নিশ্চই হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, একনিষ্টভাবে কেবলমাত্র তারই ইবাদত করবে। এটিই হচ্ছে তোমাদের জন্য স্থায়ী বিধান।"[২৩৭]

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দাওয়াত

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ-

"স্মরণ কর ইবরাহীমের ঘটনা, যখন তিনি তার পিতা আজরকে বলেছিলেন, তুমিতো মূর্তিগুলোকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছ। আমিতো তোমাকে এবং তোমার জাতিকে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।"[২৩৮]

হযরত মুসা (আ.) এর দাওয়াত

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۭ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ-

"স্মরণ কর যখন আমরা বনি ইসরাইলদের নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকিনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মানুষের সাথে সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা বলবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় রয়ে গেছ।"[২৩৯]

---

২৩৬. আল-কুর'আন, ৭:৮৫

২৩৭. আল-কুর'আন, ১২:৩৯-৪০

২৩৮. আল-কুর'আন, ৬:৭৪

২৩৯. আল-কুর'আন, ২:৮৩

হযরত ঈসা (আ.) এর দাওয়াত

لَقَدۡ كَفَرَ الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡمَسِيۡحُ ابۡنُ مَرۡيَمَ‌ؕ وَ قَالَ الۡمَسِيۡحُ يٰبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اعۡبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىۡ وَ رَبَّكُمۡ‌ؕ اِنَّهٗ مَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِ الۡجَنَّةَ وَ مَاۡوٰٮهُ النَّارُ‌ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ۔

“এবং মসীহ তো বলেছিল; হে বনী ইসরাইলের লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমারও রব তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যে শরিক করেছে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম। এ যালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই।”[২৪০]

পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী রাসূলের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দেয়া। আর এ পবিত্র দায়িত্ব পালনে উনারা নিজেদের জিন্দেগিকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। সকল প্রকার অপশক্তিকে উপেক্ষা করে বিশ্বময় দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

২৪০. আল-কুর'আন, ৫:৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার

আল্লাহর রাসূল (স.) অবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধি। আল্লাহর আদেশে তিনি মানবের কর্ম ও চরিত্রের পাশাপাশি তার এ-মানস এবং বিশ্বাস ও চেতনাকে পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবতার জন্য ঐ দুই পরশ পাথর রেখে গেছেন, যার স্পর্শে মানবের সকল 'লোহা' খাটি 'সোনায়' পরিণত হতে পারে। সে দুই পরশপাথর হচ্ছে-আল কুর'আন এবং আসসুন্নাহ। তারপরও কিছু পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর থেকে বিভিন্ন সময় রাসূলের প্রবর্তিত দ্বীন ইসলামের মধ্যে মনগড়া, বানোয়াট, ভিত্তিহীন অনেক কিছু সংযোজন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। যেগুলোকে আরবীতে বিদ'আত এবং বাংলায় কুসংস্কার বলা হয়। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর সমকালীন সময়ে বাংলাদেশ এবং আসাম অঞ্চলে কুসংস্কার মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনে জেকে বসেছিল। বিধর্মীয়, বিজাতীয় সংস্কৃতি মুসলিমদের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করছিল। সাধারণ মুসলিমগণ এসব বিদ'আতের ভীড়ে নিজেদের ধর্মকর্ম এবং সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছিল। এ অধ্যায়ে বিদ'আত বা কুসংস্কার সম্পর্কিত মৌলিক আলোচনা এবং সেসময়কার কিছু বিদ'আত নিম্নে বর্ণনা করা হল:

বিদ'আতের পরিচয়

বিদ'আত শব্দটি আরবি ع د ب শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হল পূর্বের কোন দৃষ্টান্ত ও নমুনা ছাড়াই কোন কিছু সৃষ্টি ও উদ্ভাবন করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ-

"পূর্বের কোন নমুনা ব্যতীত আল্লাহ তায়া'লা আকাশ ও যমিনন সৃষ্টি করেছেন।"[২৪১]

তিনি আরো বলেন :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ-

"হে নবি, আপনি বলে দিন, আমি প্রথম রাসূল নই।"[২৪২]

اَلشَّيْءُ الْمُخْتَرَعُ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ-

"পূর্ববর্তী কোন নমুনা ছাড়াই নতুন আবিষ্কৃত বিষয়।"[২৪৩]

"এ সকল অর্থের প্রতি খেয়াল করে বিদ'আতকে বিদ'আত বলা হয়েছে সুতরাং এমন ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা বা কাজ যার কোন দলিল শরিয়তে নেই। এ বিদ'আতির পূর্বে আল্লাহর রাসূল অথবা তার কোন সাহাবি বলেননি বা করেননি, যার কোন ইঙ্গিত দ্বীনে বা কুর'আনে অথবা সহিহ সুন্নাহতে নেই, নতুনভাবে তাই বিশ্বাস করা, বলা বা

২৪১. আল-কুর'আন, ২:১১৭

২৪২. আল-কুর'আন, ৪৬:৯

২৪৩. কাওয়ায়েদে মা'রিফাতিল বিদ'আহ, পৃ.১৭

করাকে, যা আসল শরিয়তের সমতুল্য মনে করা হয় এবং অতিরঞ্জন করে তা পালনীয় ধর্মীয় রীতি স্বরূপ করার উদ্দেশ্যে হয় তাকে বিদ'আত বলে।"[২৪৪]

আর শরী'আতের পরিভাষায় :

مَا أُحْدِثَ فِي دِيْنِ اللهِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عَامٌ وَلاَخَاصٌّ يَدُلُّ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ আল্লাহর দীনের মধ্যে নতুন করে যার প্রচলন করা হয়েছে এবং এর পক্ষে শরী'আতের কোন ব্যাপক ও সাধারণ কিংবা খাস ও সুনির্দিষ্ট দলিল নেই।[২৪৫]

"৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবন দুরাইদ (৩২১ হি.) বলেন, বাদা'আ অর্থ কোন কিছু শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 'বাদী', অর্থাৎ উদ্ভাবক ও অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব-দাতা বা সৃষ্টিকর্তা। যে ব্যক্তি কোন বিষয় নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে সে তার বিদ'আত-কারী বা উদ্ভাবক। ইসম বিদ'আত।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ আল-জাওহারী (৩৯৩ হি.) বলেন, আল-বিদ'আত অর্থ পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন।

ফাইরোয-আবাদী (৮১৭ হি.) বলেন : বিদ'আত হল পূর্ণতার পরে দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন, অথবা রাসূলুল্লাহ (স.) এর পরে যে মতবাদ বা কর্ম উদ্ভাবিত হয়েছে।

আল্লামা ইবন নুজাইম (৭৯০ হি.) আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলেন : আল-মগরিব গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিদ'আত শব্দটি ইবতাদআ ফি'ল থেকে গৃহীত ইসম। ফিলটির অর্থ শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। অতঃপর দ্বীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ'আত শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে।

শুম্মানী বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেন : রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুর'আন-সুন্নাহর বক্তব্য ভুল বুঝার কারণে এবং ভাল মনে করে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং যাকে সঠিক দ্বীন ও সিরাতে মুস্তাকিম বানিয়ে দেয়া হয়েছে তাই বিদ'আত।

আল্লামা ইবরাহীম ইবন মূসা আশ-শাতিবী (৭৯০ হি.) বলেন, বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীনের মধ্যে শরিয়তের পদ্ধতির তুল্য কোন নব-আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত তরিকা বা পদ্ধতি। মহান আল্লাহর অতিরিক্ত ইবাদতের আশায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আলী আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি.) তার আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে বিদ'আতের পরিচয়ে বলেন, বিদ'আত হলো, রাসূলুল্লাহ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যতিক্রম কোন বিশ্বাস, যে ব্যতিক্রমের কারণ ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা নয়, বরং কুর'আন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা।"[২৪৬]

---

২৪৪. আব্দুল হামিদ ফাইযী আল মাদানী, বিদআত দর্পণ, পৃ.১

২৪৫. কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদ'আহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

২৪৬. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামি আকিদা (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৩৯-২৪০

"the belief that particular events happen in a way that cannot be explained by reason or science; the belief that particular events bring good or bad luck."[২৪৭]

ইসলামের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় দ্বীনের মধ্যে এমন বিষয় তৈরি করা, যা রাসূলুল্লাহ (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ছিলনা বরং পরবর্তীতে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

"কুসংস্কার : ইংরেজি (superstition) হল অযৌক্তিক যেকোন বিশ্বাস বা অভ্যাস। যেমন : এটি অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়, বিজ্ঞান বা এর কার্যকারিতা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া, ভাগ্য বা জাদুতে ইতিবাচক বিশ্বাস অথবা যা অজানা তা থেকে ভয় পাওয়া। এছাড়াও 'কুসংস্কার' বলতে ধর্মীয় বিশ্বাস বা অযৌক্তিকতা থেকে উদ্ভূত কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। কুসংস্কার শব্দটি প্রায়ই একটি নির্দিষ্ট সমাজের বেশিরভাগের দ্বারা অনুসরণ না করা ধর্মের কথা বলে ব্যবহৃত হয়, যদিও প্রথাগত ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এটি সাধারণত ভাগ্য, ভবিষ্যদ্বাণী এবং নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক জগতের বিশেষ করে বিশ্বাস এবং অভ্যাসগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করে এ ধারণাটি যে নির্দিষ্ট (আপাতদৃষ্টিতে) সম্পর্কহীন পূর্বের ঘটনাগুলো দ্বারা ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোর জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে।

কুসংস্কার শব্দটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয়েছিল যা মূলত ফরাসি সুপারস্টিশন থেকে নেয়া। ইংরেজি বিশেষ্য হিসাবে সর্বপ্রথম পরিচিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ফ্রায়ার ডাউস রিপ্লাই (সিএ.১৪২০), যেখানে কুসংস্কার শব্দের জন্য চারটি শব্দ সুপারিশ করা হয়েছিল, যেমন কেডিশিয়াস, সুপারস্টিশনস, বি গ্লুটোনস, এবং বি প্রাউড। ফ্রেঞ্চ শব্দটি তার রোম্যান্স কর্তাগুলোর সাথে (ইতালীয় সুপারস্টিজিওন, স্প্যানিশ সুপারস্টেসন, পর্তুগিজ সুপারস্টাইকো, কাতালান সুপারস্টিকো) ল্যাটিন সুপারস্টিশিও টি অব্যাহত রেখেছিল।

যদিও ল্যাটিন শব্দ গঠনটি স্পষ্ট, ক্রিয়া থেকে সুপার-স্টেচার, দাড়ানো, বেচে থাকা, তা মূল উদ্দেশ্য প্রণোদিত অর্থে স্পষ্ট নয়। এটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এমনভাবে বিস্ময় বা আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, তবে অন্যান্য সম্ভাবনাগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে যেমন অতিরিক্ত অর্থে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সম্পাদন করা, পুরাতন ও অযৌক্তিক ধর্মীয় অভ্যাস অব্যাহত রাখা।"[২৪৮]

মাওলানা সাহেবের সময়ে প্রচলিত কিছু বিদ'আত

কুসংস্কার হল নিছক ধারণা ও কল্পনা ভিত্তিক প্রমাণহীন বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস-প্রসূত ভিত্তিহীন প্রথা ও কর্ম। যে হৃদয় ও মস্তিস্ক কুর'আন-সুন্নাহর আলো থেকে বঞ্চিত তা-ই নানাবিধ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের প্রজননক্ষেত্রে পরিণত হয়। একারণে দেখা যায়, পার্থিব শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার পরও আজব আজব বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারে মানুষ লিপ্ত থাকে। এমনকি সেগুলোকেই গৌরবের বিষয় মনে করে।

আরব জাহেলিয়াতের মতো এখনও অনেক নারী-পুরুষ কুলক্ষণে বিশ্বাস করে। জপতপ, তন্ত্রমন্ত্রে আস্থা রাখে। জটাধারী ফকিরের পিছনে পিছনে ঘুরে। মূর্খ বে-শরা লোকদের অশ্লীল কথাবার্তাকে শিল্প-সংস্কৃতি গণ্য করে, এদের জীবন ও আদর্শ উদঘাটনের পিছনে জাতীয় অর্থ পানির মতো ব্যবহৃত হতে থাকে। সর্বোপরি জগতের সর্ব প্রাচীন ও

২৪৭. The Oxford English Dictionary
২৪৮. উইকিপিডিয়া

সর্ব নিকৃষ্ট কুসংস্কার-পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপুজা তো এ বিজ্ঞানের যুগেও বিপুল সংখ্যক মানবের কাছে পরম গ্রহণীয়। ন্যাক্কারজনক বিষয় এ যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশেও একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী শিক্ষাবীদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক প্রতিমা পূজা এবং প্রতিমা কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতেই প্রশান্তি খুজে বেড়ায়। মুসলিম সমাজে পৌত্তলিকতাপ্রবণ চিন্তা ও মানসিকতা ছড়িয়ে দেয়াকেই তারা অতি বড় মঙ্গলকার্য জ্ঞান করে।

এ সকল অনাচার ও কুসংস্কারের সুরক্ষায় তারা ব্যবহার করে উদারতা, আসাম্প্রদায়িকতা, পরমতসহিষ্ণুতার মতো শব্দাবলি। অথচ দেশে দেশে চরম সাম্প্রদায়িক পৌত্তলিক জনগোষ্ঠীর মুসলিম নিধনের সময় এ সকল শব্দ উচ্চারিত হয়। মুসলিম কখনো আদর্শত্যাগী অর্থে উদার হতে পারে না। ধর্মত্যাগী অর্থে অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না এবং ইসলাম, কুর'আন, ইসলামের নবি এবং মুসলিম ভাইবোনের জান-মাল ইজ্জত-আব্রুর বিষয়ে নির্জীব ও নিস্পৃহ অর্থে পরমতসহিষ্ণু হতে পারে না। মুসলিম যে উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী তা সত্যিকার অর্থেই উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং পরমতসহিষ্ণুতা। এর নানান উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে মুসলিম জাতির ইতিহাস-গগণ আলোকিত।

কুর'আন-সুন্নাহর আলোক বঞ্চিত মানব-সমাজে অশ্লীলতা অভিহিত হয় বিনোদন নামে। অনাচার অভিহিত হয় তারুণ্যের ধর্ম নামে। আর নারীর রূপ-যৌবন বাজারজাত হয় নারীমুক্তির নামে। সর্বোপরি চিন্তা-চেতনায় এ বিকৃতিকেই মনে করা হয় শিল্প ও প্রগতি। এ বিকৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যে শ্রেণীটি আছে তারা প্রগতিশীল নামে পরিচিত।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর সময়েও এরকম প্রগতীর ঝান্ডাধারী একদল লোক ছিল, যারা সর্বদাই বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখত। মাওলানা সাহেব এসকল কুসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

"জনাব সৈয়দ সাহেব যে সময়ে জৌনপুরী মাওলানা সাহেবকে বাংলা ও আসামে তাবলিগ ও হেদায়েতের জন্য আদেশ প্রদান করেন, তখন বাংলা ও আসামের ধর্মীয় দুর্দশা সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। রোজা ও সালাত ত্যাগ করে লোকজন যথেচ্ছা চলাফেরা করত। ধর্মের সম্পর্ক তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। ইলমে দ্বীনের সাথে এমনকি দূরবর্তী সম্পর্কও ছিলনা। বেশরা পীরদের প্রতারণা, বাজে ফকীর এবং ধোকাবাজ যোগীদের রাজত্ব সর্বসাধারনের অন্তঃকরণে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল এবং ঐসমস্ত লোকদেরকে নিজেদের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রস্থল বলে মনে করত। বিবাহ শাদিতে, অসুখে এবং বিপদাপদের সময় তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও মোনাজাত করত। আল্লাহ তা'য়ালাকে ছেড়ে আল্লাহর সৃষ্ট মানবের পূজা ও সেজদা করত। কবর, দরগাহ এবং বৃক্ষ সমূহের নামে মানত করত এবং তাদের সামনে নিজেদের আবশ্যক দরখাস্ত পেশ করত। তাদের নামে নজর করা হত। মসজিদগুলো লুপ্তাবস্থায় ছিল। আর যেগুলো অলুপ্ত ছিল সেগুলোতেও গবাদি পশু সকল বাধা হত। পর্বাদিতে হিন্দুদের রীতি-নীতি অনুসারে কাজ চলত। বেপর্দার প্রচলন আম ভাবে ছিল। মোহাররম ও গায়ের মোহাররম (যে সকল স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ নাজায়েজ) এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। পুরুষ ও মেয়ে লোকের সুর ঢাকা এবং পোশাক পরিচ্ছদের কোন ভেদাভেদ ছিল না। বেশিরভাগ লোক লেংটী পরিধান করত। হিন্দুদের আকৃতি প্রকৃতি ব্যতীত এমনকি হিন্দুদের নামে নাম রাখা হত। খারেজী ফেরকা যারা আমলকে ইমানের অংশ বলে বে-আমল লোকদেরকে কাফেরের মধ্যে গণ্য করে মুসলিমদেরকে কাফের বলত তারা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এরকম ২০টি ফেরকা (দল) ইসলামের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কর্তন করতে চেয়েছিল। মূলকথা, চারদিকেই গোমরাহি ও অন্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং ইসলামের সৌন্দর্য নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। দেশ নীচতা ও বিশৃংখলতার শেষ সীমায় পৌছেছিল। ঠিক এরূপ একটি উশৃংখল

যুগে এরূপ একজন হাদী ও সৎপথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল যিনি লোকের অন্তরে ও মস্তিষ্কে দ্রুতগতিতে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। যার পবিবর্তনের ফলে এবং মানসিক শক্তির বলে লোকের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। দেশ হেদায়েত পিপাসু ছিল ও হেদায়েতের বিশেষ আবশ্যক ছিল। এরূপ দেশে ইসলাম প্রচার ও আল্লাহ তা'য়ালার কালেমাকে উচ্চ করে ধরা জেহাদে আকবর (বৃহত্তম যুদ্ধ) ছিল। একথা হযরত সৈয়দ সাহেব, স্বয়ং জৌনপুরী মাওলানা সাহেবকে বলেছিলেন এবং শুধু ইঙ্গিত দ্বারাই তিনি এ রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এ মহান কাজ (তাবলিগ) জৌনপুরী মাওলানার দ্বারাই সমাধা করানো আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা। এজন্য মাওলানা সাহেব বাংলার মানুষের মাঝে প্রকৃত দ্বীন প্রচার ও প্রসার করাকে জীবনের উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ কাজকে স্বীয় জীবনের একটি অংশ বিশেষে বরণ করে নিয়েছিলেন। এ কাজ তিনি প্রাণপণে করে গেছেন। কাজেই তিনি তার জীবনের ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে ৫৭ বছর শুধু ধর্ম সেবায় অতিবাহিত করে গিয়েছেন। তন্মধ্যে ৫১ বছর শুধু বাংলা ও আসামে ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন এবং শেষে এখানেই রয়ে গেলেন। তিনি বাংলাদেশের রংপুরে ইন্তেকাল করেন এবং তার পবিত্র দরগাহ শরিফ রংপুর শহরের জামে মসজিদের মধ্যে অবস্থিত। যা সর্বসাধারনের জিয়ারত গাহ (দর্শনীয় স্থান) রূপে পরিণত হয়েছে।"[২৪৯]

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) সর্বদাই লড়াই করে গেছেন তৎকালীন সময়ে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ইসলামের সুমহান রীতিনীতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছেন সহজেই। নিজের জবান, লেখনী এবং সার্বিক কর্মকান্ড দিয়ে মুসলিম সমাজ থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় রত ছিলেন সারাটি জীবন। উনার দেখানো পথেই দীর্ঘ পথ হেটে চলেছেন বাংলা ও আসাম অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা।

বর্তমান সমাজে প্রচলিত আরো কিছু কুসংস্কার

মানুষ সামাজিক জীব। সে একই সঙ্গে একটি পরিবারের সদস্য, সমাজের একটি অংশ এবং একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেও গড়ে ওঠে। প্রত্যেক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কিছু নিজস্ব নিয়মনীতি, আচরণবিধি থাকে। কিছু সংস্কার ও কুসংস্কার থাকে। সমাজের সদস্য হিসেবেই মানুষ সেসব সংস্কার-কুসংস্কারকে মেনে চলে, বিশ্বাস করে। নিজেদের সংস্কৃতি ও আচার-আচরণে সে সংস্কার-কুসংস্কারগুলোকে ধারণ করে। এ সংস্কার-কুসংস্কারগুলো স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এক সমাজের কাছে যে বিষয়গুলো কুসংস্কার মনে হয়, অন্য সমাজের লোকের কাছে তা হয়তো অবশ্য পালনীয়। এ কুসংস্কার হলো মানুষের যুক্তি-বিচারহীন অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যা ধারণা। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় superstition, কুসংস্কার টিকে থাকে শুধু মানুষের বিশ্বাসের কারণে। সে যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস হতে পারে ধর্মের নামে, সামাজিকতার নামে, মতবাদ ও শাস্ত্রের নামে। দীর্ঘদিন ঐশী বার্তার জ্ঞান ও নবি-রাসূলদের সংস্পর্শ না পাওয়ায় আরব জাতির মাঝেও এ কুসংস্কার কাজ করত। কেননা, যুক্তি দিয়ে বিচার করলে কিংবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায়, কুসংস্কারের আসলে কোন ভিত্তি নেই। মানুষ তার অমঙ্গলের ভয়ে ভীত হয়ে বিভিন্ন হাস্যকর বিষয়কেও বিশ্বাস করে মেনে চলে। তাদের অন্ধ বিশ্বাসই কুসংস্কারকে অন্য সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ সেগুলোকে প্রচলিত রাখে। কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষের কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস এত দৃঢ় হয় যে, তারা কুসংস্কারগুলোকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করে। কোন রকম চিন্তা বা বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বিচার করা ছাড়াই তারা কুসংস্কারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করে।

---

২৪৯. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, অনুবাদ-মৌলবি আছমত আলী, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী, (ঢাকা : দি সিটি প্রেস), পৃ. ৩৯-৪১

ইসলামে কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। এ কুসংস্কারের জন্যই আল্লাহর ওপর আস্থা ও ধর্মবিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি পরম নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল বহুলাংশে লোপ পায়। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের মানুষগুলো অনেক বেশি সহজ-সরল। তারা নিজের অজান্তে অনেক কিছুকেই ইসলামের বিধান হিসেবে মনে করে। সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে তারা কুলক্ষণ-সুলক্ষণ বলে ধারণা করে। আসলে ইসলামে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়ে বলেন :

فَاِذَا جَآءَتۡهُمُ الۡحَسَنَةُ قَالُوۡا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوۡا بِمُوۡسٰى وَ مَنۡ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ

"যখন তাদের (ফেরাউন ও তার প্রজাদের) কোন কল্যাণ দেখা দিত তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোন অকল্যাণ হত, তারা তখন মূসা ও তার সাথীদের অলুক্ষণে বলে গণ্য করত। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।"[২৫০]

বর্তমান সমাজে ধর্মের নামে কিংবা সামাজিকভাবে অনেক কুসংস্কারের প্রচলন রয়েছে, যেগুলো মানুষকে ধীরে ধীরে শিরক এবং কুফুরিতে লিপ্ত করতে পারে। বিনষ্ট করতে পারে মুমিনের ঈমান-আমল। অথচ মানুষের ঈমান-আমল বিনষ্টকারী কুসংস্কার থেকে বেচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। প্রচলিত এসব কুসংস্কার থেকে মানুষকে সতর্ক করতে দেশের নানান অঞ্চলে প্রচলিত কুসংস্কার সমূহ তুলে ধরা হলো :

- দোকানের প্রথম কাস্টমার ফেরত দিতে নেই।
- পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ডিম খাওয়া যাবে না। তাহলে পরীক্ষায় ডিম (গোল্লা) পাবে।
- আঙ্গুলের ইশারায় কবর দেখালে সে আঙ্গুল পচে যায়।
- নতুন বউকে শ্বশুর বাড়িতে নরম স্থানে বসতে দিলে বউয়ের মেজাজ নরম থাকে।
- বিড়াল মারলে আড়াই কেজি লবণ সাদকা করতে হয়।
- কুকুরকে পা দিয়ে বাড়িতে গর্ত করতে দেখলে কারো মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, এটা মনে করা।
- জোড়া কলা খেলে জমজ সন্তান জন্ম নেয়।
- রাতে নখ, চুল, দাড়ি গোফ ইত্যাদি কাটতে নেই।
- প্রথম সন্তান মারা গেলে পরের সন্তানের কান ফুটো করে দিতে হয়, তাতে সে দীর্ঘ হায়াত পায়।
- ভাই-বোন মিলে মুরগি জবাই করা যায় না।
- ঘরের ময়লা পানি রাতে ঘরের বাইরে ফেলতে হয় না, তাতে সংসারে অমঙ্গল হয়।
- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পেছন থেকে ডাক দিলে তার যাত্রা অশুভ হয়।
- ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হয়।
- কুর'আন শরিফ হাত থেকে পড়ে গেলে আড়াই কেজি চাল সদকা করতে হয়, না হলে মাথার চুল উঠে যায়।
- ছোট বাচ্চাদের দাত পড়লে তা ইদুরের গর্তে ফেলতে হয়, না হলে দাত আকাবাকা হয়।

২৫০. আল-কুর'আন, ৭:১৩১

- ভাঙ্গা কুলায় লাথি মারলে জমিনের ফসল কমে যায়।
- গর্ভবতী মহিলাকে এক কাতে শয়ন করতে নেই। এতে বাচ্চা প্রতিবন্ধী হয়।
- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পেছন দিকে ফিরে তাকানো নিষেধ; তাতে যাত্রা অশুভ হয়।
- রাতে বাশ কাটা যাবে না, শনিবারে বাশ না কাটা।
- রাতে গাছের পাতা ছিড়া ও ফল তোলা নিষেধ।
- ঘর থেকে বের হয়ে বিধবা নারী চোখে পড়লে যাত্রা অশুভ হয়।
- ঘরের চৌকাঠে বসা দরিদ্রতার লক্ষণ।
- মহিলাদের বিশেষ দিনে সবুজ কাপড়ের কিছু একটা পড়া এবং তাদের হাতের কিছু খাওয়া যায় না।
- বিধবা নারীকে অবশ্যই সাদা কাপড় পরিধান করতে হবে।
- ভাঙ্গা আয়না দিয়ে চেহারা দেখা যাবে না, তাতে অমঙ্গল হয়, চেহারার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়।
- ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে, আর বাম হাতের তালু চুলকালে বিপদ আসে।
- নতুন কাপড় পরিধান করার আগে তা আগুনে ছ্যাকা দিতে হয়।
- নতুন কাপড় পরিধান করার পর পিছনে তাকাতে নেই।
- গলায় মাছের কাটা বিধলে বিড়ালের পা ধরে মাফ চাইতে হয়।
- আশ্বিন মাসে কোন নারী বিধবা হলে তার আর কোনদিন বিয়ে হয় না।
- সোমবারের দিন কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।
- রাতে কাউকে সুই-সুতা দিতে নেই।
- গেঞ্জি ও গামছা ছিড়ে গেলে তা সেলাই করে ব্যবহার করতে মানা।
- খালি ঘরে সন্ধ্যায় বাতি দিতে হয়, না হলে বিপদ অনিবার্য।
- নবি করিম (স.)-এর নাম শুনলে হাতে চুম্বন খাওয়া, তদ্রুপ মক্কা-মদিনার ছবি দেখলে চুমু খাওয়া।
- গর্ভবতীর জন্য কোন কিছু কাটাকাটি কিংবা জবাই করা নিষিদ্ধ, তাতে বাচ্চা ঠোট কাটা জন্ম নেয়।
- পাতিলের মধ্যে খানা থাকা অবস্থায় তা খেলে পেট বড় হয়।
- বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সামনে দিয়ে খালি কলস পড়লে যাত্রা অশুভ হয়।
- ছোট বাচ্চাদের শরীরে লোহা জাতীয় কিছু বেধে দিতে হয়, তাতে সে দুষ্টু জ্বীন-শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা পায়।
- রুমাল, ছাতা, হাতঘড়ি ইত্যাদি কাউকে ধার দিতে হয় না।
- হোচট খেয়ে পড়ে গেলে ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে মনে করা।
- হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে মেহমান আসবে বলে মনে করা।
- নতুন বউ কোন ভালো কাজ করলে তা শুভ লক্ষণ বলে মনে করা।
- ইষ্টি কুটুম পাখি ডাকলে বলা হয় আত্মীয় আসবে।
- তিন রাস্তার মোড়ে বসতে মানা, তাতে বংশ উজাড় হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- পর পর কয়েক সন্তান মারা যাওয়ার পর ছেলে হলে বড়শি পুড়ে তার কপালে দাগ দেয়া দরকার।
- খাওয়ার সময় ঢেকুর আসলে, খাবার আটকে গেলে কেউ তাকে স্মরণ করছে, গালি দিচ্ছে মনে করা।

- কাকের ডাক বিপদের পূর্বাভাস মনে করা।
- শকুন ডাকলে বা দেখলে কেউ মারা যাবে, এটা মনে করা।
- অনুরূপভাবে পেচার ডাককেও বিপদের কারণ মনে করা।
- মৃতের বাড়িতে ৩ দিন পযর্ন্ত মাছ-গোশত না খাওয়া, বাধ্যতামূলক নিরামিষ খাওয়া উচিত।
- দুজনের কথার ফাকে টিকটিকির আওয়াজকে কথার সত্যায়ন মনে করা।
- কারো মাথায় টোকা খেলে দ্বিতীয় বার টোকা দেয়া আবশ্যক মনে করা, না হলে মাথায় শিং গজায়- এমনটা ভাবা।
- পুরুষের বুকে লোম থাকা স্ত্রীকে ভালোবাসার পরিচায়ক মনে করা।
- নতুন জামাই বাজার না করা পর্যন্ত এক পদ দিয়ে খাওয়ানো।
- নতুন বউকে শ্বশুরালয়ে কমপক্ষে আড়াই দিন অবস্থান করতে হয়।
- পাতিলে ভাত খেলে মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়।
- কবরের খোদাইয়ের সময় প্রথম কোপের মাটি রেখে দেয়া।
- গরুর বাছুরের গলায় জুতার টুকরা ঝুলিয়ে দিলে সেটা মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বেচে থাকে।
- বিলম্বে দাত উঠলে সাত বাড়ির চাল উঠিয়ে তা রান্না করে কাককে খাওয়ানো ও নিজেও খাওয়া।
- সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর ঝাড়ু দেয়ার আগ পর্যন্ত খাওয়ার জন্য কাউকে কোন কিছু দেয়া নিষেধ।
- রাতে কোন কিছুর লেনদেন করা ভালো নয়।
- সকালে দোকান খোলে নগদ বিক্রি না করা পর্যন্ত কাউকে বাকি দেয়া নিষেধ, তাহলে সারাদিন শুধু বাকিই বিক্রি করতে হয়।
- দাড়িপাল্লা কিংবা মাপার জিনিস পায়ে লাগলে বা হাত থেকে নিচে পড়ে গেলে সেটাকে সালাম করতে হয়, না হলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়।
- হঠাৎ বাম চোখ কাপলে দুঃখ আসবে মনে করা।
- রাতে কাউকে চুন দিতে হলে তখন চুনকে চুন না বলে দই বলতে হয়।
- রাস্তায় চলা সময় হোচট খেলে পিছিয়ে পুনরায় চলা শুরু করতে হয়।
- ফলবান বৃক্ষ বা বাগানে মানুষের বদ নজর এড়াতে মাটির পাতিলে সাদাকালো রং মেখে তা ঝুলিয়ে রাখতে হয়।
- বিনা ওজুতে বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর নাম নিলে শরীরের পশম পড়ে যায়।
- সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীরা কিছু কাটলে গর্ভের সন্তান নাক-কান বা ঠোট কাটা জন্ম নেয়।
- মহিলাদের হাতে বালা বা চুড়ি না পড়লে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
- স্ত্রীর নাকে নাক ফুল পরিধান স্বামীর জন্য মঙ্গলজনক মনে করা।
- দা, কাচি বা ছুরি ডিঙ্গিয়ে গেলে তা সালাম করা। না হলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে মনে করা।
- স্বামীর নাম মুখে বলা যাবে না এতে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
- যাত্রাকালে বিড়াল দেখাকে অমঙ্গলজনক মনে করা।
- আনলাকি থারটিনে বিশ্বাস করা।
- রোগিকে ৭ ঘাটের পানি দিয়ে গোসল করানো।

- রোগিকে জোয়ার ভাটার পানি দিয়ে গোসল করানো।
- কেউ মারা গেলে লোহা বা পিতল ভিজিয়ে রাখলে তার আত্মা শান্তি পায়।
- মৃতের বাড়িতে ৩ দিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো।
- কুকুরের কান্নাকে অশুভ মনে করা।
- নতুন বউকে বাপের বাড়ি থেকে ধান এনে স্বামীর বাড়ির গোলায় রাখা।
- ঢেকির ওপর বসে আহার করলে বউ মারা যায় বলে মনে করা।[২৫১]

ধারণা ও কল্পনাভিত্তিক প্রমাণহীন বিশ্বাসের কারণেই মানুষ আজকের যুগে বাস করেও মানুষের তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুক, তাবিজ, মাদুলি, ভূত-প্রেত, ডাইনি ইত্যাদিতে অগাধ বিশ্বাস। সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এসব বিশ্বাস সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি।

২৫১. ইন্টারনেট

তৃতীয় অধ্যায়

কুসংস্কার দূরীকরণে শরয়ী নির্দেশনা

কুসংস্কার ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে একটি প্রচলিত নিয়মবিধি। যার প্রতি মানুষ অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের কর্মক্ষেত্রে এ বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই ধাবিত হয়। সাধারণত গ্রামীণ লোকাচারে এ ধরনের বিশ্বাসজাত কুসংস্কার বেশি দেখা যায়। আমাদের বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানে ও দৈনন্দিন কর্মকান্ডে এ কুসংস্কার তথা কুপ্রথার জাজ্বল্য প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ও প্রিয় নবি করিম (স.) এ কুসংস্কারজনিত বিশ্বাসকে হারাম বলে অভিহিত করেছেন। এটি শিরক ও পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সব মঙ্গল-অমঙ্গলের শক্তি ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। এ ঈমান ও বিশ্বাসের প্রতি প্রতিটি মুমিন মুসলিমের সুদৃঢ় আস্থা থাকতে হবে।

বিদ'আতের বিরুদ্ধে কুর'আনুল কারিম

পবিত্র কুর'আন মুসলিমদের জন্য অকাট্য দলিল। এ শাশ্বত দলিলেই ইসলাম ধর্মকে পূর্ণতা দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে নতুন কোন নিয়ম নীতি বা মনগড়া কোন ধারনা প্রবর্তনের সুযোগ নেই। বিদ'আতের ব্যাপারে আল কুর'আনের ভাষা অত্যন্ত কঠোর। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নিয়ামত আমি পূর্ণ করে দিলাম, আমি তোমাদের জন্য ইসলামকেই দ্বীন (জীবনবিধান) হিসেবে মনোনীত করলাম"[২৫২]

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

"এটিই আমার দেখানো পথ, এটিই অনুসরণ কর এবং অন্য কোন পথ অনুসরণ কর না, অন্যান্য পথগুলো তার পথ থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ তোমাদের এটি আদেশ করছেন যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।"[২৫৩]

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا -

"যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে আর ঈমানদারদের পথ ছেড়ে অন্য নিয়মনীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করব যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে, তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দিব, কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল সেটি।"[২৫৪]

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

"সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ ব্যাপারে ভয় করা উচিত যে তাদের ওপর (এ বিরুদ্ধাচরণের জন্য এ দুনিয়ায়) কোন ফিতনা এসে পড়বে কিংবা (পরকালে) কোন কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নেবে।"[২৫৫]

---

২৫২. আল-কুর'আন, ৫:৩

২৫৩. আল-কুর'আন, ৬:১৫৩

২৫৪. আল-কুর'আন, ৪:১১৫

২৫৫. আল-কুর'আন, ২৪:৬৩

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ -

"সেদিন (বিচার দিবসে) কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র হয়ে যাবে (আমলনামা ভাল হওয়ার কারণে) আর কিছু সংখ্যক চেহারা কাল হয়ে যাবে (আমলনামা খারাপ দেখার কারণে) যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি ঈমান এর পরও কুফরি করেছ? এখন তোমরা যা প্রত্যাখ্যান করেছ তার কারণে আযাব ভোগ করতে থাকো।"[২৫৬]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا –

"তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে এমন সব ব্যক্তির জন্য, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী আর যারা পরকালের মুক্তিলাভের আশা করে।"[২৫৭]

وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ * وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

"এবং রাসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"[২৫৮]

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

"এরা হল সেসব লোক যাদের সব প্রচেষ্টা এ দুনিয়ায়ই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথচ তারা মনে করছে তারা ভাল কাজই করে যাচ্ছে।"[২৫৯]

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

"তোমরা কখনো তাদের মত হয়োনা, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে আর (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরণের মতানৈক্য সৃষ্টি করছে; এরাই হল সেসব মানুষ, যাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।"[২৬০]

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۖۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ-

"সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? তবে তোমরা (সত্য ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?"[২৬১]

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ-

"অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও।"[২৬২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ-

---

২৫৬. আল-কুর'আন, ৩:১০৬
২৫৭. আল-কুর'আন, ৩৩:২১
২৫৮. আল-কুর'আন, ৫৯:৭
২৫৯. আল-কুর'আন, ১৮:১০৪
২৬০. আল-কুর'আন, ৩:১০৫
২৬১. আল-কুর'আন, ১০:৩২
২৬২. আল-কুর'আন, ৪:৫৯

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের (স.) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।"[২৬৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের চেয়ে আগে বাড়িও না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।"[২৬৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

"হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া ও মূর্তিপূজার বেদি এবং ভাগ্য নির্ণয়কারী শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[২৬৫]

কুর'আনে কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ'আত হচ্ছে এরূপ কর্ম যা করতে আল্লাহ নির্দেশ দেননি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উদ্ভাবন করে। আর বিদআতের প্রকৃতি এমন যে, মানুষ যদিও ইবাদতের আগ্রহ নিয়েই তা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। কারণ কোন কর্ম কতটুকু মানুষ সহজে পালন করতে পারবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি সেভাবেই বিধান দেন। ধার্মিক মানুষ ধর্মের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে আরো বেশি ভাল কাজ করার আগ্রহে কিছু নতুন কর্ম বা রীতি বানিয়ে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পালন করতে পারেন না। মহান আল্লাহ খ্রিস্টানদের বিষয়ে বলেন : "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ- এতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।"

খ্রিস্টধর্মে ও অন্যান্য সকল আসমানী ধর্মেই পার্থিব লোভ, লালসা ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে আখিরাতমুখী হওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ভোগবিলাস বাদ দিতে বলেছেন, তবে সন্ন্যাসী হতে বলেননি। আবার খ্রিস্টধর্মে সন্ন্যাসী হতে বা বিবাহশাদি না করে সংসার-বিরাগী হতে কোন নিষেধও ছিল না। ধার্মিক খ্রিস্টানগণ অনুভব করেন যে, বিবাহ ও ঘর সংসার করে দুনিয়া মুখিতা ও ভোগবিলাস থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য তারা বেশি আখেরাতমুখিতা অর্জন করার জন্য তারা 'রাহবানিয়্যাহ' বা সন্ন্যাসবাদ (Monasticism, to become a Monk) রীতি উদ্ভাবন করে। তবে তা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানবীয় বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে রীতি আবিষ্কার করা। ফলে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দিয়েছে। মধ্যযুগের খ্রিস্টান মঠগুলোর ইতিহাস পড়লেই আমরা তা জানতে পারি।[২৬৬]

সত্য সুন্দর ও মার্জিত বিষয়াদি ইসলামে অনুমোদিত। অন্যদিকে অসত্য, অসুন্দর ও যাবতীয় কদর্যতা ইসলামে নিষিদ্ধ। মানুষের জীবনকে সুন্দর ও শৃংখলাময় করার জন্য যত রকমের সহজ-সরল দিকনির্দেশনা ও পথ রয়েছে– তার সব ইসলামে বিদ্যমান। এ কারণেই ইসলামকে মধ্যপন্থিদের ধর্ম বলা হয়। মানবতার বিরুদ্ধে যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে ইসলাম একমাত্র রক্ষাকবচ। তাই আমাদের সব ধরনের কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

---

২৬৩. আল-কুর'আন, ৪৭:৩৩

২৬৪. আল-কুর'আন, ৪৯:১

২৬৫. আল-কুর'আন, ৫:৯০

২৬৬. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০

বিদ'আতের বিরুদ্ধে রাসূল (স.) এর হাদিস

হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) আগমন-পূর্ব সময়কে কুর'আনে কারিমে 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত' বা অজ্ঞতা, ববর্রতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয়েছে। কারণ, তৎকালীন আরব সমাজ ছিল নানা কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত রাসূলুল্লাহকে (স.) পাঠিয়ে ঘোষণা দেন যে :

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ

"তিনি সে সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে সঠিক পথ ও সঠিক তথা সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব মতবাদের ওপর এ ধর্ম তথা মতবাদ বিজয়ী হতে পারে।"[২৬৭]

عَن أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعَن اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَن اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ وَلَعَن اللهُ مَنْ لَعَن وَالِدَهُ وَلَعَن اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

আবু তুফাইল বলেন, আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহর রাসূল (স.) কি আপনাদেরকে কোন বিশেষ জ্ঞান দান করে গেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি আমাদেরকে বিশেষ কোন জ্ঞান দিয়ে যাননি, যা সাধারণ লোকে জানে না। তবে আমার এ তরবারির খাপে যা আছে, (তা হতে পারে)। অতঃপর তিনি খাপ থেকে একটি লিখিত কাগজ বের করলেন। তাতে লিখা ছিল, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি জমিন-জায়গার চিহ্ন সরিয়ে ফেলে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি বিদ'আতিকে আশ্রয় দেয়।[২৬৮]

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النبي ﷺ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল-যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"[২৬৯]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।

وَعَن جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ وَعَلاَ صَوتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصبُعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَة ضَلالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ رواه مسلم

২৬৭. আল-কুর'আন, ৯:৩৩

২৬৮. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫২৪১

২৬৯. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২৬৯৭

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা দিতেন তখন তার চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত। কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে যেত। রাগ ভাব প্রচন্ডভাবে প্রকাশ পেত। মনে হত তিনি কোন সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করছেন যে, সকালে বা বিকালেই শত্রু বাহিনী এসে পড়বে। তিনি আরো বলতেন, আমি আর কিয়ামত এমন নিকটবর্তী, এ কথা বলে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দুটো একত্র করতেন। তিনি আরো বলেন, জেনে রাখ, সবচেয়ে ভাল কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ (স.) এর আদর্শ। আর ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ধর্মে নতুন সৃষ্টি। (এটা বিদ'আত) আর সব বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। তারপর তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তার প্রাণের চেয়ে আপন। যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়, তা তার পরিবারের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের দায়িত্ব আমার ওপরই।"[২৭০]

عَن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَن كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতির তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না), যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদ'আত বর্জন না করেছে।"[২৭১]

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ-

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, "প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়।"[২৭২]

عَن الْعِرْبَاضِ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ-

ইরবায ইবন সারিয়াহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন যে, "অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) ওপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।"[২৭৩]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَن حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا

আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হাওযে কাওসারের পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত লোক (কিয়ামতের) দিন আল্লাহর নবী (স.) এর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে নিরুদ্দেশ উট বিতাড়িত করার ন্যায় বিতাড়িত করা হবে। তিনি বলবেন, ওরা আমার দলের (বা ওরা তো আমার উম্মত)। বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার বিগত হওয়ার পর ওরা কি নবরচনা করেছিল। তখন নবী (স.) তাদেরকে বলবেন, দূর হও, দূর হও।[২৭৪]

---

২৭০. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২০৪২

২৭১. সহিহ তারগীব, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫

২৭২. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫৬

২৭৩. সুনানু ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪৩

২৭৪. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬০৭

নবি (স.) তার এক খুতবায় বলেছেন : "নিশ্চই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল (দ্বীনের মধ্যে) নব উদ্ভাবিত বিষয়। আর নব উদ্ভাবিত প্রত্যেক বিষয় বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত হল ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।"[২৭৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন বললেন, "তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন বিদ'আত তোমাদেরকে এমনভাবে ঘিরে নেবে যেন এ বিদ'আত করতে করতে তোমাদের যুবকেরা বৃদ্ধ হবে, আর এ বিদ'আত করতে করতে ছোটরা বড় হবে এবং মানুষ এটাকে (অর্থাৎ এ সব বিদ'আত কে) সুন্নাত হিসাবে গ্রহন করবে। আর যদি কেউ এ বিদ'আত এর কিছু ত্যাগ করে, তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি একটা সুন্নাত ত্যাগ করলে? সাহাবিগন (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এমনটা হবে? তিনি (স:) বললেন : যখন (হকপন্থি) আলিমদের মৃত্যু হয়ে যাবে, ক্বারিদের (reciters) সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, দ্বীন এর বুঝ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা হবে খুবই অল্প, নেতা/মাত্ববরদের সংখ্যা বাড়বে, বিশ্বস্ত মানুষ হবে খুবই কম, দ্বীন এর কাজের মধ্যে মানুষ দুনিয়ার লাভ খুজবে, এবং দ্বীনী ইলম বাদ দিয়ে বাকি অন্যান্য জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে।"[২৭৬]

'রাসূল (স.) আরো বলেছেন : "যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[২৭৭]

কুসংস্কার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা (স.) বলেছেন : "অশুভ বা কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, বরং তা শুভ বলে মনে করা ভালো। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, শুভ লক্ষণ কী? তিনি বললেন, এরূপ অর্থবোধক কথা, যা তোমাদের কেউ শুনতে পায়।"[২৭৮]

ইতোপূর্বে একাধিক হাদিসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন এবং তা ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) এর হাদিসে দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ (রা.) দুটি নেককর্মে পদ্ধতিগতভাবে রাসূলুল্লাহ-এর ব্যতিক্রম করতেন। রাসূলুল্লাহও রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মাসের কিছু দিনে সিয়াম পালন করতেন, পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় করতেন। বিষয়টির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করে বাসুলুল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।...এরপর তিনি বলেন : প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তপ্ত হয় আবার এ তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সিরাতের দিকে কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি।

- ✓ তাহাজ্জুদ ও নফল সিয়াম ইসলামে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ইবাদত। বিভিন্ন হাদিসে এ ইবাদত বেশি বেশি পালন করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ সকল হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, এ ইবাদত যত বেশি পালন করা যাবে তত বেশি সওয়াব হবে। কাজেই অর্ধেক রাতের চেয়ে সারারাত তাহাজ্জুদে সাওয়াব বেশি হওয়ার কথা। অনুরূপভাবে মাসের কয়েকদিন সিয়াম পালনের চেয়ে পুরো মাস সিয়াম পালনে বেশি সাওয়াব হয়ে থাকে।
- ✓ সারা রাত তাহাজ্জুদ বা নিষিদ্ধ দিনগুলো বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালন মূলত নিষিদ্ধ নয়। তবে তা রাসূলুল্লাহ (স.) এর পদ্ধতির বাইরে।
- ✓ এরূপ করাকে রাসূলুল্লাহ (স.) তার সুন্নাত বা পদ্ধতি অপছন্দ করার নামান্তর বলেছেন বারংবার।

---

২৭৫. সহিহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬০৭

২৭৬. সুনানু আদ-দারেমি (১/৬৪), দুটি ভিন্ন সনদে, প্রথমটি সাহিহ এবং দ্বিতীয়টি হাসান (আলবানি); হাকিম (৪/৫১৪)

২৭৭. সহিহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫০৬৩

২৭৮. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৫৭৫৭

- ✓ তিনি আরো বলেছেন যে, কোন আবিদ যদি কর্মের উদ্দীপনায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা ধ্বংসাত্মক নয়। তবে তার স্থিতি যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় তবে তা ধ্বংসাত্মক হবে।

অন্যান্য অনেক হাদিসে এভাবে বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'নব-উদ্ভাবন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ অর্থের অন্য হাদিসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : "আমার পরে তোমরা যারা বেচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ ও দলাদলি দেখতে পাবে কাজেই তেমরা দৃঢ়ভাবে আমার সুন্নাত এবং আমার পরের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত আকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে। আর খবরদার, নব উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে। কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই 'বিদ'আত' এবং সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

তাবেয়ী হাসান বসরী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদআতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার উম্মত, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার পদ্ধতি (সুন্নাত) অপছন্দ করবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বিদ'আত বিষয়ক রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো দেখতে পাই।

- আভিধানিকভাবে সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কেই বিদ'আত বলা হয়, তবে হাদিসে নববীতে আমাদের কর্মের মধ্যে বা দীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয়-কে বিদ'আত বলা হয়েছে।
- বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকওয়া, আল্লাহর ভয় ও ইবাদতে রাসূলুল্লাহ-এর সুন্নাতকেই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ-এর অতিরিক্ত কোন মত, কথা, কর্ম বা রীতিকে তাকওয়া, বুজুর্গী বা ইবাদত বলে গন্য করাই বিদ'আত।
- বিদ'আত মূলত বর্জনের সুন্নাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (স.) যা করেননি বা বলেননি, অর্থাৎ তিনি যা করা বা বলা বর্জন করেছেন তা ইবাদতের উদ্দীপনায় করা বা বলা বা তাকে ইবাদত, কামালাত বা বুজুর্গি মনে করাকে বিদ'আত বলা হয়েছে।
- ইবাদতের উদ্দীপনাতেই বিদ'আতের উৎপত্তি। ইবাদতের উদ্দীপনায় নেককার ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি, প্রকার বা রীতিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করলে তা বিদ'আতে পরিণত হয়।
- কবুলিয়্যাত বা সাওয়াবের আশাতেই বিদ'আত করা হয়, এজন্য বিদ'আতি কবুল হবে না বলে বারংবার হাদিসে বলা হয়েছে এবং বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি ইবাদতের চেয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প ইবাদত বেশি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- আভিধানিকভাবে বিদ'আত নিন্দনীয় নয়, বরং তা ভাল বা মন্দ হতে পারে। তবে হাদিসে নববীতে বিদ'আতি সর্বদা নিন্দনীয় এবং সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। এর কারণ যেখানে অপূর্ণতা আছে সেখানে নতুনত্ব প্রশংসনীয়। আর যেখানে পরিপূর্ণ পূর্ণতা বিদ্যমান সেখানে পূর্ণতার অতিরিক্ত কোন সংযোজনীর প্রয়োজন আছে মনে করার অর্থই পূর্ণকে অপূর্ণ মনে করা।[২৭৯]

হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে ঘোর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে সে সমাজে ইসলামের জ্যোতি বিকীরণ করেন। তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির আগে যাবতীয় কুসংস্কার সমাজ থেকে কীভাবে দূর করা যায় তা নিয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি তার দাওয়াতি কাজের সূচনায় জাহেলি যুগের সব কুসংস্কারকে পরিহার করে এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্য প্রদর্শনের কথা বলেন। ফলে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে কুসংস্কারের প্রভাব কমতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে ইসলামের প্রচার করতে থাকেন।

---

২৭৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০-২৪২

বিদ'আতের বিরুদ্ধে সাহাবি-তাবিয়ীগণের বক্তব্য

এমন কাজ, কথা ও প্রথা মানা যার কোন বাস্তব ও ধর্মীয় ভিত্তি নেই। মানুষের তৈরি যুক্তিহীন এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস, কথা, কাজ ও প্রথাকে সহজ বাংলায় কুসংস্কার বলা হয়। এসব কুসংস্কারের কারণে অনেকের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। আবার কোথাও কুসংস্কারের কবলে জীবনহানীর ঘটনাও ঘটে। কিছু কিছু কুসংস্কার তো শিরকের পর্যায়ভুক্ত। আবার কিছু বিষয় সাধারণ বিবেক বিরোধী এবং রীতিমত হাস্যকর। মূলত বাজারে 'কি করলে কি হয়' জাতীয় বই এসবের সরবরাহকারী। কিছু মানুষ চরম অন্ধবিশ্বাসে এগুলোকে লালন করে। সমাজে প্রচলিত এসব কুসংস্কারের কারণে আল্লাহর ওপর আস্থা ও তার রহমতের প্রতি নির্ভরতা কমে যায়; চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে চিড় ধরে।

"ইবন কাসির (র.) বলেন, আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ রহমতগুলোর একটি হল এ যে, তিনি দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তাই মুসলিমদের অন্য কোন জীবনব্যবস্থা আর তাদের নিজেদের নবি মুহাম্মাদ (স.) ছাড়া অন্য নবির প্রয়োজন নেই। এ কারণেই আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স.) কে খাতামুন-নাবিয়্যিন হিসেবে ভূষিত করেছেন এবং জিন ও মানবজাতির কাছে তার বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যেগুলো হালাল বলেছেন কেবল সেগুলোই হালাল আর যেগুলো হারাম বলেছেন কেবল সেগুলোই হারাম। কেবলমাত্র সেগুলোই দ্বীনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে যেগুলো রাসুলুল্লাহ (স.) আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি (স.) যেগুলো আমাদের জানিয়ে যাননি সেগুলো কখনও দ্বীনের অংশ হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (স.) এর সবই ছিল সত্য ও শুদ্ধ, এমনকি তাতে কোন ধরনের সূক্ষ্ম ভুল বা অসততা ছিলোনা।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে বিদ'আত শুরু করে আর মনে করে সেটা কল্যাণকর, সে যে দাবী করলো রাসূলুল্লাহ (স.) দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতারণা করেছে। আল্লাহ কি বলেছেন তা পড়ুন-"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নিয়ামত আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবনবিধান) হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা,৫:৩)। তাই দ্বীনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবিদের সময় যেটা দ্বীনের অংশ ছিল না, সেটাকে এর পরবর্তী সময়েও দ্বীনের অংশ হিসেবে মনে করা ও পালন করা যাবে না। আর এ উম্মতের শেষ অংশ ততক্ষন পর্যন্ত কখনোই পরিশুদ্ধ হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা এ উম্মতের প্রথম অংশ (সাহাবা) যেটা দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়েছিলেন তারাও সেটা দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়।

আল-মারওয়াজি (র.) তার আস-সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন, উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) বলেন, সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও এ ব্যাপারে কারো কোন ওজর থাকার মানে হয় না যে, কেউ এমন একটি ভুলের ওপর পথভ্রষ্ট অবস্থায় আছে যাকে সে হিদায়াত মনে করছে।

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন, সালাফদের বাণী ও পথের সাথে লেগে থাকো, দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত ব্যাপার থেকে সতর্ক থাকো, কারণ দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবিত প্রত্যেক কিছুই বিদ'আত।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, সুন্নতের মৌলিক নীতিগুলো হল বিদ'আত থেকে দূরে থাকা, আর প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহি।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, উম্মতের প্রথম ভাগ যা দ্বারা উপকৃত হয়েছিল, তা ছাড়া অন্য কিছু উম্মতকে উপকৃত করবে না।

সুফিয়ান আস-সাওরী (র.) বলেন, কাজ ছাড়া কোন কথাই গ্রহণীয় নয়। আর কাজ ও কথা সঠিক নিয়্যত ছাড়া পরিশুদ্ধ নয় এবং কথা, কাজ ও বিশুদ্ধ নিয়্যত সঠিক হয় না যতক্ষন না পর্যন্ত তা সুন্নত অনুযায়ী করা হয়। তিনি

আরও বলেন, অন্যান্য যেকোন পাপের তুলনায় বিদ'আত শয়তানের নিকট বেশি প্রিয়, কেননা পাপ থেকে তওবা করা হয় (এটাকে পাপ হিসেবে সহজে চিহ্নিত করা যায় বলে) কিন্তু বিদ'আত থেকে তওবা করা যায় না। কারণ মানুষ বিদ'আতকে ইবাদতের নতুন একটা ভাল রূপ হিসেবে বিশ্বাস করে, যা সেটাকে পাপ হিসেবে চিন্তা করতে দেয় না, এভাবে তার জন্য তওবা করা হয়ে উঠে না। তিনি আরও বলেন, অতএব তোমরা মূল বিষয়ের (রাসূলুল্লাহ (স.) ও তার সাহাবিদের জামা'আত) সাথে নিজেদের দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে রাখো।

শাইখ আল-বারবাহারি (র.) বলেন, জেনে রেখো, যে দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেটি সুউচ্চ ও পবিত্র। এটি এমন কোন দ্বীন নয় যা কিনা মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও মনগড়া মতামতের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ দ্বীনের পবিত্র জ্ঞান আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) থেকে আমরা পাই, সুতরাং সেটা বাদ দিয়ে তুমি তোমার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, আর এর মাধ্যমে নিজেকে দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট করো না এবং দ্বীনের গন্ডি ছেড়ে দিয়ো না। সুন্নত থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার কোন কারণই গ্রহণীয় নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) সুন্নতকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সাহাবিদের কাছে সুন্নতকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। মনে রাখবে, তারাই হলেন জামা'আত, তারাই উম্মতের প্রকৃত অংশ, আর তাদের সত্যিকার অনুসারীরাই সে জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

কুরতুবি (র.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের কোন কিছু পরিবর্তন করবে সে ওই কাল বর্ণের চেহারার লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এদেরকেই রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাউজে কাউসার এর নিকট যেতে বাধা দেয়া হবে আর সেখান থেকে পান করাতে রাসূলুল্লাহ (স.) কে নিষেধ করা হবে।

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, বিদআতি ব্যক্তি যতক্ষন পর্যন্ত তার বিদ'আত ছেড়ে দিবে না, ততক্ষন পর্যন্ত তার তওবা কবুল করা হবে না।
ইবন তাইমিয়্যাহ (র.) তার একটি কিতাবে বিদ'আত সম্পর্কে বলেন, প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের কুফরির কারণ হলো বিদ'আত। তারা তাদের দ্বীনে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছিলো আর সেগুলো তাদেরকে মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো।
ইমাম ইবন রজব (র.) বিদ'আত নিয়ে লিখিত তার কিতাবে বলেন, আল্লাহকে খুশি করার নিয়্যতে কোন হারাম কাজকে ভাল মনে করে করা একটি বিদ'আত, যেমন আল্লাহকে নিয়ে কোন গান করা।

তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবন আবদ আলকারী বলেন, একদিন আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাথে রমযান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম মানুষেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত। কোথাও এক ব্যক্তি একা (তারাবীহ বা রাতের) সালাত আদায় করছে। কোথাও কয়েকজনে মিলে ছোট্ট একটি জামাতে সালাত আদায় করছে। এ দেখে উমর বললেন, আমার মনে হয় এ সকল মানুষের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দেয়া ভালো হবে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি উবাই ইবন কাবকে ইমাম নিযুক্ত করে একত্রে (তারাবীহের) সালাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর অন্য এক রাতে যখন আমি তার সাথে বের হয়েছি তখন আমরা দেখলাম সকল মানুষ একত্রে ইমামের পিছে জামাতে সালাত (তারাবীহ) আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে উমর বললেন, এটি একটি ভালো বিদ'আত, তবে যা থেকে এরা ঘুমিয়ে থাকে তা বেশি উত্তম। তিনি বুঝালেন যে, এ সকল মানুষ প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করছে, শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু শেষ রাতে তারাবীহ পড়লে তা বেশি ভালো হত।

কিয়ামুল্লাইল অর্থাৎ রাতের সালাত বা তারাবীহের নিয়মিত জামা'আত রাসূলুল্লাহ-এর যুগে না থাকতে উমর তাকে বিদ'আত বলেছেন। স্বভাবতই একান্তই আভিধানিক অর্থে তা বিদ'আত বা নতুন বিষয়, কারণ দীনের মধ্যে তা নতুন নয়। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি :

- রামাদানের রাত্রিতে কিয়ামুল্লাইল গুরত্বপূর্ণ মাসনুন ইবাদত।
- কিয়ামুল্লাইলে কুর'আন পাঠ ও খতম সুন্নাত-সম্মত ইবাদত।
- এ জন্য জামা'আত সুন্নাত-সম্মত। রাসূলুল্লাহ (স.) কয়েকবার জামা'আতে তা আদায় করেছেন। তবে ফরয হওয়ার আশংকায় নিয়মিত জামাতে আদায় করেননি।
- রামাদানের কিয়ামুল্লাইল, কিয়ামুল্লাইলে কুর'আন খতম ও মাঝে মাঝে জামা'আতে আদায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাত। তা নিয়মিত জামা'আতে আদায়ের রীতি তার সময়ে ছিল না। এজন্য উমর (রা.) একে বিদ'আত বলেছেন। তিনি একে ভাল বিদ'আত বলেছেন।

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) সকল বিদ'আতকে বিভ্রান্তি বললেন, অথচ উমর কিভাবে একটি বিদ'আতকে ভাল বিদ'আত বললেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আভিধানিক অর্থেই এ কর্মকে বিদ'আত বলেছেন এবং সে অর্থে একে ভাল বিদ'আত বলেছেন। সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক ব্যতিক্রমের অধিকার রাসূলুল্লাহ (স.) খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবিগণকে দিয়েছেন এবং এরূপ কর্মকে তাদের সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত তারা রাসূলুল্লাহ-এর সুন্নাত সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন। কোন কাজটি রাসূলুল্লাহ বিশেষ কারণে করেননি, তবে তার পরে করা যেতে পারে, তাও তারা সঠিকভাবে বুঝতেন। এ জ্ঞানের আলোকেই উমর (রা.) নিয়মিত কিয়ামুল্লাইলের জামা'আতকে ভাল বিদ'আত বলেছেন।

সুন্নাতের আলোকে খুলাফায়ে রাশেদীনের এরূপ কর্ম এবং জাগতিক, সাংসারিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ছাড়া ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে সাহাবিগণ সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমকে বিদ'আত বলে নিন্দা করেছেন। তাদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগি, নেককর্ম, মতামত, বিশ্বাস সবই বিদ'আত। তারা সর্বদা সুন্নাতের বিপরীতে 'বিদ'আত এবং ইত্তিবা বা অনুসরণের বিপরীতে 'ইবতিদা বা উদ্ভাবন উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বে এ অর্থে কয়েকটি হাদিস আমরা দেখেছি।

এক হাদিসে ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, তোমরা অবশ্যই ইলম শিক্ষা করবে। আর খবরদার, তোমরা কখনো বিদআতের মধ্যে লিপ্ত হবে না, খবরদার, তোমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে না। খবরদার, তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না। বরং তোমরা প্রাচীনকে আকড়ে ধরে থাকবে। তিনি আরো বলেন, তোমরা অনুসরণ কর, উদ্ভাবন করো না, কারণ দ্বীনের মধ্যে যা আছে তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ। অন্য হাদিসে তিনি বলেন, বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি আমল করার চেয়ে সুন্নাতের ওপর অল্প আমল করা উত্তম।

উসমান বিন হাদির বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট গমন করি এবং তাকে বলি, আমাকে কিছু উপদেশ দেন। তিনি বলেন, হ্যা, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, ইসলামের বিধিবিধান সুদৃঢ়ভাবে পালন করবে। তুমি অনুসরণ বা ইত্তিবা করবে, বিদ'আত উদ্ভাবন করবে না।

অন্য হাদিসে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, প্রতি বৎসরই মানুষ কিছু বিদ'আত উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং সুন্নাত মেরে ফেলবে, এক পর্যায়ে শুধু বিদ'আতই বেচে থাকবে আর সুন্নাতসমূহ বিলিন হয়ে যাবে।

ইমাম সূয়ূতী (র.) বর্ণনা করেছেন, হুযাইফা (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ যে ইবাদত করেননি, তোমরা কখনো সে ইবাদত করবে না। কারণ পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কথা বলার (কোন নতুন কথা বলার বা নতুন কর্ম উদ্ভাবন করার) কোন সুযোগ রেখে যাননি। হে আল্লাহর পথের পথিকগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন করে চল।

হুযাইফাহ (রা.) দুটি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির উপরে রাখেন এবং সহচর তাবেয়ীগণকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কি দুটি পাথরের মাঝখানে কোন আলো দেখতে পাচ্ছ? তারা বলেন, খুব সামান্য আলোই পাথর দুটির মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মত এ দুটি পাথরের মধ্য থেকে আসা আলোর মতো ক্ষীণ হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে যদি কোন বিদ'আত বর্জন করা হয়, তাহলে সবাই বলবে, সুন্নাত বর্জন করা হয়েছে (বিদ'আতকেই সুন্নাত মনে করা হবে বা বিদ'আত পালনই সুন্নী হওয়ার আলামত বলে গন্য হবে)।

দাইফ ইবনল হারিস আস-সিমালী (রা) বলেন, উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান (খিলাফাত ৬৫-৮৬ হি./৬৮৪-৭০৩ খ্রি.) আমার কাছে দূত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে আবু আসমা, আমরা দুটি বিষয়ের ওপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি)। গুদাইফ বললেন, বিষয় দুটি কী কী? খলিফা বললেন, বিষয় দুটি হলো :

- শুক্রবারের দিন (জুম'আর খুতবার মধ্যে) মিম্বরে ইমামের খুতবা প্রদানের সময় হাত তুলে দু'আ করা এবং
- ফজর এবং আসরের সালাতের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়ায করা।

তখন গুদাইফ বললেন, নিঃসন্দেহে এ দুটি বিষয় আমার মতে তোমাদের বিদ'আতগুলোর মধ্য থেকে সবথেকে ভালো বিদ'আত, তবে আমি এ দুই বিদ'আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করব না। খলিফা বললেন, কেন আপনি আমার কথা রাখবেন না? গুদাইফ বলেন, কারণ নবিয়ে আকরাম বলেছেন, যখনই কোন সম্প্রদায় কোন বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সে পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়। কাজেই একটি সুন্নাত আকড়ে ধরে থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম।

এখানে লক্ষণীয়, যে দুটি বিষয় গুদাইফ বিদ'আত বলেছেন দুটি বিষয়ই শরিয়ত সম্মত। জুম'আর খুতবা প্রদানের সময় রাসূলুল্লাহ দু'আ করতেন বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দু'আর সময় দুহাত তুলার কথাও প্রমাণিত। খুতবা চলাকালীন সময়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে তিনি দুহাত উঠিয়েছেন বলেও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, যে কোন যুক্তি তর্কে আমরা বলতে পারি খুতবার সময় দু'আ করা জায়েয, দু'আর সময় দুহাত তোলাও জায়েয এবং খুতবা চলাকালীন সময়ে সমবেতভাবে দুহাত তুলে দু'আ করাও জায়েয। কিন্তু সাহাবি একে বিদ'আত বললেন কেন? কারণ বৃষ্টির জন্য দু'আ ছাড়া খতুবার মধ্যে অন্য কোন দু'আতে তিনি দুহাত উঠাতেন না, বরং শাহাদত আঙ্গুলের ইশারা করে দু'আ করতেন। আর তিনি শুধু একাই হাত তুলতেন বা ইশারা করতেন, সমবেতভাবে তা করতেন এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতের উপরেই থাকতে চাচ্ছেন। তিনি যতটুকু করেছেন। তার একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না।

মুয়ায ইবন জাবাল (রা.) একদিন বলেন, তোমাদের সামনে অনেক ফিতনা আসছে, যখন মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কুর'আন শিক্ষার পথ খুলে যাবে। মুমিন-মুনাফিক, নারী-পুরষ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর সবাই কুর'আন শিখবে। তখন হয়ত কোন ব্যক্তি বলবে, মানুষের কী হলো, আমি কুর'আন শিক্ষা করলাম অথচ তারা আমার অনুসরণ করছে না? কুর'আন ছাড়া কোন নতুন মত বা কাজ উদ্ভাবন না করলে মানুষেরা আমার অনুসরণ করবে না। আমি এত আলেম হলাম কিন্তু আমার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, আমার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়ছে না। কাজেই, মানুষের মধ্যে আমার সঠিক মূল্যায়নের উপায় হলো নতুন কোন মতামত বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। খবরদার, তোমরা বিদ'আতের কাছেও যাবে না। নিঃসন্দেহে যা কিছু বিদ'আত তাই পথভ্রষ্টতা।

এ হাদিসের আলোচনায় আল্লামা শাতিবী উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আতের উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদতে আধিক্য অর্জন। বিদ'আতি আল্লাহর ইবাদতের দিকেই মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, ইবাদতের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা জরুরী মনে করেন না। এছাড়া মানবীয় প্রকৃতি পুরাতন ও নিয়মিত কর্মে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নতুন নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে অতিরিক্ত উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা লাভ করা যায়, যা পুরাতনের মধ্যে থাকে না। এজন্য বলা হয় প্রত্যেক নতুনের মধ্যেই মজা। বিদ'আতিদের তত্ত্ব এ যে, মানুষের মধ্যে অপরাধ বেড়ে গেলে যেমন অপরাধ ধরা ও বিচার করার জন্য পদ্ধতিও বেড়ে যায়, অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে ইবাদতে অবহেলা প্রসার লাভ করলে তাদের অবহেলা কাটাতে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। মুআয (রা.) এ বিষয়েই সাবধান করেছেন। শাতিবী বলেন, এদ্বারা বুঝা যায় যে, ইবাদতের বাইরে জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনা শরিয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলে গন্য নয়।"[২৮০]

কুসংস্কারজনিত অন্ধবিশ্বাসে পড়ে মানুষ নিজেদের ঈমানকে দুর্বল করে তুলছে। বস্তুত মুসলিমের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসাই যথেষ্ট। ইসলামি শরিয়ত পরিপন্থি প্রচলিত এসব বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া কুসংস্কার বন্ধের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো সবার ঈমানি দায়িত্ব।

২৮০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪২-২৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলায় ইসলামের আগমন

সারা পৃথিবীতে যখন অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অসভ্যতা, বর্বরতা সর্বোপরী ধর্মহীনতা জেকে বসেছিল, তেমনই এক সময়ে সকল অন্ধকারকে সরিয়ে বিশ্বময় আলো ছড়িয়ে দিতে এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। আরব ভূখন্ডের সেই ইসলামের বার্তা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ভারত-বাংলাদেশেও এসে পৌছেছিল। তবে তা কবে, কখন হয়েছে সেটির সঠিক সময়কাল ইতিহাসে অনুপস্থিত। এতদঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনাবলি থেকে এটা বুঝা যায় যে, এখানে ইসলামের দাওয়াত এসেছিল রাসূল (স.) এর জীবদ্দশাতেই। তবে সেটি পুরোপুরি বিস্তার লাভ করে খোলাফায়ে রাশেদিন এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকবৃন্দের সময়ে। মুসলিমরা মূলত বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেছেন। সেসব উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়েই বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের বিষয়টি নিম্নে আলোচনা করছি।

ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের আগমন

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশ প্রাচীন কাল থেকেই বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অন্যতম আদর্শ জায়গা। অসংখ্য নদী বিধৌত এ অঞ্চলটি তখন থেকেই নৌপথে যাতায়াতের জন্য সহজ গন্তব্য। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি তৎকালীন আরব দেশের বণিকগণ এদেশকে ব্যবসায়ের জন্য উত্তম বলে জ্ঞান করত। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এবং পর্যটকবৃন্দ তাদের লেখনীতে এ দেশের বাণিজ্যিক গুরুত্বের পাশাপাশি চট্রগ্রাম বন্দরের বিষয়ও আলোচনা করেছেন।

"ঐতিহাসিক জেমস টেইলর বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.) এর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে থেকে দক্ষিণ আরবের সাবা কাওমের লোকেরা এ উপমহাদেশের পূর্ব-উত্তর এলাকায় পালতোলা জাহাজে করে আসত। তার নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দরের নামে রয়েছে। 'সাবা'দের 'উর' বা নগর থেকে সাবাউর এবং তারই অপভ্রংশ হিসেবে পরবর্তীকালে এ বন্দর সাভার নামে পরিচিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরের যে তওক বন্দর শহর নসীরাবাদ-মুমিনশাহীর ১০/১৫ মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, এখন এটিকে টোক বন্দর বলা হয়। এও আরবদের দেয়া নাম। বন্দরটি তাদেরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ ইদরীসী, সুলায়মান প্রমুখ আরব ভৌগলিকগণ 'তওক' বলে এর উল্লেখ করেছেন। আরবিতে গলার হারকে 'তওক' বলা হয়। লক্ষণ সেনের ভাওয়াল তাম্রশাস বানহার নদী এখন বানার নামে পরিচিত। এ স্থলেই তার বা তওকের মত বেকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে বলে আরবদের দ্বারা তখনকার এ পোতাশ্রয়টি তওক নামে প্রসিদ্ধ হয়।"[২৮১]

"রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের আগেই আরব জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ-বিবাদের দরুন আরবদের জন্য স্থল-বাণিজ্যের পথ সে সময় বিঘ্ন-সংকুল হয়ে পড়েছিল। ইয়ামান-হাজরামাউতের মধ্যে দিয়ে আরবদের নৌ-পথে বাণিজ্য করার অভিজ্ঞতা

২৮১. মুফাখখারুল ইসলাম, উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ১৯৮৪), পৃ.৭১৩-৭১৪

আরও আগ থেকেই ছিল। তাদের বাণিজ্য বহর পাক-ভারত উপমহাদেশে, বার্মা, কম্বোডিয়া এবং মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করত। পঞ্চম শতকের শেষভাগে খোদ মক্কার কুরাইশ বণিকরাও নৌ-পথে বহির্বাণিজ্যের সাথে সাথে ভারতীয় এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশপাশে তাদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং বাংলার চট্রগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলামপূর্ব কয়েক শতক আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী আরব ও হিন্দকে 'তা'আলুকাত' নামক তার গবেষণা গ্রন্থে এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে গড়ে ওঠা উপনিবেশগুলো সর্ম্পকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত দুবার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙর করতো। ফলে বাণিজ্য-পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হতো তেমনি তথ্যেরও আদান-প্রদান চলত।"[২৮২]

"ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন সিরাজ উত্তর বাংলা বুঝাতে 'বররিন্দ' লেখেছেন। মুফাখ্খারুল ইসলাম এর মতে, আরবরা জাহাজে করে বিশাল সাগরে মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে উত্তরবঙ্গের লালমাটি-ভূখণ্ড দেখে চিৎকার করে উঠত 'বার্‌রি হিন্দ' বলে। 'বার' অর্থ স্থলভাগ। বার্‌রি হিন্দ অর্থ 'হিন্দুস্তানের মাটি'। সে থেকে এ অঞ্চল বররিন্দ বা বরিন্দ নামে পরিচিত হয়েছে। ঢাকা-টাঙ্গাইলের স্থল ভাগকে এখনো 'ভর' বলে। এ 'ভর' আরবি বর্‌র্ শব্দেরই একরূপ। বাংলার অন্যতম নদী বন্দর ভৈরবের নামও আরবদের দেয়া 'বহর-ই-আব'। আরবিতে বাহর শব্দের অর্থ হলো সাগর বা নদী। আর আব মানে পানি। সুতরাং বহর-ই-আব মানে পানির সাগর। 'বাঙ্গালী যুগে যুগে' গ্রন্থের লেখক নাজির আহমদ 'কামরুত' নামটি 'কাওম-ই-হারুত' থেকে উদ্ভুত বলে উল্লেখ করেছেন।"[২৮৩]

"আরব জাতি মূলত ব্যবসায়ী জাতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে তাদের ভ্রমণ কাহিনী জানা যায়। আরবিয়দের এতদঞ্চলে আসার বহুবিধ কারণও ছিল। প্রথমত: ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মরুবাসী আরবের লোকেরা জীবিকার তাগিদেই ব্যবসায়ী ছিল। দ্বিতীয়ত: ব্যবসায়িক কিংবা ভ্রমণের জন্য নৌবহর ছাড়া অন্য কোন সহজলভ্য পন্থা ছিল না। আর নৌবহর নিয়ে ভারত-বাংলায় প্রবেশ করা সহজ ছিল। তৃতীয়ত: ভারত রত্নময় ভূখণ্ড বলে প্রবাদ আছে। এ উপমহাদেশের ধন-রত্ন, খাদ্য সামগ্রী, শৌখিন বাসন-কোসন, রেশমী পোশাক, হাতির দাত ইত্যাদির প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। চতুর্থত: আরবদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য হলেও মরুর বিষণ্ন আবহাওয়ার চেয়ে ভারত-বাংলার প্রাকৃতিক আবহাওয়া ছিল সুশীতল ও আরামদায়ক। ফলে ব্যবসা ও মনোরম পরিবেশে ভ্রমণ দুরকম সুবিধা তাদের আকর্ষণ করত। ব্যবসায়িক ও মানবিক দিক দিয়ে (রাজন্যবর্গ ও ধর্মীয় গোড়ামি ব্যতীত) ভারতীয় বেশিরভাগ মানুষের আচার-ব্যবহার, লেনদেন অন্যান্য দেশের তুলনায় উচ্চাঙ্গের ছিল। পঞ্চমত: নদীমাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজেই প্রবেশ করতে পারত। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালি পাড়ায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিরাট সমুদ্র বন্দরের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। চট্রগ্রামে সমুদ্র বন্দর এবং রংপুর, দিনাজপুর ও ঢাকা এলাকায়ও বিরাটকায় নদী বন্দরের বহু নিদর্শনের ইতিহাস জানা যায়। এসব কারণে আরব বণিকরা আসলেও দ্বীন প্রচার ও প্রসারের কাজে তারা অবদান রাখেন।"[২৮৪]

---

২৮২. মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮) পৃ.৩৪৬

২৮৩. উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১৪

২৮৪. ড. মোঃ আবদুস সত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ.৯০

"আরব বণিকদের আগমনকালে বর্তমান চট্রগ্রাম অঞ্চল গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিল। চট্রগ্রাম ও সোনারগাওয়ের মধ্যে তখন সংক্ষিপ্ত নদীপথ ছিল। পনেরো শতকের গোড়ার দিকেও সে সংক্ষিপ্ত নদীপথ বিদ্যমান ছিল। এ পথেই চীনা পর্যটক মাহুয়ান চট্রগ্রাম থেকে নৌকাযোগে রাজধানী সোনারগাওয়ে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচারের যুগে পদ্মা নদী রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী শহরের পাশে) দিয়ে চলন বিলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার গতিপথে প্রবাহিত হত। তারপর এ নদী ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফিরিঙ্গি বাজারের কাছে মেঘনায় গিয়ে পড়ত। বুড়িগঙ্গা নাম গঙ্গার সে পুরনো গতিপথটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এ নদী ধীরে ধীরে অনেক দক্ষিণে সরে যায়। ষোল শতকের ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৬ সালে ঈসা খার শাসনাধীন সোনারগাও সফর করে লেখেছেন যে, তিনি সোনারগাও থেকে আঠারো মাইল দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে গঙ্গা নদীপথে চট্রগ্রাম বন্দর হয়ে পেগু গমন করেন। প্রাচীনকালের নদী পথে যোগাযোগের এ সুব্যবস্থা ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।"[২৮৫]

"বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনতম নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম লালমনিরহাটের সাহাবায়ে কেরাম জামে মসজিদ। ১৪শ বছর আগে নির্মিত এ মসজিদকে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব প্রথম মসজিদ হিসেবে মনে করা হয়। এর অবস্থান রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়ক থেকে মাত্র ১ কি.মি. দক্ষিণে লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজায়। মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া একটি ইটের মধ্যে আরবিতে স্পষ্টভাবে লেখা কালেমা তাইয়্যেবা ও হিজরি ৬৯ সন। এতে স্থানীয়রা ধারণা করেন যে, আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষটি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর ৬০ বছর পরে আরবি ৬৯ হিজরী অর্থাৎ ইংরেজি ৬৮৯ থেকে ৬৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ এলাকায় গড়ে তোলা হয়। কালের বিবর্তনে এটি হারিয়ে যায়। স্থানীয়রা জানান, ১৯৮৭ সালে সদর উপজেলার রামদাস গ্রামে মসজিদের আড়া নামক জঙ্গলাচ্ছন্ন একটি স্থানের মাটির ঢিবি কেটে সমতল করার সময় প্রাচীন এ মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন জমিনের মালিক আব্দুল গফুরসহ স্থানীয়রা। পরে সেখান থেকে ইট ওঠানো বাদ দিয়ে মাটি সরাতে থাকেন। এক পর্যায়ে ২১ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একটি মসজিদের ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। যার দেয়ালের পুরুত্ব ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। এর একটি দরজা এবং ঘরের চারকোণে ৮ কোণবিশিষ্ট ৪টি স্তম্ভ রয়েছে। তাছাড়াও তলিয়ে যাওয়া মসজিদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কারুকার্যময় ইট এবং গম্বুজের চূড়া পাওয়া গেছে। তবে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, ৬শ থেকে ৭শ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রামদাস গ্রামে চকচকার বিল নামে একটি প্রসিদ্ধ নদীবন্দর ছিল। সে সময় আরব বণিকরা বাণিজ্যের জন্য এ নদী পথ দিয়ে ভারত উপমহাদেশে আসতেন। তাই এ বন্দর ঘিরে সেখানে মসজিদটি নির্মিত হতে পারে। ১৯৮৭ সালে মসজিদটি পুনঃরুদ্ধারের পর থেকেই সেখানে সালাত পড়ে আসছেন স্থানীয়রা। প্রাচীন এ মসজিদটি দেখতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন এখানে ভিড় করছেন। বর্তমানে প্রাচীন এ মসজিদটির ধ্বংসাবশেষের চারপাশ ঘিরে একটি সুদৃশ্য মসজিদ কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ চলছে। মসজিদের বর্তমান কমিটির সভাপতি ও পঞ্চ গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন জানান, প্রাচীন এ মসজিদ ঘিরে মাদ্রাসা ও লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। দর্শনার্থী ও পর্যটকদের জন্য আরও বেশকিছু স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মসজিদটির সংস্কার ও ধ্বংসাবশেষ রক্ষণাবেক্ষণে সরকারসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে মুসলিম বিশ্বের কাছে একটি দর্শনীয় স্থান হতে পারে এটি।"[২৮৬]

---

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

২৮৬. যায় যায় দিন পত্রিকা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি.

"প্রাক-ইসলাম যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন। আরব দেশের বণিকেরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতীর দাত, মসলা এবং সূতী কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন। ভারতের বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক সাইয়েদ সুলাইমান নদবী তার লিখিত গ্রন্থ 'আরবো কি জাহাজরানী'-তে লেখেন যে মিশর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌ-পথে আরবগণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক মাওলানা আকরাম খা তার রচিত 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লেখেন যে আরব বণিকগণ এ পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ (আসাম) হয়ে চীনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিলো মধ্য পথের প্রধান বন্দর। বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের আগে তারা মাদ্রাজ উপকূলেও নোঙর করতেন বলে মনে হয়। দীর্ঘপথে পালে-টানা জাহাজের একটানা সফর সম্ভবপর ছিলনা। পথে যেসব মনযিল ছিল সেগুলোতে আবশ্যিকভাবে থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মনযিলের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হত।"[২৮৭]

"চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর হওয়ায় বহু আরব, পারস্য দেশীয় এবং বিদেশী বণিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সেখানে আসে। উন্নততর জীবিকা ও লাভজনক ব্যবসার সম্ভাবনা বিদেশি মুসলিমদেরকে এদেশে আকর্ষণ করার অন্যতম কারণ। কেউ কেউ চলে গেলেও অনেকেই বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। শাসকবৃন্দসহ বহু অভিবাসীই স্থানীয় নারীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করায় মিনশ্র বিবাহজাত সন্তানেরাও ছিল। দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, এ সম্পর্কের ফলে জাত সন্তানেরা তাদের পিতার মর্যাদা অনুসারে সমাজে পদমর্যাদা লাভ করেছিল।"[২৮৮]

ড. আকবর আলী খানের মতে-

- বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ শতকে। ইসলাম ধর্মের উদ্ভবের প্রায় ৬০০ বছর পর বাংলায় মুসলিম রাজত্ব শুরু হয়। এ দীর্ঘ সময় ধরে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য মুসলিম বণিকরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। কাজেই মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগে এখানে মুসলিম বণিকদের আনাগোনা ছিল।
- ষষ্ঠ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক সময়কালে আরব ভূগোলবিদদের লেখায় বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায়।
- দিল্লিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে বাংলাদেশে আরব বণিকদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।
- পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে আরবদের মুদ্রা পাওয়া গেছে।
- স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে আরব ও পারস্য থেকে অনেক মুসলিম দরবেশ বাংলায় এসেছিলেন।[২৮৯]

"ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরববাসী শুধু বর্বর, কলহপ্রিয় ও রক্তপিপাসু জাতিই ছিল না। বরঞ্চ তাদের মধ্যে যারা ছিল অভিজাত ও বিত্তশালী, তারা জীবিকার্জনের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মরুময় দেশে জীবন ধারণের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবহমান কাল থেকেই ব্যবসা-

২৮৭. এ কে এম নাজির আহমদ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ২০

২৮৮. বাংলা পিডিয়া

২৮৯. আকবর আলি খান : 'বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঐতিহাসিক প্রশ্নসমূহের পুনর্বিবেচনা', জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাক, গুণীজন বক্তৃতা, ঢাকা, ২৮ জুলাই ২০১৮, পৃ.২৩

বাণিজ্য করতে হত। যে বণিক দল হযরত ইউসুফকে (আ.) কুপ থেকে উদ্ধার করে মিশরের জনৈক অভিজাত বংশীয় রাজ কর্মচারীর কাছে বিক্রয় করে, তারা ছিল আরববাসী। অতএব আরববাসীদের ব্যবসার পেশা ছিল অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিস্তৃত ছিল দেশ-দেশান্তর পর্যন্ত। স্থলপথ জলপথ উভয় পথেই আরবগণ তাদের ব্যবসা পরিচালনা করত। উটের সাহায্যে স্থলপথে এবং নৌযানের সাহায্যে তারা বাণিজ্য-ব্যাপদেশে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করত। প্রাক ইসলামি যুগে তারা একদিকে সমুদ্র পথে আবিসিনিয়া এবং অপরদিকে সুদূর প্রাচ্য চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছিল। আরব থেকে সুদূর চীনের মাঝপথে তাদের কয়েকটি ঘাটিও ছিল। এ পথে তাদের প্রথম ঘাটি ছিল মালাবার। মালাবার মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী একটি জেলা। ভৌগোলিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উপদ্বীপটিকে মালাবার নামে অভিহিত করা হয়। আরব ভৌগোলিকগণের অনুলিখনে একে মালিবার বলা হয়েছে। মওলানা আকরাম খা তার 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন, আধুনিক গ্রীকদের মলি (MALI) শব্দে বর্তমান মালাবার নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ মালাবার নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়। বিশ্বকোষ সম্পাদকের এ সিদ্ধান্তটা খুবই সংগত। আমাদের মতে মালাবার, আরবি ভাষার শব্দ মলয়+আবার = মালাবার। আরবি অনুলিখনে মলয়+আবার। মলয় মূলত একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ কুপপুঞ্জ, জলাশয়। আরবরা এদেশকে মা'বারও বলে থাকেন। সেটির অর্থ, অতিক্রম করে যাওয়ার স্থল, পারঘাট। আজকালকার ভূগোলে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট। যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এ ঘাট দুটি পার হয়ে মাদ্রাজে ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করতেন, এবং মিশর হতে চীনদেশে ও পথিপার্শস্থ অন্যান্য নগরে বন্দরে গমনাগমন করতেন, এজন্য তারা এ দেশকে মা'বার বলে উল্লেখ করতেন। এ নাম দুটি হতে এটাও জানা যাচ্ছে, এ দেশের সাথে তাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ।"[২৯০]

"আরব ভূগোলবিদ আবু আবদিল্লাহ আল ইদরিসীও এ বন্দরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এটি একটি বড় বন্দর এবং কামরূপ থেকে নদীপথে কাঠ এনে এখানে বিক্রয় করা হয়। তিনি আরো জানান যে, এ বন্দরটি একটি বড় নদীর মোহনায় অবস্থিত। এসব বর্ণনা ইঙ্গিত বহন করে যে মেঘনা তীরের চাদপুরই ছিল সে নদীবন্দর যেখানে আরব বণিকগণ প্রধানত চন্দন কাঠের জন্য আসতেন। আবু আবদিল্লাহ আলইদরিসী লেখেছেন যে, বাগদাদ ও বাসরাহ থেকে আরব বণিক এবং পর্যটকগণ মেঘনার মোহনার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করতেন।
আরব ভূগোলবিদ আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবন খুরদাধবিহ লেখেন যে সরনদ্বীপের পর জাজিরাতুর-রামি নামক একটি ভূখন্ড আছে ।
আরব ভূগোলবিদ আল মাসউদী উল্লেখ করেন যে, ভারত সাগরের তীরে বিধৌত একটি দেশ রয়েছে।
আরব ভূগোলবিদ ইয়াকুত ইবন আবদিল্লাহ বলেন যে, এ ভূ-খন্ডটি মালাক্কার দিকে ভারতের দূরতম অঞ্চল।
একসময় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রামি বা বামু নামে একটি রাজ্য ছিল। সুলাইমান নামক একজন আরব বণিক বলেন যে রামির রাজার পঞ্চাশ হাজার হাতি এবং পনের হাজার সৈন্য ছিলো।
এসব তথ্য ইঙ্গিত বহন করে যে আরব ভূগোলবিদগণ জাজিরাতুর রামি নামে যে ভূ-খন্ডের উল্লেখ করেছেন তা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই ছিলো। কক্সবাজারের সমুদ্র সন্নিকটবর্তী আজকের রামু সে রাজ্যেরই একটি ক্ষুদ্রাংশ। আরব ভূগোলবিদগণের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে আরব বণিকগণ তাদের বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম আসতেন এবং মসলা, হাতীর দাত ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করতেন।"[২৯১]

---

২৯০. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ.১৪-১৫
২৯১. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১-২২

"নবি মুহাম্মদ মুস্তফার (স.) দুনিয়ায় আগমনের বহুকাল আগে বহুসংখ্যক আরব বণিক এদেশে (মালাবারে) আগমন করেছিলেন। তারা হরহামেশা এ পথ দিয়ে অর্থাৎ মালাবারের ওপর দিয়ে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে সিলেট ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। এভাবে বাংলার চট্টগ্রাম এবং তৎকালীন আসামের সিলেটও তাদের যাতায়াতের ঘাটি হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক ইসলামি যুগে মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানে আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিল।"[২৯২]

রাসূল (স.) এর আগমনের সময়টায় ধর্মের চেয়ে মানুষের কাছে জীবিকা নির্বাহটাই প্রাধান্য পেত বেশি। সেসময় লোকজন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করত। তবে এটাও সন্দেহাতীত যে, ব্যবসায়িক সফর বা লেনদেনের ক্ষেত্রে তারা তাদের ধর্মানুভূতির দ্বারা বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষকে প্রভাবিত করেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। বাংলাদেশে ইসলামের আগমনেও তখনকার আরব বণিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইসলামের বাণী প্রচারে মুসলিমদের আগমন

কুসংস্কার, অজ্ঞতা, বর্বরতার সমুদ্রে ডুবে থাকা এক জাতিকে মহান আল্লাহর দিকে ফিরাতে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মত মহৎপ্রাণ ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল মক্কা শহরে। তিনি ইসলামের সুমহান বাণী সকল মানুষের মাঝে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ভারত-বাংলাদেশ অঞ্চলেও সেখান থেকে বহু ধর্ম প্রচারক শুধুমাত্র ইসলামকে মানুষের মাঝে বোধগম্য করার জন্য নিজেদের ব্যক্তিজীবন উৎসর্গ করে এদেশে আগমন করেছিলেন। যাদের অনেকেই তাদের দ্বীন প্রচারের কার্যক্রমের জন্য আজও এ অঞ্চলের মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিম্নে সেসব ব্যক্তিদের অবদান ও ইতিহাস তুলে ধরছি :

"মহানবি মুহাম্মাদ (স.) আরবের মক্কা নগরীর অধিবাসী। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি পেয়ে প্রথম পর্যায়ে গোপনে আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। তিন বছর পর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসলে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেয়া শুরু করেন। ফলে মক্কার মুশরিকরা তার ওপর অত্যাচার শুরু করে। যার জন্য তাকে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করতে হয়। সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নতুন করে দাওয়াতি মিশন শুরু করলে মক্কার মুশরিকরা তার সে মিশনকেও থামিয়ে দেয়ার জন্য মদিনায় হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। ফলে বদর, ওহুদ সহ আরো অনেক যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই মধ্য ৬২৮ সালে হুদায়বিয়ার ঘটনা ঘটে। যাকে পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ ফাতহুম মুবীন বা মহান বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ সন্ধির ফলে আরব উপদ্বীপে কুরাইশদের কর্তৃত্ব শেষ হতে শুরু করে এবং মক্কা-মদিনার বাইরে ইসলামি দা'ওয়াতের বীজ বপন হয়। হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে রাসূল (স.) হাবশার সম্রাট নাজাশী, মিশরের সম্রাট মুক্বাওক্বিস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, রোম সম্রাট ক্বায়সার, ইয়ামামা প্রধান হাওয়া ইবন আলী, দামিনশকের গভর্নর হারিস ইবন আবী শামির গাস্সানী এবং আম্মানের সম্রাট জাইফারের নিকট প্রজাদেরসহ তাদেরকে ইসলাম কবুল করা জন্য পত্র প্রেরণ করেন।"[২৯৩]

"পত্র পাওয়ার পর এদের অনেকেই ইসলাম কবুল করেন, আবার অনেকে কবুল না করলেও ইসলাম ও মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি সুধারণা জন্মায়। ফলে তাদের এলাকায় ইসলামি দা'ওয়াতের দ্বার উন্মোচিত হয়। রাসূল (স.) ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য সে এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ করেন।"[২৯৪]

---

২৯২. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

২৯৩. আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০১

২৯৪. রাসূল (স.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২

"মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) তার 'ইসলাম কি সাদাকাত' নামক গ্রন্থে গুজরাটের ধারদার শহরের বাসিন্দা (গুজরাটের রাজা) রাজা ভোজের বংশধর বলে দাবীদার মৌলভী হাসান রিজা খাকের নিম্নরূপ এক বিবরণ পাওয়া যায়, গুজরাট রাজা ভোজ একদা আকামে চন্দ্র পর্যবেক্ষণের জন্য নিজ ইমারতের ছাদে আরোহণ করে দেখতে পেলেন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালে তারা যোগ সাধনা বলে বললেন, আরব দেশে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তার নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙুলের ইশারায় এ অলৌকিক ঘটনাটি দেখান। একথা শুনে সত্যপিয়াসী মুক্তিসন্ধানী ধর্ম তৃষ্ণাতুর রাজা মুহাম্মাদ (স.) এর কাছে দূত পাঠিয়ে দেন। পত্রে লেখেন, হে মহামান্য, আপনার একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান। যিনি আমাদেরকে আপনার পবিত্র ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন। তখন বিশ্বনবি তার জনৈক সাহাবিকে হিন্দে পাঠিয়ে দেন। তিনি রাজা ভোজকে ইসলামের বায়'আত দান করে তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ্। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে ধীরে ধীরে প্রজারা বিক্ষোভ শুরু করে। তারা রাজার বদলে রাজার ভাইকে তখ্‌তে বসায়। যে সাহাবি এসেছিলেন তিনিও এখানেই ইন্তিকাল করেন।"[২৯৫]

"মক্কায় থাকাবস্থায় মুহাম্মাদ (স.) এর দা'ওয়াত ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। হিজরত করার পর মদিনাকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হন মুহাম্মাদ (স.)। রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার পর ইসলামের দা'ওয়াত আর ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার বিস্তৃতি ঘটেছে। দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূল (স.) বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এর একটি ছিল শিক্ষিত সাহাবিদেরকে তিনি বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিতেন। এ কাজের ধারাবাহিকতা তার মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায়নি। আবু বকর (রা.) খলিফা হয়ে এ কাজ অব্যাহত রাখেন। উমর (রা.) খলিফা হয়ে এ কাজের গতি আরো বেড়ে যায়। রাষ্ট্রীয় খরচে মুবাল্লিগগণকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিয়ে ইসলাম প্রচার করা হতো। হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর মৃত্যুও পর উমাইয়া বংশের শাসক আল-ওয়ালীদ সিংহাসনে আরোহণ করার পর এ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারকগণ সবচেয়ে বেশি আসে। সে সময়েই ইসলামি জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ব্যাপকভাবে এ দেশে ছড়িয়ে পড়ে।"[২৯৬]

"খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে নবি মুস্তাফা (স.) আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বীন ইসলামের প্রচার কার্য শুরু করেন। তার প্রচার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। এ বিপ্লবের ঢেউ আরব বণিকদের মাধ্যমে মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট ও চীনদেশও যে পৌছেছিল, তা না বললেও চলে। নবি মুহাম্মদের (স.) বিপ্লবী আন্দোলনের যেমন চরম বিরোধিতা করেছে এক দল, তেমনি এ আন্দোলনকে মনেপ্রাণে গ্রহণও করেছে এক দল। মালাবারের আরববাসীগণ খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রারম্ভেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য যে, সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছিল আরব বণিকদের দ্বারাই। মালাবারে যেসব আরব মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করার পর স্থায়ীভাবে বসবাস করে তারা মোপলা নামে পরিচিত। ছোটো বড়ো নৌকার সাহায্যে মাছ ধরা এবং মাল ও যাত্রী বহন করা ছিল তাদের জীবিকার্জনের প্রধান পেশা। অনেক সময় তাদেরকে জীবিকার্জন ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আরব দেশে যাতায়াত করতে হতো। এভাবেই তারা ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের সংস্পর্শে এসেছিল।"[২৯৭]

---

২৯৫. উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১৪

২৯৬. মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান (ঢাকা : আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, ২০১১), পৃ.৩০

২৯৭. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

"মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহন করেন খ্রিষ্টীয় ৫৭০ সালে। এর মাত্র ৫০ বছর পর ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসে ইসলাম। আর উত্তরের জেলা লালমনিরহাটে শুরু হয় যাত্রা। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রাপ্ত শিলালিপি এমন দাবিই জোরালো করেছে। এতে আরও দেখা যায়, ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে দেশের প্রথম মসজিদটিও নির্মিত হয় এ জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের 'মজেদের আড়া' নামক গ্রামে। রংপুর জেলার ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাসুল (স.)-এর মামা, মা আমেনার চাচাতো ভাই আবু ওয়াক্কাস (রা.) ৬২০ থেকে ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। অনেকে অনুমান করেন, পঞ্চগ্রামের মসজিদটিও তিনি নির্মাণ করেন যা ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়।

মতিউর রহমান বসুনিয়া রচিত 'রংপুরে দ্বীনি দাওয়াত' গ্রন্থেও এ মসজিদের বিশদ বিবরণ আছে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন খিলজী এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও এসব তথ্য প্রমান করে যে, এর অনেক আসে এদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন খিলজীর বাংলা বিজয়ের প্রায় ৬০০ বছর আগে সাহাবিদের দ্বারা বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়। প্রথম মসজিদও নির্মিত হয় সে সময়েই।"[২৯৮]

"মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়াযীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (স.) সাহাবি আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব (রা.) নবুওয়াতের পঞ্চম সনে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬১৫ সনে) হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। নবুওয়াতের সপ্তম সনে (অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ৬১৭ সনে) তিনি কায়েস ইবন হুযাইফা (রা.), উরওয়াহ ইবন আছাছা (রা.), আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুইটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন। শায়খ যাইনুদ্দীন তার রচিত গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুজাহিদীনে' লেখেন যে ভারতের তামিল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে একদল আরব জাহাজে মালাবার এসেছিলেন। তাদের প্রভাবে রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম গ্রহন করেন। অতপর মাক্কায় গিয়ে তিনি কিছুকাল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (স.) সান্নিধ্যে থাকেন। আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব (রা) দীর্ঘ নয় বছর সফরে ছিলেন। মালাবার চেরর রাজা চেরুমল পেরুমল তার কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।

চীন যাবার পথে তাকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতেও নোঙর করতে হয়েছে। আর তার পবিত্র সাহচর্যে এসে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ নিশ্চই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে কারা ছিলেন সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তা আমাদের জানা নেই। চীনের মুসলিমদের বই পুস্তক থেকে জানা যায় যে, আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব (রা.) তার সাথীদেরকে নিয়ে খ্রিষ্টীয় ৬২৬ সনে চীনে পৌছেন। আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব (রা) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। সমুদ্র তীরের কোয়াংটা মাসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন। মাসজিদের নিকটেই রয়েছে তার কবর। দুইজন সাহাবির কবর রয়েছে চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের ওপর। চতুর্থজন দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে যান। এ সব তথ্য প্রমাণ করে যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (স.) যুগে চীনে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌছে এবং তা পৌছে একদল খাটি আরব মুসলিমের নেতৃত্বে। যারা বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে নোঙর করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে চীন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন তারা বাংলাদেশেও অবশ্যই ইসলাম প্রচার করেছেন। আর তা যদি হয়ে থাকে তাহলে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকেই বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে।"[২৯৯]

---

২৯৮. দি বাংলাদেশ টুডে পত্রিকা, জানুয়ারি ১৪, ২০১৯ খ্রি.

২৯৯. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০-২১

"বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে যে আরবরা বন্দর স্থাপন ও বসতি গড়েছেন, তাদের কাছে তাদের পিতৃভূমি আরবে ইসলামের নবির আবির্ভাবের মতো সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে এসে পৌছাতে বিলম্ব হয়নি। রাসূল (স.) এর আবির্ভাব এবং তার দীনে হকের আওয়ায লোকের মুখেমুখে বাইরেও প্রচার হয়েছিল। ইসলাম এক ব্যাপক প্রচারমুখী জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের প্রত্যেক অনুসারীই একেকজন মুবাল্লিগ বা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করবেন, এটা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ সাহাবিকে রাসূল (স.) হাবশায় পাঠিয়েছিলেন। কারণ লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। পশ্চিমে মিশর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশায় এসে যাত্রাবিরতি করত। এখানকার বাজারে বিপুল পরিমাণে পণ্য বিনিময় হত। রাসূল (স.) এ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটিকে খবর আদান-প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এখান থেকেই সাহাবি হযরত আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আরও তিনজন সাহাবি এবং বেশ কিছুসংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ পূর্ব দিককার সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথটি ধরে ইসলাম প্রচারকগণের একটি দল বের হয়ে পড়েছিলেন আর তাদের মাধ্যমে আমাদের এ উপমহাদেশের প্রতিটি উপকূলীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ও আরব উপনিবেশ থেকে শুরু করে সুদূর চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত ইসলামের বাণী রাসূল (স.) এর জীবদ্দশাতেই পৌছে গিয়েছিল বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে।"[৩০০]

"মাওলানা মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন, হাবশায় হিজরত হয়েছে নবুয়্যাতের পঞ্চম সালে। সপ্তম সালেই হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) সম্রাট নাজ্জাসীর দেয়া একটি সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। তার সাথে ছিলেন সাহাবি হযরত কায়েস ইবন হুযাফা (রা.), হযরত ওরওয়াহ ইবন আছাছা (রা.) এবং হযরত আবু কায়স ইবনুল হারেস (রা.)। রিজাল এর প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে উপরোক্ত চারজন সাহাবিরই নাম পাওয়া যায়। তারা যে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এ তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু হাবশা থেকে তারা মক্কা বা মদিনায় ফিরে গিয়েছিলেন কি না, কিংবা তাদের মৃত্যু কোথায় হয়েছে, এ সম্পর্কে কোন তথ্য সে সব কিতাবে নেই। চীন অভিযানকারী দলের নেতা ছিলেন হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব ইবন আবদে মানাফ। হযরত আবু ওয়াক্কাস ছিলেন রাসূল (স.) এর মাতা আমিনার আপন চাচাত ভাই। সে হিসেবে তিনি রাসূল (স.) এর মামা ছিলেন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যেসব তথ্যসূত্র রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারকগণ অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রাসূল (স.) এর মাতুল। তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আরও তিনজন সাহাবি ছিলেন। দলনেতা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটাং মাসজিদটি এখনও সমুদ্রতীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তার কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলিমদের প্রিয় যিয়ারতের স্থান রূপে পরিচিত হয়ে আছে। অন্য দুজন সাহাবি উপকূলীয় ফু-কীন প্রদেশের চুয়ানচু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের ওপর সমাহিত রয়েছেন।

হযরত আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে এ সাহাবিগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্যান্টন যাওয়ার পথে বাংলাদেশেও অবস্থান করেছিলেন। হিজ্‌রী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম আবাদন মারওয়াযীর বয়ান মুতাবিক হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব (রা.) নবুয়্যাতের পঞ্চম সনে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সপ্তম সনে তিনজন সাহাবি এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুইটি সমুদ্রগামী জাহাজযোগে চীনের পথে বের হয়ে যান চীনা

৩০০. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৬

মুসলিমদের বই-পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রা.) জামা'আত ৬২৬ সালে চীনে পৌছেছিলেন এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা হাবশা থেকে বের হওয়ার পর অন্যুন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। আর এ নয় বছর সময়-সীমার মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারত ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌছেছে। এসব তথ্যের আলোকে বলা যায় :

ক. বাংলাদেশে ইসলাম স্থলপথে নয় সমুদ্রপথে এসেছে।
খ. রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় এখানে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।
গ. বাংলাদেশে সাহাবিগণের আগমন হয়েছে এবং তারা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী রেখে গেছেন।
ঘ. অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা-এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলিমগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেননা হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রা.) সুদীর্ঘ সফরে প্রতিটি বিরতিস্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর এবং রসদাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চই হয়েছিল।"[৩০১]

"মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেকালে ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈন মতাবলম্বীদের উপরে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্ঠুর ও অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। এসব নির্যাতন উৎপীড়নের মুখে মুসলিম সাধুপুরুষের সাহচর্য ও সান্নিধ্য তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের দ্রুত বিস্তার লাভের প্রধান কারণ মালাবারের স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণ। মালাবার-রাজের ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত আছে। মওলানা আকরাম খাঁ তার পূর্ব বর্ণিত গ্রন্থে বলেন, হিন্দু সমাজের প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে মালাবার সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্বকোষের সম্পাদক মহাশয় তার অনেকগুলো উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোর বেশিরভাগই মহাভারত ও পুরাণাদি পুস্তক হতে উদ্বৃত পরশুরামের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলো উদ্ভট উপকথা ছাড়া আর কিছুই না। তবে এ কোষকার নিজে মালাবারের হিন্দুরাজা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন। শেখ যয়নুদ্দিন কৃত তোহফাতুল মুজাহেদীন পুস্তকেও একজন রাজার মক্কা গমন, তার হযরত রাসূলে করীমের খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তার এ বর্ণনা হতে জানা যাচ্ছে যে, মালাবারের রাজা-যে মক্কায় সফর করেছিলেন এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার নিকট ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে এটিই মশহুর ছিল।
মওলানা তার উক্ত গ্রন্থে আরও মন্তব্য করেন, স্থানকালাদির খুটিনাটি বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এবং সেগুলোকে অবিশ্বাস্য বলে গৃহীত হলেও রাজার মক্কায় যাওয়ার, হযরতের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার এবং কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করার পর দেশে ফিরে আসার জন্য সফর করার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার কোন কারণ নেই। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে একটা দেশের সমস্ত অধিবাসী আবহমান কাল হতে যে ঐতিহ্যকে সমবেতভাবে বহন করে আসছে তাকে অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া কোনও মতে বিবেচিত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচ্য হচ্ছে বিশ্বকোষের বিবরণটি। কোষকার বলেছেন: পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর (মালাবার) রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কা

৩০১. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮

নগরীতে গমন করেন। সুতরাং মালাবার রাজ্যের রাজার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করা এবং হযরতের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া আদৌ সংগত হতে পারে না। মালাবারের আরব মুহাজিরগণের এবং স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণের পর স্থানীয় মালাবারবাসীগণও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারপর মালাবারে পরপর দশটি মসজিদ নির্মিত হয়। প্রথম মসজিদ পেরুমলের রাজধানী কর্তক্লোর (কোড়ঙ্গনূর) বা ক্রাঙ্গানুরে নির্মাণ করেন মালেক ইবন দীনার। এভাবে ত্রিবাংকোরের অন্তর্গত কওলাম বা কোল্লমে, ডিল্লি পর্বতে, দক্ষিণ কানাডার অন্তর্গত কুর্কবে, এলোর নগরে, ধর্মপত্তন নগরে, চালিয়াম নগরে, সুরুকুন্ডপুরমে, পন্থারিণীতে এবং কঞ্জরকোটে মসজিদ নির্মিত হয়। বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন: মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে এদেশে মুসলিম প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সকল মসজিদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হয়েছিল। ঐ সময়ে উপকূলবাসী মুসলিমগণের এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যায় পরিবৃদ্ধি হয়েছিল। ক্রমে তারা রাজ্য-মধ্যে প্রভাব সম্পন্ন হয়ে উঠে।

মালাবারের পরেই মুসলিম আরব মুহাজিরদের বাণিজ্য পথের অন্যান্য মনযিল চট্টগ্রাম ও সিলেটের কথা আসে। মালাবারে আরব মুহাজিরদের স্থায়ী বসবাসের পর তাদের অনেকেই চট্টগ্রাম বন্দরে ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করে এবং এখানেও তাদের অল্পবিস্তর বসতি গড়ে উঠে। এটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ যে, মালাবারে যেমন প্রথম হিজরী শতকেই ইসলাম দানা বেধেছিল, চট্রগ্রামে ইসলাম প্রচার কি সমসাময়িক কালেই হয়েছিল, না তার অনেক পরে। এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তবে খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে আরবের মুসলিম বণিকদের চট্টগ্রামের সাথে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। ডক্টর আবদুল করিম তার 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন: খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবিয় মুসলিম বণিকদের যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে আরব ব্যবসায়ীদের আনা-গোনার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্য গঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এখনও পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের আগে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবি ভাষার প্রভাবের ফল। অনেক চট্টগ্রামী পরিবার আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করে। চট্টগ্রামী লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন, আলকরণ, সুলুক বহর (সুলুক-উল-বহুর), বাকলিয়া ইত্যাদি এখনও আরবি নাম বহন করে। আসে বলা হয়েছে যে, কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে, আরবি শব্দ শৎ (বদ্বীপ) এবং গঙ্গা (গঙ্গ) থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়।"[৩০২]

"ড.হাসান জামান এর মতে, হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে কয়েকজন ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে এসেছিলেন। এদের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মুহায়মিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসে হযরত হামিদ উদ্দিন, হযরত মুর্তাজা, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব। এ রকম পাচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসে। তাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা বই-কিতাবও থাকত না। তারা রাজক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাদের প্রচার পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এ যে, তারা এদেশের চলিত ভাষার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করতেন। অল্পসংখ্যক সত্যিকার মুসলিম তৈরী করা তাদের লক্ষ্য ছিল। তারা গ্রামে বসবাস করতেন ও সফর করে ধর্ম প্রচার

৩০২. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬-১৯

করতেন। তাদের বলা হতো 'আবিদ'। তারা বিভিন্নস্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচারকার্য চালিয়ে যেতেন।"[৩০৩]

"উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ভারতীয় শাসক ও পণ্ডিতদের সাথে আরব মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগের কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। উমাইয়া খলিফা উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) (শাসনকাল ৭১৭-৭২০ ঈসায়ী) ভারতীয় রাজাদেরকে ইসলাম কবুল করার দা'ওয়াত দিয়ে বহু সংখ্যক পত্র লেখেন। পত্র যোগাযোগের ফলে ব্রাহ্মণবাদের রাজা জয়সিংহ ইসলাম কবুল করেন। তখনকার বাংলার অবস্থা সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক লেখেছেন যে, সে সময় চট্রগ্রাম এলাকায় মুসলিম আমীর বা সুলতানের অধীনে একটি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। আবয়াসীয় শাসনামলে ভারতের সাথে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ড. মুহাম্মদ যাকী লেখেছে:

With the coming of the Abbasids to power (750 A.D) the centre of gravity shifted from Damascus to Baghdad which stood on the bank of the Tigris. The proximity of the Abbasid capital gave a new turn to the commercial activities of the Arabs. They penetrated into the South and established numerous colonies there. The unprecedented literary activity under the Abbasid caliphs and the establishment of Baitul Hikmah produced vast literature on religious and secular sciences. Large number of Greek works and Indian classics of science and other subjects were translated into Arabic. Through these translations and cultural contacts between Baghdad and India, the Arabs became familier with the life and thought of the Indian people.

ভারতীয় বিভিন্ন রাজার দরবারে মুসলিমগণ বিচারকের আসন লাভ করেছেন। এসব ভারতীয় শাসক আরবদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে নয় শতকের আরব বণিক সুলায়মান উল্লেখ করেছেন। তাদের শাসনে আরবরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন এবং মসজিদে নিয়মিত সালাত আদায় করতেন। আরব ঐতিহাসিকগণ তাদের উদারনীতির জন্য তাদেরকে 'আরবপন্থী মহান ভারতীয় শাসক' রূপে উল্লেখ করেছেন।"[৩০৪]

"ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে বাংলা কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল না। কোন শক্তিশালী রাজাও এ এলাকায় ছিল না। ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্তি ছিল। এ অবস্থার মধ্যেই এখানে মুসলিমদের স্বশাসিত বা সামাজিক শাসিত অঞ্চল গড়ে উঠতে থাকে। সাত শতকের মধ্যভাগ থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাচশ বছর রাজশক্তির কোন রকম পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলাম প্রচারকগণ এ জনপদে কাজ করেন। প্রচারকগণের ত্যাগ ও কুরবানির মধ্য দিয়ে এ দেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়। এ দীর্ঘ সময়ের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য আলিম, সুফি ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাদের মধ্যে বায়েজিদ বোস্তামী (চট্রগ্রাম, মৃত্যু ৮৭৯ ঈসায়ী), সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া, মৃত্যু

৩০৩. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫
৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮-৮৯

১০৪৭), শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ বুতশিকন (ঢাকা), শাহ্ মাখদুম রূপোস (রাজশাহী, মৃত্যু ১১৮৪) প্রমুখের নাম জানা যায়।

মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগেকার কজন ইসলাম প্রচারকের কথা উল্লেখ করে বলেন: "অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে একদল ইসলাম প্রচারক সমুদ্রপথে আরব দেশ থেকে এসে বঙ্গপসাগরের তীরে নামেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন হন। অনেকের মতে, শেখ আবয়াস ইবন হামজাহ নিশাপুরী এ ঢাকাতেই ইসলাম প্রচার করতে করতে ২৮৮ হিজ্‌রী/৯০০ ঈসায়ী সনে ইন্তিকাল করেন। সোজা কথায়, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তিন শত বছর আগে ঢাকায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এ দশম শতাব্দীতে ঢাকায় আরো যারা ইসলাম প্রচার করেন তাদের মধ্যে হযরত শেখ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (মৃত্যু ৩৪১ হি./৯৫২ ঈসায়ী), হযরত শেখ ইসমা'ঈল ইবন নযন্দ নিশাপুরী (মৃত্যু ৩৬৬ হি./৯৭৫ ঈসায়ী), প্রমুখ রয়েছেন।"[৩০৫]

"ইসলামের সোনালী যুগের এবং তার নিকটবর্তী যুগের মুসলিমগণ যে উদ্দেশ্যে যেখানেই যেতেন না কেন তারা ইসলামি জীবনদর্শনের মর্মকথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেসব মুসলিম বাংলাদেশে এসেছিলেন তারাও নিশ্চই মুবাল্লিগ হিসেবে কর্তব্য পালন করেছেন। তবে তাদের তৎপরতা ও প্রভাব সম্পর্কে তথ্য অনুপস্থিত। আবার, ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্যই এসেছেন অনেকে তাদের ব্যাপারেও ইতিহাস নীরব। তবে কিছু সংখ্যক মুবাল্লিগের ব্যাপারে ইতিহাস নীরব থাকতে পারেনি। মধ্য এশিয়ার বালখের শাসক শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বালখী রাজ্য শাসন ত্যাগ করে দিমাসক এসে তাওফীক নামক একজন নেক লোকের সান্নিধ্যে থাকেন বহু বছর। উক্ত ব্যক্তি তাকে বাংলাদেশে এসে ইসলাম প্রচারে উৎসাহিত করেন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখী নৌ-পথে সনদ্বীপ পৌছেন। অতপর নৌপথে তিনি আসেন হিন্দু রাজা বলরামের রাজ্য হরিরামনগর। সম্ভবত মানিকগঞ্জ জিলার হরিরামপুরই সে কালের হরিরামনগর। রাজা বলরাম একজন মুসলিম মুবাল্লিগের উপস্থিতি বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখী ও তার সংগীদের ওপর চড়াও হন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখীও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। সংঘর্ষে রাজা নিহত হন। রাজার মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখী এ নও মুসলিম মন্ত্রীকেই সিংহাসনে বসান। এরপর তিনি রাজা পরশুরামের রাজ্য (বগুড়ার) মহাস্থানে আসে। রাজার বোন শিলাদেবী তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বালখীকে তাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রাজা পরশুরাম সুলতান বালখী ও তার সংগীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালান। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। পরে তার মন্ত্রীও যুদ্ধ চালিয়ে প্রাণ হারান। শিলাদেবী কালী মন্দিরে আশ্রয় নেন। পরে করতোয়া নদীতে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুরবণ করেন। রাজকুমারী রত্নমনি বন্দী হন। মুসলিমদের কথা ও আচরণ তাকে মুগ্ধ করে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নিহত রাজা পরশুরামের সেনাপতি সুরখাবও ইসলাম গ্রহণ করেন। শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বলখীর উদ্যোগে সুরখাব ও রত্নমনির বিয়ে সুসম্পন্ন হয় ।

মহাস্থানে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বালখী মাসজিদ ও ইসলামি শিক্ষালয় স্থাপন করেন। নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের নেত্রকোনা অঞ্চলে এসেছিলেন একজন বিশিষ্ট মুবাল্লিগ। তার নাম শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমী। একটি ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে ১০৫৩

৩০৫. মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, বাংলাদেশে ইসলাম (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ২৫জুলাই, ১৯৮৬

সনেও তিনি জীবিত ছিলেন। একদল সংগী নিয়ে তিনি মদনপুর নামক স্থানে পৌছেন। এটি ছিলো তখন একজন কোচ রাজার শাসনাধীন। কোচ রাজা প্রথমে তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। পরে তার মনোভাব পরিবর্তিত হয়। কোচ রাজা শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমীকে মদনপুর গ্রামটি দান করেন। এখানে অবস্থান করে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমী ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে বিক্রমপুরে (যার একাংশ মুন্সিগঞ্জ জিলায় শামিল) একদল সংগী নিয়ে আদম নামক একজন মুবাল্লিগ এসেছিলেন। এ স্থানটি তখন বল্লাল সেন নামক একজন রাজার শাসনাধীন ছিলো। আদম সাথীদেরকে নিয়ে এক স্থানে তাবু স্থাপন করে খাওয়ার জন্য একটি গরু জবাই করেন। একটি কাক গরুর গোশতের একটি টুকরা নিয়ে উড়ে যায়। আরেকটি কাকের তাড়া খেয়ে কাকটি গরুর গোশতের টুকরাটি ফেলে দেয়। রাজা বল্লাল সেনের সৈন্যদের একটি ক্যাম্পে গোশতের টুকরাটি পড়ে। সৈন্যরা বিষয়টি রাজাকে জানায়। হিন্দুরাজা বল্লাল সে রাগান্বিত হন এবং মুবাল্লিগ গ্রুপটির ওপর হামলা করার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। আদমের নেতৃত্বে মুবাল্লিগগণ আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। চৌদ্দ দিন পর্যন্ত লড়াই চলে। পঞ্চদশ দিবসে রাজা নিজে রণাঙ্গনে আসে। চৌদ্দ দিন যুদ্ধ চলাতে রাজা বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি রাজধানীতে একটি অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করালেন এবং মহিলাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি পরাজিত হয়েছেন জানতে পেলে তারা যেন অগ্নিকুন্ডে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তিনি তার পোশাকের নিচে একটি কবুতর লুকিয়ে নিলেন। বলে গেলেন যে কবুতরটি উড়ে এলে বুঝতে হবে যে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছেন। রাজার প্রচন্ড আক্রমণের মুখে মুসলিমগণ একে একে প্রাণ হারাতে থাকেন। অবশেষে আদমও শাহাদাত বরণ করেন। এটি ছিলো ১১১৯ সনের ঘটনা। রামপাল গ্রামে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজা পুকুরে নেমে রক্ত রঞ্জিত পোশাক ধুতে থাকেন। হঠাৎ কবুতরটি পোশাকের নীচ থেকে বেরিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে উড়ে যায়। তার আগমনে রমণীকুল অগ্নিকুন্ডে ঝাপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রাজা ছুটলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। এসে দেখেন সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শোকের প্রাবল্যে তিনিও ঝাপ দিলেন সে অগ্নিকুন্ডে। মনে হয় স্থানীয় লোকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুসলিম ছিলেন। তারা আদম এবং তার সাথীদের মৃতদেহ কবরস্থ করেন। অমুসলিমদের তো মুসলিমদের মৃতদেহ দাফন করার পদ্ধতি জানা থাকার কথা নয়।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে শাহ মাখদুম রূপোস নামে একজন মুবাল্লিগ আসে রাজশাহী অঞ্চলে। খ্রিষ্টীয় ১১৮৪ সনেও তিনি সেখানে ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলে তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ। রামপুর নামক গ্রামে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন। তার পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার লোকদেরকে আকৃষ্ট করে। তার সান্নিধ্যে এসে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করত। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে কিংবা তার সান্নিধ্যে থাকার আকর্ষণে বহু নও মুসলিম রামপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাদের সংখ্যা এত বেশি হয় যে রামপুর গ্রামে আর ঠাই মিলছিল না। তাই পার্শ্ববর্তী গ্রাম বোয়ালিয়াতেও তারা বসবাস করতে শুরু করেন। রামপুর-বোয়ালিয়া বাস্তবে ইসলামি লোকালয়ে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, এ রামপুর-বোয়ালিয়াকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠে রাজশাহী শহর।"[৩০৬]

"বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাই শেষ কথা নয়, মূল কথা হলো স্মরণাতীতকাল থেকে বিপুলসংখ্যক অমুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে মুসলিম প্রভুত্ব অব্যাহত রাখা। ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এদেশের আদিবাসীরা ছিল নবাগতদের সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবাপন্ন। তারা শুধু নিজেদের মৌলিক বিশ্বাসে বিরোধী ছিল না, জন্ম

৩০৬. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৬

থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি দিকেও তারা ছিল বিরোধী। কাজেই বাংলার মুসলিম শাসকরা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামে বিশ্বাসীদের মধ্যে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ উদ্দেশ্যে তারা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিতে মসজিদগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ নামায আদায়ের সুযোগ দান করে। বস্তুত কোন নতুন এলাকা অধিকৃত হওয়ার পর সেখানে মুসলিম বসতি স্থাপিত হলে মুসলিমদের নামায পড়ার সুবিধার্থে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হত। এভাবে আঠারো শতক পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এদের অনেকগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও কয়েকশ মসজিদ এখনও টিকে আছে। তৎকালের যে সব মসজিদ এখনও টিকে আছে তার সবগুলোই পাকা ইমারত। এ ছাড়াও ছিল মাটির তৈরী বা খড়ের চালাবিশিষ্ট অসংখ্য মসজিদ যার অস্তিত্ব বা সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত বা স্থানচ্যুত এবং জাদুঘরে রক্ষিত বা অন্যান্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত বহু আরবি ও ফারসি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদগুলো শাসকদের বা তাদের কর্মচারীদের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপিগুলো সাধারণত কুর'আনের আয়াত বা মহানবি (স.)-এর হাদিস, বা উভয় বাক্য দিয়েই শুরু হয়। শিলালিপিগুলোতে এ ধরনের ধর্মীয় ইমারত নির্মাণের জন্য পরকালে নির্মাতার জন্য অপেক্ষামান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি থাকে। কাজেই শাসকরা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের উপলব্ধি থেকে মসজিদগুলো নির্মাণ করেছিলেন।

অনুরূপভাবে তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা, স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিশুদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য মসজিদগুলো মক্তব হিসেবেও কাজ করত। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য বহু মাদ্রাসা ছিল, কিন্তু তারা বিশেষ করে শহর ও নগরগুলোতে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছিলেন। শাসকবৃন্দ সরকারি খরচে তাদের কর্মচারীদের দিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে হিতৈষী ব্যক্তিবিশেষও এগুলো প্রতিষ্ঠা করতেন। 'দার-উল-খয়রাত' বা 'বিনা-উল-খায়ের' নামে পরিচিত কিছু কিছু আবাসিক প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ থাকা ও খাওয়ার সুযোগ-সুবিধা পেতেন। উলামা ও সুফিদের মতো ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলো ছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'ইলম-ই-দ্বীন' ও 'ইলম-ই-শরা' শিক্ষা দেয়া হত। ইলম-ই-দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞান এবং ইলম-ই-শরা বা শরিয়তের জ্ঞান দ্বারা বহু কিছু বোঝানো যেতে পারে। বর্তমানের মত ওই যুগেও আলিম হওয়ার জন্য একজন মানুষকে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হত এবং তাকে কুর'আন, হাদিস, তাসাউফ, মান্তিক, কালাম, এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় পড়তে হত। তাকে আরবি এবং ফারসি ভাষাও শিখতে হতো।

সুফি-সাধকও তাদের অনুসারীদের নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে খানকাহগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেগুলো সুলতানগণ বা সুফিরা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করতেন, তবে সেগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত। শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজি, শাহ জালাল, শেখ নূর কুতুব আলম এর মতো কতিপয় প্রখ্যাত সাধকের খানকাহগুলো আজও টিকে আছে। মুগল আমলের সুফিদের খানকাহগুলো এখনও বিদ্যমান। মুসলিম শাসকরা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহর ব্যয় নির্বাহের জন্য জমিন দান করতেন। তারা উলামা এবং মাশায়েখদের মত জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের জন্যও জমিন দান করতেন। এসব জমিন ইনাম (পুরস্কার), ওয়াজিফা (ভাতা) এবং মদদ-ই-মাশ (জীবিকা নির্বাহের জন্য সাহায্য) রূপে প্রদান করা হত। কাজেই উলামা ও সুফি সাধকরা জ্ঞানান্বেষণ ও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তা ভোগ করতেন। মুসলিম শাসকরা

বরাবরই উলামা, সুফি ও অপরাপর ধর্মীয় নেতাদের উৎসাহ দিয়ে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বাংলায় মুসলিম সমাজ বিকাশে সহায়তা করতেন।"[৩০৭]

মুসলিম বিজয়কালে বাংলা ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ প্রধান দেশ। হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংখ্যার অনুপাত নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা সত্য যে, বখতিয়ারের বিজয়ের সময় হিন্দু সে বংশীয়রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও বহু শতক ধরে বৌদ্ধরা বাংলা শাসন করেছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন সারা বাংলায় রাজত্ব করছিলেন। তাছাড়া অনার্য উপাদান সব সময়ই বাংলায় ছিল, বিশেষত শহুরে কেন্দ্রগুলোর বাইরে এবং নদীবেষ্টিত বাংলায়। নিজ জন্মভূমি অর্থাৎ উত্তর ভারত থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম ছিল মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে হিন্দু ধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। অনার্য উপাদানগুলো কোন না কোন ভাবে অধঃপতিত বৌদ্ধদের সঙ্গে নিজেদের একীভূত করেছিল এবং এভাবে যখন সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল তখন ইসলাম এক ত্রাতা-শক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছিল এবং অনেকেই এতে মুক্তি ও সাফল্যের সহজ পথ খুজে পেয়েছিল। এটা সম্ভবত স্থানীয় জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরণে প্রলুব্ধ করেছিল। এটা লক্ষ করার ব্যাপার যে, বহু শতক ধরে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তর ভারতে ইসলাম শহুরে কেন্দ্রগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলে ইসলাম গ্রামীণ মানবগোষ্ঠীকে জয় করেছিল। এ অঞ্চলে বহিরাগত লোকদের আগমন মুসলিমদের সংখ্যাধিক্যের তত বড় কারণ ছিল না যতটা ছিল হিন্দুধর্মের কঠোর বর্ণপ্রথার কারণে ইসলামে ধর্মান্তরণ। ভারত বা বাংলায় বলপূর্বক ধর্মান্তরণের কোন প্রমাণ নেই। মুসলিম শাসনের কয়েক শত বছরে এটা আশা করা যায় না যে, সব শাসকই ধর্মীয় পক্ষপাতমুক্ত বা বলপূর্বক ধর্মান্তরণের প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিলেন, তবে সাধারণ মত হচ্ছে যে, তা ছিল নিতান্তই সীমিত। বাংলায় ব্যাপক ধমান্তরণকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার তত্ত্ব দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ বহু হিন্দু মন্ত্রীর পদসহ অন্যান্য সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুধর্ম একই গ্রামে দ্বিজ-ব্রাহ্মণের সঙ্গে পতিতের বসবাস নিষিদ্ধ করেছিল, তাকে সাধারণ দাসসুলভ কাজ ও ঘৃণ্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল এবং বস্তুত করুণার অযোগ্য এক জীব হিসেবে তার সঙ্গে আচরণ করেছিল। কিন্তু ইসলাম দরিদ্র ও ধনী, ক্রীতদাস ও তার প্রভু, কৃষক ও রাজা সকলকে সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে সমান ঘোষণা করেছিল। সর্বোপরি ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি ধার্মিক ভূমিদাসদের পরকালের জন্য কোন আশা দিতে পারেনি। অন্যদিকে মোল্লারা যে শুধু এ জগতে সুখের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাই নয়, তারা পরজগতেও অনন্ত সুখের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সুতরাং কাঠুরে ও পানিওয়ালার মতো অতি নিম্ন শ্রেণির শ্রমজীবী, বহু হতাশ চন্ডাল ও কৈবর্ত সাম্যবাদী ইসলাম ধর্ম সানন্দে গ্রহণ করেছিল।

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের কয়েকজন ইসলাম প্রচারকের কার্যক্রম

"এ বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর অনেক উলামা ও ইসলামের দা'ঈগণ জনগণের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করেছেন। প্রথম দিকের দা'ঈগণ সাধারণত আরব দেশ সমূহ থেকে এসে এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে তাদের হাতে গড়া এ এলাকার মানুষই ইসলামি দা'ওয়াত প্রচারে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে যে সকল ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, শাহ তুর্কান শহিদ। তিনি উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় এসেছিলেন। করতোয়া নদীর অদূরে শেরপুরে তার সমাধি দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী বর্তমান রাজশাহী জেলায় এসেছিলেন। তিনি একজন প্রথিতযশা ও উচ্চ স্তরের ইসলামি শাস্ত্র পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি মাদ্‌রাসাও

৩০৭. বাংলা পিডিয়া

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১২৬০ সালে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্ দিল্লীতে আসে। তিনি ইসলামি ফিক্হ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। দিল্লীতে ইসলাম প্রচার কাজ শুরু করার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চর্তুদিকে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১২৮০ সালের দিকে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীনের পরামর্শে ইসলাম প্রচার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সোনারগাওয়ে চলে আসে। সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দ্বীন প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখেন। সিলেট এলাকার একজন সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হলেন হযরত শাহ্ জালাল (র.)। শায়খ বুরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলিম সিলেটে বাস করতেন। পুত্র-সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে তিনি একটি গরু কুরবানি দেন। এ খবর জানতে পেরে সেখানকার রাজা গৌর গোবিন্দ গরু হত্যার শাস্তি স্বরূপ শায়খ বুরহানুদ্দীনের ডান হাত কেটে দেয় এবং তার সে পুত্র সন্তানকে হত্যা করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত শাহ্ জালাল (র.) ৩৬০ জন মুজাহিদ নিয়ে রাজা গৌর গোবিন্দের রাজ্যে আক্রমণ করেন। রাজা গৌর গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত শাহ্ জালাল (র.) সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সিলেটর বাইরে মুমিনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, আসাম, মেঘালয় সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এসে তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। নোয়াখালী এলাকার একজন প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হলেন সাইয়্যেদ হাফিজ মাওলানা আহ্মাদ তান্নুরী (র.)। তিনি বড় পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর পৌত্র ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল মাওলানা আজাল্ল (র.)। হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমনের (১২৫৮ সাল) পর ইরাকের অনেক আলিম-উলামা ইরান, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানে চলে আসে। মাওলানা আজাল্ল (র.) নানা স্থান ঘুরে অবশেষে দিল্লীতে চলে আসে। সে সময়ে তার ঘরে জন্ম নেন সাইয়িদ হাফিজ মাওলানা আহমাদ তান্নুরী (র.)। যৌবন বয়সে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি দিল্লী থেকে নোয়াখালীতে চলে আসে। এ এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ও তার দলবল ইসলাম প্রচারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শায়খ বদরুল ইসলাম গৌড়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক ছিলেন। গৌড় অঞ্চলে ইসলামের শিক্ষা প্রচারে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। ইসলামের শিক্ষা প্রচারের অপরাধে রাজা গণেশ তাকে অনেক নির্যাতন করেছিলেন। কিন্তু তিনি এতই নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা একজন বীর মুজাহিদ ছিলেন যে, রাজা গণেশের যুলুম-নির্যাতন উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে রাজা গণেশ ক্রোধান্ধ হয়ে শায়খ বদরুল ইসলামকে হত্যা করে এবং তার অনেক সাথীকে নদীতে ডুবিয়ে মারে। গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহের আমলে (১৪৩৭-১৪৫৯) খান জাহান আলী (র.) যশোহর এলাকায় আসে। এখানকার একটি অতি পরিচিত নগরী হলো বারোবাজার। এ এলাকায় এসে তিনি একটি মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ এলাকাটি হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবিত ছিল। হযরত খান জাহান আলী (র.) এর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেন। মুসলিমদের নামানুসারে কিছু গ্রামের নামকরণ করেন। তার কয়েকজন ভক্ত এ এলাকায় থেকে ইসলাম প্রচারের কাজ করতে থাকেন। যশোহর থেকে তিনি চলে যান খুলনা জেলার বাগেরহাটে। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ্ তাকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। একটি রাজ্যের সেনাপতি হয়েও জনগণের সামনে তিনি নিজেকে একজন যথার্থ মুসলিম হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং জনগণের সেবায় ব্যস্ত থাকতেন। জনগণের হিতার্থে তিনি এলাকায় বহু রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, দীঘি খনন, মাসজিদ নির্মাণ এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। জনগণ তার আচার-ব্যবহারে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে, অনেক অমুসলিমকে নতুন করে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার প্রয়োজন হয়নি, মানুষ দলে দলে আসত এবং তার হাতে ইসলাম কবুল করত।"[৩০৮]

৩০৮. বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭

দেশ জয়ের জন্য আগমন

জগৎবিখ্যাত মদিনা সনদের মাধ্যমে প্রথম মুসলিমগণ বৈশ্বিক স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে অনুপম এক পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণে তারা সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়। মুসলিমরা যখন শৌর্য বীর্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করে। বিধর্মী শাসকরা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে ঔদ্বত্য প্রদর্শন করলে মুসলিমরা সেসব দেশে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে জয় করে নেয়। যেখানে বা যেসব দেশে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতনের আওয়াজ উঠেছে সেখানেই মুসলিমদের যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়েছে। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিম্নে এতদঞ্চলে মুসলিমদের সেসব অভিযান এবং শাসনের বর্ণনা উপস্থাপন করছি :

"মুসলিম শাসনের আগে ভারতের জনসাধারণ দীর্ঘ কাল যাবত বিভিন্ন শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল। বিশেষ করে গরীব ও নিচু শ্রেণীর মানুষের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। এ ছাড়াও যুদ্ধ-বিবাদ ছিল তৎকালীন সমাজের প্রাত্যহিক চিত্র। গোত্র শাসন থাকায় নিচু শ্রেণীর লোকদেরকে কেবল দাসত্বের জীবন যাপন করতে হতো। এমনই এক পরিবেশ পরিস্থিতিতে আরবে মুহাম্মাদ (স.) ইসলামের দাওয়াতি মিশন শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ দা'ওয়াত মক্কা মদিনায় সীমাবদ্ধ থাকলেও অল্প সময়েই তা আরব সীমানা পেরিয়ে চলে যায় আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ায়। মুহাম্মাদ (স.) এর ইসলামি দা'ওয়াতি কার্যক্রম শুরু করার পর প্রায় পাচশত বছর পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে আলিম-উলামা ও ইসলামের দা'ঈগণ কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া জনগণের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করেছেন। সে দা'ওয়াতি ভিত্তির ওপরই ১২০৩ সালে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এদেশের জনগণ ইসলাম প্রচারকদেরকে পেয়েছিলেন তাদের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকায়। ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের প্রত্যাশা ও সংগ্রামের মাঝে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি জনগণের সমর্থন ও সহমর্মিতার দৃঢ় ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। এদেশের জনগণ মুসলিম বিজয়ী বখতিয়ার খিলজীকে একজন বহিরাগত যালিম শাসক হিসেবে দেখেনি বরং তাকে পেয়েছে একজন মুক্তিদূত হিসেবে। জনগণের এ বিশ্বাসের ভিত্তি গড়েছিলেন ইসলাম প্রচারকগণ। তাদের আচার-ব্যবহার, উঠা-বসা, লেন-দেন, ত্যাগ, ধৈর্য, পরোপকারিতা ইত্যাদির কারণে জনগণের মাঝে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বিশ্বাস জন্মেছিল। বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের ফলে লখনৌতিকে কেন্দ্র করে এ দেশীয় নওমুসলিম ও বহিরাগত মুসলিমদের সমন্বয়ে বাংলায় প্রথম আনুষ্ঠানিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার এ নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা উত্তরে বর্তমান বিহারের পূর্ণিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই মুসলিম শাসকরা খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, এমন সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজে যদি ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা না হয় তাহলে মুসলিম শাসন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। তাই শাসকদের সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে মাসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।"[৩০৯]

"বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এদেশে ক্রমাগত মুসলিমদের আগমন ঘটে। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান অবলম্বন হিসেবে আসে সৈন্যরা। ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন ঘটে সৈয়দ, উলামা ও মাশায়েখদের মত ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের। আগমন ঘটে রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা ও শাসনকার্যে দক্ষ বেসামরিক সরকারি কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও দক্ষ কারিগরদের। তারা সবাই এসেছিল চাকরি অথবা উন্নততর জীবিকার সন্ধানে। তের শতকে মোঙ্গলদের

৩০৯. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪) পৃ.৩০-৩১

হাতে বাগদাদের খিলাফতের ধ্বংসের ফলে মধ্য এশীয় মুসলিমদের ব্যাপক অভিভাসন ঘটে এবং তারা রাজধানী দিল্লির লক্ষ্মণাবতীতে আশ্রয় নেয়। এমনকি তারা প্রত্যন্ত এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো থেকে আগত মুসলিমদের সাদরে গ্রহণ করা হয়। তারা 'আইজ্জা' বা সম্মানিতরূপে পরিচিত হয় এবং তাদের উপযুক্ত চাকরি বা মর্যাদা প্রদান করা হয়।"[৩১০]

"আর এক শ্রেণীর মুসলিম এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দেশজয়ের অভিযানে। তাদের বিজয়ের ফলে এ দেশের মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বলা বাহুল্য ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন কাসিম আগমন করেন বিজয়ীর বেশে এবং এটা ছিল ইসলামের বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। তার বিজয় সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্তই সীমিত থাকেনি। বরঞ্চ তা বিস্তার লাভ করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত।"[৩১১]

"উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদের শাসনামলে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলের রাজা ছিলেন দাহির। তার শাসনামলে সিন্ধুর সামুদ্রিক বন্দরের নিকট জলদস্যুদের দ্বারা মুসলিমদের আটটি বাণিজ্যিক জাহাজ লুণ্ঠিত হয় এবং যাত্রীদেরকে বন্দি করে চরম নির্যাতন চালানো হয়। এ খবর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এর কাছে পৌছালে বন্দীদেরকে মুক্তি ও লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া এবং জলদস্যুদের শাস্তি দেয়ার জন্য রাজা দাহিরের কাছে পত্র পাঠান। রাজা দাহির এতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবন কাসিমের নেতৃত্বে ছয় হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ উষ্ট্র বাহিনী দিয়ে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হিন্দুরা প্রাণপণ লড়াই করেও ব্যর্থ হয়। রাজা দাহির এ যুদ্ধে নিহত হন। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে মুসলিম মুজাহিদগণ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা ও এর বিস্তার করার লক্ষ্যে আরো সামরিক অভিযান চালাতে থাকেন।"[৩১২]

"৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে পালবংশের রাজত্ব শুরু হয়। পালগণ বৌদ্ধ ছিলেন। পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল। তিনি ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ধর্মপাল পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে কান্যকুব্জে অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর রাজ্যের রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন। ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন যে, যবন রাজ্যটি সম্ভবত সিন্ধু নদীর তীরবর্তী কোন মুসলিম অধিকৃত রাজ্য হবে। ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ এবং নবম শতকের প্রথম ভাগে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী আর মুসলিম শাসিত এক বা একাধিক রাজ্যের সাথে পাল শাসিত বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল।

আগে বলেছি যে, খ্রিষ্টীয় ৭৫০ সনে বাংলাদেশে পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়। আর খ্রিষ্টীয় ৭৫০ সনেই বাগদাদে বানুল আব্বাস খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপাল যখন বাংলাদেশের শাসক তখন বাগদাদের শাসক ছিলেন হারুনুর রশীদ। রাজশাহীর পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহার খননকালে একটি আরবি মুদ্রা পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটি তৈরী হয়েছে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ হারুনুর রশীদের শাসনকালে। কুমিল্লা জিলার ময়নামতিতে অনুরূপ খননকার্য কালে বানুল

৩১০. বাংলা পিডিয়া

৩১১. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

৩১২. দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

আব্বাস যুগের দুইটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এসব মুদ্রাপ্রাপ্তি এ কথাই প্রমাণ করে যে খ্রিষ্টীয় নবম শতকে বাংলাদেশে আরব মুসলিমদের যাতায়াত ছিলো।"[৩১৩]

"লখনৌতিতে যখন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও তা ছিল আববাসীয় খিলাফতের অংশ। খলিফার ক্ষমতা হ্রাস পেলেও সর্বত্রই তাকে সুন্নি মুসলিমদের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক প্রধানরূপে গন্য করা হত। বাংলার মুসলিমরাও ছিল এ মতের অনুসারী এবং বাংলার প্রথম দিকের কয়েকজন সুলতান বস্তুত তাদের মুদ্রায় আববাসীয় খলিফাদের নাম উৎকীর্ণ করেছিলেন। অপর কোন কোন সুলতান বস্তুত খলিফার নাম উৎকীর্ণ না করলেও তাদের মুদ্রায় খিলাফতের প্রতি আনুগত্য নির্দেশক উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। প্রাক-মুগল আমলে বাংলার মুসলিম রাজ্য ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাধীন রাজ্য। এ গোটা আমলেই বাংলার শাসকরা সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং এ করে তাদের রাজ্যকে সালতানাতের বৈশিষ্ট্য দানের ঘোষণা দেন। বাংলার কোন কোন সুলতান নিজেরাই 'খলিফা' উপাধি ধারণ করেছিলেন। ভারতে বা বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠার বহু আগে বাগদাদের খিলাফতের অবসান ঘটেছিল। কাজেই খিলাফত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তাদের করণীয় কিছু ছিল না। মুগলরা 'শাহীনশাহ' (রাজাধিরাজ) উপাধি গ্রহণ করেন এবং শাহজাদাদের 'সুলতান' উপাধি প্রদান করেন। বাংলা বা সুবাহ বাংলাহ বরাবরই ছিল মুগল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। তুর্কি বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় রূপ পাল্টে দেয়। রাজনৈতিকভাবে তা মুসলিম শাসনের বীজ বপন করে, কিন্তু সামাজিকভাবে গড়ে তোলে একটি মুসলিম সমাজ, যার ফলে তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের বিপুলসংখ্যক অভিবাসীদের জন্য বাংলার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থা তৎকালীন সমাজের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বাংলায় ইসলামের প্রসার ছিল এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া।"[৩১৪]

"অপরদিকে বাংলায় মুসলিমদের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবুদ্দীন আইবেকের সময়ে। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বলতে গেলে অলৌকিকভাবে বাংলায় তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুসলিমদের এ উভয় রাজনৈতিক বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এসবের অনেক আগে যে এ দেশে ইসলামের বীজ বপন করা হয়েছিল এবং সে উপ্ত বীজ অংকুরিত হয়ে পরবর্তীকালে তা যে একটি মহীরুহের আকার ধারণ করেছিল, তাও এক ধ্রুব সত্য।"[৩১৫]

"প্রথম প্রায় তিনশ বছর বাংলা খলজী, ইলবারি ও করৌনাহ তুর্কিদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। পনেরো শতকের শেষ দিকে হাবশী ক্রীতদাসেরা কয়েক বছরের জন্য বাংলার সিংহাসন দখল করেন। এরপরে পর পর ক্ষমতায় আসে সৈয়দ, আফগান ও মুগলরা। কাজেই সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাংলার মুসলিম শাসকরা ছিলেন তুর্কি, আফগান ও মুগল এ তিন জাতিভুক্ত। শেষোক্তটি ছিল মূলত তুর্কিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।"[৩১৬]

"বাংলাদেশের সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরের তীরে রয়েছে আরাকান। এক সময় এটি বড় একটি রাজ্য ছিলো। আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রাজা মা-বা তুইঙ (Ma-ba-toing) ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দ

---

৩১৩. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২-২৩

৩১৪. বাংলা পিডিয়া

৩১৫. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

৩১৬. বাংলা পিডিয়া

পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। উল্লেখ্য যে ঐ সময় বাংলাদেশের শাসক ছিলেন বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল। আর বাগদাদ কেন্দ্রিক বিশাল বানুল আব্বাস খিলাফাহর শাসক ছিলেন হারুনুর রশীদ। রাজা মা-বা-তুইঙ-এর শাসনকালে আরব মুসলিমদের কয়েকটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে আরাকান উপকূলের নিকটে বিধ্বস্থ হয়। যাত্রীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তারা রামরী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তারা আরাকানের মূল ভূ-খন্ডে পৌছে রাজার সাথে সাক্ষাত করেন। তাদের আলাপ ও আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাদের বসবাসের জন্য কয়েকটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দেন। আরব মুসলিমগণ ঐ গ্রামগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। আরাকানের ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায় যে রাজা Tsu-la-TaingTsan-da-ya ৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন। তার রাজত্বকালে একজন থু-রা-তান (Thu-ra-tan) কে পরাজিত করে তিনি Tset-ta-going (চাটিগাও) নামক স্থানে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন। গবেষকদের মতে থু-রা-তান শব্দটি আরবি শব্দ সুলতান-এর পরিবর্তিত রূপ। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, খ্রিষ্টীয় দশম শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম জনপদ গড়ে উঠে এবং মুসলিমদের নেতা এতখানি শক্তিধর হয়ে উঠে যে, আরাকান-রাজ তার বিরদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।"[৩১৭]

"সাধারণভাবে এ কথা সর্বজন বিদিত যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে সিন্ধু প্রদেশে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত সামরিক অভিযান পরিচালনার কাজ বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়। হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিন্ধু অভিযানের সূচনা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের আগে কয়েকবার সিন্ধু প্রদেশের বিরদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের আগে মুসলিমগণ এখানে কোন স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি। সিন্ধুরাজের সহায়তায় জলদস্যু কর্তৃক মুসলিম বণিকগণ বার বার লুণ্ঠিত হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার ও বন্দী বণিকদের মুক্ত করার পর মুসলিমগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পঞ্চদশ হিজরীতে হযরত ওমরের (রা.) খেলাফত আমলে উসমান ইবন আবুল আবী সাকাফী বাহরাইন ও ওমানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। উসমান আপন ভাই হাকামকে বাহরাইনে রেখে নিজে ওমান চলে যান। সেখান থেকে তিনি একটি সেনাবাহিনী ভারত সীমান্তে প্রেরণ করেন। উক্ত অভিযানের পর পুনরায় তিনি তার ভ্রাতা মুগীরাকে সেনাবাহিনীসহ দেবল (বর্তমান করাচী) অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুগীরা সিন্ধুর জলদস্যু ও তাদের সহায়ক শক্তিকে পরাজিত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত আলীর (রা.) খেলাফতের সময় ৩৯ হিজরীর প্রারম্ভে হারীস ইবন মুররা আবদী সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে জয়ী হন। বহু শত্রুসেনা বন্দী করেন এবং প্রচুর গণীমতের মাল হস্তগত করেন। আমীর মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে মুহাল্লাব ইবন আবু সুফরা সিন্ধুর সীমান্ত আক্রমণ করেন এবং মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী স্থান বান্না ও আহওয়ায পর্যন্ত অগ্রসর হন। খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হলে তিনি সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইবন হারুন নসিরী, উবায়দুল্লাহ ইবন নবহান এবং বুদায়েল ইবন তোহফা বজলীকে পর পর প্রেরণ করেন। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম জল ও স্থল উভয় পথে অভিযান পরিচালনা করে সিন্ধু জয় করেন।

৩১৭. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২-২৩

মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সিন্ধু প্রদেশ বিজিত হবার বহু আগে তদানীন্তন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও জারি করা হয়েছিল। তার প্রমাণ এ যে, রাজা দাহির যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ মুসলিমদের করতলগত হয়। সেখানে শাসন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্মুখের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করার পর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কালে তাকে সাওয়ান্দারবাসীদের সম্মুখীন হতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এ যে, আক্রান্ত জনপদের অধিবাসী ছিল মুসলিম। স্বভাবতই তাদের সাথে একটা মিটমাট করার পর অন্যান্য বহু স্থান জয় করে মুহাম্মদ বিন কাসিম পাঞ্জাবের মুলতান নামক স্থানে উপনীত হন। মুলতানও তার করতলগত হয়।

মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে এ দেশে মুসলিমদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এ সময় থেকে ক্রমাগত অব্যাহত গতিতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব ও তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলিম বাংলায় আগমন করতে থাকেন। বেশিরভাগ এসেছিলেন সৈনিক হিসাবে, অবশিষ্টাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলাম প্রচার ও আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এভাবে বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা হয়ে পড়েছিল ক্রমবর্ধমান।

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের বাংলা বিজয় ছিল এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। বলতে গেলে এ মানুষটিই এক ঐতিহাসিক বিষয়। তিনি ছিলেন তুর্কিস্থানের খাজু বংশোদ্ভুত। তাই তার বংশ পরিচয়ের জন্যে তার নামের শেষে খালজী বা খিলজী শব্দ যুক্ত করা হয়। তার পূর্ব পুরষদের আবাসভূমি ছিল সীস্তানের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত গারামসীর অথবা দাশতে মার্গো। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খালজী জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করে গজনী অতঃপর ভারতের বাদাউনে আগমন করেন। তার দেহ ছিল খর্ব ও হস্তদ্বয় অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। সম্ভবত এ কারণেই গজনী ও দিল্লীর সামরিক বাহিনীতে তার চাকুরীর আবেদন গৃহীত হয়নি। কিন্তু তার মধ্যে যে অসীম সাহসিকতা ও দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনার যোগ্যতা ছিল তা বুঝতে পেরে বাদাউনের সিপাহসালার তাকে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। এখান থেকেই তার ভাগ্যোন্নয়ন শুরু হয়। তিরৌরী বা তরাইনের যুদ্ধের পর বখতিয়ারের চাচা, মুহাম্মদ-ই-মাহমুদ নাগাওরীর শাসনকর্তা আলী নাগাওরীর নিকট থেকে কষমন্ডী বা কষ্টমন্ডীর অধিকার লাভ করেন। তার মৃত্যুর পর বখতিয়ার তার অধিকার লাভ করেন। কিছুকাল পর তিনি অযোধ্যার মালিক মুয়াজ্জম হিসামউদ্দীনের নিকট গমন করেন। এ সময়ে তিনি অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন বলে মালিক হিসামউদ্দীন তাকে দুটি গ্রাম উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন। গ্রাম দুটি কারো মতে ভগবৎ ও ডোইলি, কারো মতে সহল ও সহিলী অথবা কম্পিলা ও পতিয়ালি ছিল। গোলাম হোসে সলিমীর 'রিয়াযুস সালাতীনে' এ গ্রাম দুটির নাম বলা হয়েছে কম্বালা ও বেতালি।

এখান থেকে মুহাম্মদ বখতিয়ার বিহারের দিকে অগ্রসর হয়ে কয়েক স্থানের ভূস্বামী বা প্রধানদেরকে পরাজিত করে প্রচুর মালে গণীমত হস্তগত করেন। তার দ্বারা তিনি বহু অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে থাকেন। তার বীরত্বের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘোর, গজনী, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে বার বার বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত সংঘটিত হতে থাকায় তথাকার বহুসংখ্যক অধিবাসী দেশত্যাগ করে ভারতে আগমন করে ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরাফেরা করতে থাকে। বখতিয়ারের সুনাম সুখ্যাতি শ্রবণ করে তারা দলে দলে তার সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। এভাবে বখতিয়ার হয়ে ওঠেন প্রবল শক্তিশালী। তৎকালীন দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক বখতিয়ারের অসীম বীরত্বের কথা জানতে পেরে তার সম্মানের জন্য 'খিলাত' প্রেরণ করেন এবং এতে করে বখতিয়ারের শক্তি ও সাহস বহুগুণে বেড়ে যায়। তারপর তিনি সমগ্র বিহার প্রদেশে তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। অতঃপর তার অভিযান বাংলার দিকে পরিচালিত হয় এবং ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার রাঢ় ও বরিন্দ অঞ্চল

অধিকার করেন। বাংলা আক্রমণকালে এর শাসক ছিলেন রায় লক্ষ্মণ সেন। রাজধানী ছিল নদিয়া। রাজধানীসহ এ অঞ্চলটিকে লক্ষ্মণাবতী বলা হত। 'তাবাকাতে নাসিরী'তে এ সম্পর্কে এক মজার কাহিনী বিবৃত হয়েছে:

রাজ দরবারের গণক ব্রাহ্মণের দল এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, এদেশ অচিরেই তুর্কী মুসলিমদের হস্তগত হবে। দেশ আক্রান্ত হলে রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় দেশবাসীকে প্রচুর রক্তপাত ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে। রাজা ব্রাহ্মণ-পন্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এহেন মুসলিম অভিযানকারীর কোন চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে কিনা, যা দেখে তাকে যথাসময়ে চিনতে পারা যায়। তারা বলেন যে, সে তুর্কী সো গোজা দন্ডায়মান হলে তার হস্তদ্বয় হাটু পর্যন্ত লম্বিত হবে। রাজা রায় লক্ষ্মণ সেন এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার জন্য একদল বিশ্বস্থ লোক নিযুক্ত করেন। তারা অনুসন্ধানের পর রাজাকে বলেন যে, মুহাম্মদ বখতিয়ারের মধ্যে উপরোক্ত চিহ্ন বিদ্যমান। এদিকে মুহাম্মদ বখতিয়ারের দুঃসাহসিক অভিযান ও তার জয়জয়কার কারো অজ্ঞাত ছিল না। ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ, সম্মানী ও জ্ঞানী-গুণী, ভূস্বামী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেশ-পরিত্যাগ করে জগন্নাথ, কামরূপ এবং অন্যান্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা তখনো তার রাজধানী পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করেননি। হঠাৎ এক সময় মুহাম্মদ বখতিয়ার নদিয়া আক্রমণ করে রাজধানীতে প্রবেশ করলে রাজা রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্বার দিয়ে পলায়ন করে বিক্রমপুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে সমগ্র লক্ষ্মণাবতী বখতিয়ারের করতলগত হয়, বিস্ময়ের ব্যাপার এ যে, মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহীসহ মুহাম্মদ বখতিয়ার নদিয়া আক্রমণ ও জয় করেন। অতঃপর তার অভিযান বিস্তার লাভ করে এবং নবদ্বীপ ও গৌড় তার করতলগত হয়। 'তারিখে ফেরেশতায়' বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ বখতিয়ার বাংলাদেশে রংপুর নামে এক নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বাংলার শুধু পূর্বাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ তার শাসনাধীন হয়েছিল। রায় লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করলেও তার পশ্চাদানুসরণ বখতিয়ার করেননি। যার ফলে বাংলার পূর্বাঞ্চল ছিল তার শাসনের বাইরে। এক শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ তোগলোক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাও ও সোনারগাও-এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন। যাহোক, মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের ফলে বহিরাগত মুসলিম দলে দলে এ দেশে বসতি স্থাপন করেন। ব্যবসা বাণিজ্য, সেনাবাহিনীতে চাকুরী ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে জীবিকার্জনের নিমিত্ত অসংখ্য মুসলিম এ দেশে আগমন করেন এবং এ আগমনের গতিধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।"[৩১৮]

"বাংলাদেশে পাল বংশের শাসন এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময়টিতে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেনগণ বৌদ্ধ পালদেরকে পরাজিত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে (১১২৫ খ্রিষ্টাব্দে) বিজয় সেন নদীয়াকেন্দ্রিক রাজ্যের অধিপতি হন। বিজয় সেনের পুত্র ছিলেন বল্লাল সেন। আর বল্লাল সেনের পুত্র ছিলেন লক্ষণ সেন। উত্তরে গৌড় এবং আগে বিক্রমপুর পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিলো। সেনগণ গোড়া হিন্দু ছিলেন। তারা পালদেরকে উৎখাত করেন। প্রজাগণের ওপর হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালান। কৌলিণ্য প্রথা প্রবর্তন করে তারা সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করেন। সেন রাজাদের রাজত্বকালেও বাংলাদেশে মুসলিমদের যাতায়াত ছিল। ইতিহাসবিদ মিনহাজুদ্দীন সিরাজ রচিত 'তাকাকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বিক্রয়ের জন্য উন্নত জাতের ঘোড়া নিয়ে মুসলিম বণিকগণ স্থল পথে নদীয়া (বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত) এবং অন্যান্য স্থানে আসতেন।"[৩১৯]

---

৩১৮. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.২০-২৩

৩১৯. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে মুসলিম রাজ্যের পতন পর্যন্ত পাচশত চুয়ান্ন বৎসরে একশত একজন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসন পরিচালনা করেন। বাংলার মুসলিম শাসনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়:

	সম্রাজ্য	শাসনকাল
বাংলা	খিলজীদের অধীনে	১২০৩-১২২৭ খ্রি.
	দিল্লীর অধীনে	১২২৭-১৩৪১ খ্রি.
	ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (প্রথম ধারা)	১৩৪২-১৪১৩ খ্রি.
	গনেশ জালাল উদ্দীনের অধীনে	১৪১৪-১৪৪১ খ্রি.
	ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (দ্বিতীয় ধারা)	১৪৪২-১৪৮৭ খ্রি.
	হাবশী শাসনাধীন	১৪৮৭-১৪১৩ খ্রি.
	হুসেন শাহী বংশের অধীনে	১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.
	পাঠানদের অধীনে (শের শাহ্ ও সূর বংশ)	১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রি.
	কররাণী বংশের অধীনে	১৫৬৫-১৫৭৬ খ্রি.
	মোগল শাসনাধীন	১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.

সাড়ে পাচশত বৎসরাধিক কাল যারা বাংলার মসনদে সমাসীন ছিলেন, তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমন ছিলেন যারা আপন বাহুবলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছুসংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্টাংশ দিল্লীর দরবার থেকে নিয়োগপত্র লাভ করে গভর্ণর অথবা নাজিম হিসাবে বাংলা শাসন করেন।

মুসলিমগণ বিজয়ীর বেশে এ দেশে আগমন করার পর এ দেশকে তারা মনেপ্রাণে ভালোবাসে, এ দেশকে স্থায়ী আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এ দেশের অমুসলিম অধিবাসীর সাথে মিলে মিশে বাস করতে চেয়েছেন। শাসক হিসাবে শাসিতের উপরে কোন অন্যায়-অবিচার তারা করেননি। জনসাধারণও তাদের শাসন মেনে নিয়েছিল। মুহাম্মদ বখতিয়ার বাংলা বিজয়ের পর অভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মুসলিমদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করলেও অমুসলিমদের প্রতি উদার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ইচ্ছা করলে পলাতক লক্ষ্মণসেনের পশ্চাদানুসরণ করে তাকে পরাজিত করতে পারতেন। কিন্তু সে কথা তিনি মনে আদৌ স্থান দেননি। যদুনাথ সরকার তার 'বাংলার ইতিহাসে' বলেন:

... কিন্তু তিনি রক্তপিপাসু ছিলেন না। নরহত্যা ও প্রজাপীড়ন তিনি পছন্দ করতেন না। দেশে এক ধরনের জায়গীর প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক সরকার কায়েমের দ্বারা আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও সামরিক প্রধানদের সন্তুষ্টি সাধন করতেন।"...।

সময়কাল	বাংলার শাসনকর্তাগণ	দিল্লীর সমসাময়িক সম্রাট
১২০৩-৬ খ্রি.	মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী	কুতুব উদ্দীন আইবেক
১২০৬-৮ খ্রি.	মালিক ইজ্জদ্দীন মুহাম্মদ শিরীন খিলজী	কুতুব উদ্দীন আইবেক
১২০৮-১০ খ্রি.	হুসামউদ্দীন ইওয়ায	কুতুব উদ্দীন আইবেক
১২১০-১৩ খ্রি.	আলী মর্দান (সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী)	কুতুব উদ্দীন আইবেক
১২১৩-২৭ খ্রি.	সুলতান গিয়াস উদ্দীন-ইওয়ায খিলজী	আরাম শাহ (কুতুবুদ্দীন আইবেকের পুত্র)

৩২০

৩২০. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ

"বখতিয়ার খিলজী-এর রাজ্য ছিল মুসলিম অধিকারের কেন্দ্রস্থল। গোটা বাংলাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে মুসলিমদের দুশো বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এর অধীনে বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের সূচনা হয়। এ সময় থেকে দুশ বছর ধরে বাংলা ছিল স্বাধীন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই এটা ছিল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কাল। এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলো এ যে, এ সময়ই এ দেশ প্রথম বাংলাহ নাম পরিগ্রহ করে। এর আগে বাংলার কোন ভৌগোলিক অখন্ডতা ছিল না এবং সমগ্র দেশের জন্য কোন একক নামেরও উদ্ভব হয়নি। গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ, প্রধানত এ তিন এলাকার নামে বাংলা পরিচিত ছিল। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এ তিন অঞ্চল জয় করে তার অধীনে সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার পরই বাংলাহ নামের উদ্ভব হয়। তিনি 'শাহ-ই-বাংলাহ' এবং 'সুলতান-ই-বাংলাহ' উপাধি লাভ করেন। তখন থেকে বাংলার মুসলিম রাজ্য বাংলাহ রাজ্যরূপে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিকরা এ রাজ্যকে লখনৌতির পরিবর্তে বাংলাহ রাজ্য রূপে অভিহিত করতে থাকেন। বিদেশিরাও এ নাম ব্যবহার করে যা থেকে পরবর্তী সময়ে মুগল সুবাহ বাংলাহ ও ব্রিটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের নামকরণ হয়।

স্বাধীন সুলতানি আমলে উত্তরে কামরূপ, পূর্বে ত্রিপুরা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত দেশের সর্বত্র মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯) চট্টগ্রাম জয় করেন, জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩৩) ফরিদপুর জয় করে এর নতুন নামকরণ করেন ফতেহাবাদ। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ এর রাজত্বকালে (১৪৩৫-১৪৬০) খান জাহান খুলনা-যশোর এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আনেন এবং রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) বাকেরগঞ্জ জয় করেন। এ সময় বাংলায় পুরোপুরি মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বখতিয়ার খলজী প্রতিষ্ঠিত লখনৌতির মুসলিম রাজ্য বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়। মুগলরা এ রাজ্যের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রেখেছিল। আওরঙ্গজেব এর মৃত্যুও পর মুগল শক্তির পতন যুগে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাও নওয়াবদের দ্বারা মোটামুটি স্বাধীনভাবে শাসিত হয়। এ অবস্থা ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।"[৩২১]

"সমগ্র বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। অবশ্য তার বিরদ্ধে দিল্লী সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলোক যুদ্ধযাত্রা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের প্রীতি অর্জনের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশটি হাতী উপঢৌকন স্বরূপ দিল্লী প্রেরণ করেন। এ সময় থকে ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যারা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা হলেন :

শাসনকর্তাগণ	সময়কাল
সিকান্দার শাহ (১ম)	১৩৫৮- ৯১ খ্রি.
গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ	১৩৯১-৯৬ খ্রি.
সাইফুদ্দীন হামজা শাহ	১৩৯৬-১৪০৬ খ্রি.
শামসুদ্দীন	১৪০৬-১৪০৯ খ্রি.

৩২১. বাংলা পিডিয়

রাজা গণেশ

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় হিন্দুজাতির পুনরুত্থান আন্দোলন শুরু হয়। মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের পর হতে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি। মুসলিম শাসকগণ কখনো দিল্লী সুলতানের নিযুক্ত গভর্ণর হিসাবে, কখনো স্বাধীন সুলতান হিসাবে এবং কখনো উপঢৌকনাদির মাধ্যমে দিল্লী দরবারকে প্রীত ও সন্তুষ্ট রেখে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ দুই শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় মুসলিমগণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। তাদের মধ্যে আত্মকলহ ও বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের প্রবল আকাঙক্ষাই ছিল সে শান্তি বিনষ্টের কারণ। কিন্তু তাই বলে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক হিন্দুজাতি দলন ও প্রজাপীড়ন হয়নি কখনো। ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাগণ সুখ-শান্তি ও জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল। বখতিয়ার খিলজীর আগে এদেশে বহু স্বাধীন হিন্দু রাজা বাস করতেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা তারা মনে প্রাণে মেনে না নিলেও মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষে আসা সমীচীন মনে করেননি। তার দুটি মাত্র কারণ হতে পারে। প্রথম কারণ এ যে, বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলিমদের হাতে এবং বখতিয়ারের পর থেকে ক্রমাগত বহির্দেশ থেকে অসংখ্য মুসলিম বাংলায় আসতে থাকে। মুসলিম ধর্ম প্রচারক অলী ও দরবেশগণ এদেশে আগমন করত ইসলামের সুমহান বাণী, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করতে থাকেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত হিন্দু জনসাধারণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তথাপি এখানকার বর্ণহিন্দুরা মুসলিম শাসকদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও আত্মকলহের সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারত। কিন্তু তা করেনি। তার কারণও আছে।

দ্বিতীয় কারণ এ যে, তারা এক দীর্ঘ পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছিল। তা হলো মুসলিম শাসকদের বিরাগভাজন না হয়ে বরঞ্চ শাসন কার্যের বিভিন্ন স্তরে এরা নিজেদের স্থান করে নিয়ে কোন এক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা তাদের এ পরিকল্পনায় পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিল। তবে সে সময় নিজেরা ক্ষমতা লাভ না করে মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে তাদের সাফল্য স্থায়ী না হলেও এ ছিল তাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার প্রথম প্রকাশ।।

এ সময়ে বাংলার একজন হিন্দু জমিদার প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেন। ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাসে তার নাম 'কানস' বলা হয়েছে। কানুস প্রকৃতপক্ষে 'কংস' অথবা 'গণেশ' ছিল। তিনি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের অধিকর্তা হয়েছিলেন। রিয়াযুস সালাতীনের বর্ণনা অনুসারে গণেশ শামসুদ্দীন ইলিয়াসের পৌত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দিনের পৌত্র শামসুদ্দীনকেও তিনি হত্যা করে গৌড় ও বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ

শাসনকর্তাগণ	সময়কাল
শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ	১৩৩৯-১৩৫৮ খ্রি.
সিকান্দার শাহ	১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রি.
গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ	১৩৮৯-১৩৯৬ খ্রি.
সাইফউদ্দীন হামজা শাহ	১৩৯৬-১৪০৬ খ্রি.
শামসুদ্দীন	১৪০৬-১৪০৯ খ্রি.
শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ	১৪০৯-১৪১৪ খ্রি.

ব্লকম্যান (Blockman) বলেন যে, গণেশ নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেননি। তবে তিনি শামসুদ্দীনকে হত্যা করে তার ভ্রাতা শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহকে ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ রেখে স্বয়ং রাজদন্ড পরিচালনা করতেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয়খন্ডে ১৪০৯-১৪১৪ খ্রি. পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে দুজন শাসনকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন। যথা শাহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহ ও গণেশ।"[৩২২]

গণেশের বংশ

গণেশ দনুজমর্দন	
যদুসেন ওরফে জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ	১৪১৪-১৪৩১ খ্রি.
শাসসুদ্দীন আহমদ শাহ	১৪৩১-১৪৪২ খ্রি.

"মদিনার ইসলামি খিলাফতের অবলুপ্তির প্রায় সাড়ে পাচশত বছর পর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন শুরু হয়। সে সময় মদিনায় সরকার ব্যবস্থায় খিলাফত পদ্ধতি না থাকলেও রাষ্ট্রের সকল কাজে কুর'আন ও সুন্নাহ্কে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হত। বাংলাদেশেও মুসলিম শাসনামলে খিলাফতে রাশিদীনের অনুসৃত মৌলিক শাসনতান্ত্রিক ধারাকে কার্যকর করা হয়েছিল। তা হচ্ছে, কুর'আন ও সুন্নাহ্র বিধানই আইনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। দেশের একজন সাধারণ লোক থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবার ওপর আইনের অবাধ রাজত্ব চলবে। ইনসাফের ব্যাপারে কারোর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না।

সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সাথে ইসলামের ইবাদত সমূহ সঠিক ভাবে পালন করার জন্য রাষ্ট্রের শাসকদের সাথে ধর্ম প্রচারকগণও একসাথে কাজ করতেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সালাত প্রতিষ্ঠা, পুরুষদের জন্য মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করা, রমযান মাসে সাওম পালন করা ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি ছিল। ইসলাম প্রচারকগণ শুধু ইসলাম প্রচার করেই চুপ করে বসে থাকতেন না বরং রাজ্য বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতেন। জমিদারদের এলাকায় জনগণকে যুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করতে মুসলিম শাসনকর্তা ও সেনাবাহিনীর সাথে একযোগে কাজ করতেন। তাদের অংশগ্রহণের ফলে মুসলিম বাহিনীতে অপরাজেয় জাগতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি হতো। ইসলাম প্রচারক উলামারা মুসলিম শাসকগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দিতেন। সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলিম শায়খ আলাউল হক ইলিয়াস শাহী শাসকদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্কে সতর্ক করে চিঠি লেখেছিলেন মাওলানা মুজাফফর শাহ বলখী। তাদের সে সতর্কবাণী রাজনৈতিক দূরদর্শিতামূলক ছিল। সে সতর্কবাণী অনুযায়ী যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হতো না। রাজা গণেশের মুকাবিলায় নূর কুতুব-উল-আলম ও অন্যান্য ইসলাম প্রচারকই ঐক্যবদ্ধ সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুসলিম রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেছিলেন।"[৩২৩]

৩২২. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫-২৭

৩২৩. বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯

ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান

"গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের দুজন সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। গণেশ পৌত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহকে হত্যা করে পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশ বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৩২৪]

শাসনকর্তাগণ	সময়কাল
নাসীর উদ্দীন মাহমুদ শাহ	১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি.
রুকন উদ্দীন বারবাক শাহ	১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.
শামসুদ্দীন ইউসূফ শাহ	১৪৭৪-১৪৮২ খ্রি.
দ্বিতীয় সিকান্দর শাহ	১৪৮২ খ্রি.
জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ	১৪৮২-১৪৮৬ খ্রি.

বাংলার মসনদে হাবশী সুলতান

"বাংলায় মুসলিম সমাজ বিকাশ দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। বিদেশি মুসলিমদের অভিবাসন ও স্থানীয় জনগণের মুসলিম সমাজে একীভূত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের গঠন বিভিন্ন শতকে ভিন্নতর ছিল। প্রাথমিক অভিবাসীরা ছিল তুর্কি এবং তারা ছিল খলজী, ইলবারি ও কারৌনা গোত্রীয়। তাদের সমর্থকরাও এসেছিল দূর-দূরান্ত থেকে। সরকারি চাকরি ও অন্যান্য বৃত্তিসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আরব ও পারস্যবাসীরাও এসেছিল। বাংলার সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ তার প্রাসাদ ও রাজপরিবারের প্রহরার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক হাবশী ক্রীতদাস এনেছিলেন এবং এতে মুসলিম সমাজে এক নতুন উপাদানের সংযোজন ঘটে। মুগলরা দিল্লি অধিকার করলে আফগানরা উত্তর ভারতের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তারা বাংলাসহ প্রত্যন্ত প্রদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। আফগানরা বাংলায় শাসনও করেছিলেন এবং তাদের আধিপত্য কয়েক দশক ধরে বজায় ছিল। এরপরে আসে মুগলরা এবং বাংলায় নতুন করে মুসলিম অভিবাসনের সূত্রপাত হয়।"[৩২৫]

কিছুকাল যাবত আবিসিনিয়াবাসীগণ বাংলায় আগমন করতে থাকে। বারবাক শাহ ও ইউসূফ শাহ তাদেরকে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ফতেহ শাহ তাদেরকে দমন করার চেষ্টা করলে তিনি নিহত হন এবং জনৈক হাবশী সুলতান শাহজাদা বারবাক নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শাসনকর্তাগণ	সময়কাল
সুলতান শাহজাদা বারবাক	১৪৮৬-১৪৮৭ খ্রি.
সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ	১৪৮৭-১৪৯০ খ্রি.
নাসীরুদ্দীন মাহমুদ শাহ	১৪৯০-১৪৯১ খ্রি.
শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ	১৪৯১-১৪৯৩ খ্রি.
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

উপরে বর্ণিত চতুর্থ হাবশী সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ, হোসেন নামে এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে তার সরকারের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। ক্রমশ তার পদোন্নতি হতে থাকে এবং অবশেষে মুজাফফর শাহের প্রধানমন্ত্রীর পদে তিনি বরিত হন। পরবর্তীকালে নানান ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হোসেন আপন প্রভুকে নিহত

৩২৪. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৩২৫. বাংলা পিডিয়া

করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি বাংলার ইতিহাসে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শরিফ মক্কী নামে পরিচিত। পরে তিনি 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধিও ধারণ করেন।[৩২৬]

হোসেন শাহী বংশ

শাসনকর্তাগণ	সময়কাল
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.
নাসীরউদ্দীন নসরৎশাহ	১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.
গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ	১৫৩২-১৫৩৮ খ্রি.
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ	১৫৩২ খ্রি.

বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম হোসেন শাহী আমলেই মুসলিমদের আচার-আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাসে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব সমাজের বিরাট প্রভাব যে মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস কলুষিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হোসেন শাহ কর্তৃক লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রান্ত মুসলিম আমীর-ওমরা, ধার্মিক ও পীর-অলী নিহত হওয়ায় এবং হোসেন শাহের স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কারণে মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ সহজতর হয়েছিল।[৩২৭]

যুবরাজ মুহাম্মদ সুজার পর ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত যারা বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা হলেন :

শাসনকর্তাগণ	সময়কাল
যুবরাজ মুহাম্মদ সুজা	১৬৩৯-৬০ খ্রি.
মুয়াজ্জাম খান মীর জুমলা	১৬৬০-৬৩ খ্রি.
দিলির খান-দাউদ খান	১৬৬৩-৬৪ খ্রি.
শায়েস্তা খান (মুমতাজ মহলের ভ্রাতা)	১৬৬৪-৭৮ খ্রি.
ফিদা খান আজম খান কোকা-	১৬৭৮ খ্রি.
যুবরাজ মুহাম্মদ আজম	১৬৭৮-৭৯ খ্রি.
শায়েস্তা খান	১৬৭৯-৮৮ খ্রি.
খানেজাহান	১৬৮৮-৮১ খ্রি.
ইব্রাহিম খান	১৬৮৯-৯৮ খ্রি.
যুবরাজ আজীমউদ্দীন	১৬৯৮-১৭১৭ খ্রি.
মুর্শিদ কুলী খান	১৭১৭-২৭ খ্রি.
সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান	১৭২৭-৩৯ খ্রি.
সরফরাজ খান	১৭৩৯-৪০ খ্রি.
আলীবর্দী খান	১৭৪০-৫৬ খ্রি.
সিরাজউদ্দৌলা	১৭৫৬-৫৭ খ্রি.

এভাবেই সুদূর মক্কা নগরীতে হতে এ অঞ্চলে দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ করে। বর্ণিত মনীষীগণ দীর্ঘ সময় বাংলার রাজত্বে আসীন ছিল। তাদের আগমন এখানকার সাধারণ জনগণ বেশ ইতিবাচকভাবেই নিয়েছিল। ফলে ইসলাম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বাংলার বেশিরভাগ মানুষ।

৩২৬. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

৩২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর পরিচিতি

রাসূল (স.) এর পরবর্তী সময়ে যেসকল মনীষী দ্বীন ইসলামকে সমুন্নত রাখতে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (র.)। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সমাজ সংস্কারক, হানাফি মাযহাবের অনুসারী ফকিহ ও সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তরিকায়ে মুহাম্মদিয়ার অন্যতম প্রচারক। তিনি ওয়াজ নসীহত করে মানুষকে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতি আহ্বান করতেন। তিনি মূলত বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন। এ অধ্যায়ে আমরা এই মহান মনীষীর জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) সাহেবের শুভ জন্ম

"আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম। শেষ নবি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (স.) যার পরে কোন নবি বা রাসূল এ পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করতে আগমন করবেন না। কিন্তু নবি রাসূলদের অবর্তমানে একটি কালো যুগ-সন্ধিক্ষণে মানুষ যখন ধর্মীয় অনুশাসন ভুলে গিয়ে পাপাচার ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য অর্থাৎ হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর অলিগণ পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন। ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অলি, দরবেশ ও উলামায়ে কেরামের অবদান আমাদের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। এমনি একজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) যার শিক্ষা, সাধনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অবদান আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গতিধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল।"[৩২৮]

"কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা সাহেব ১২১৫ হিজরির মহররম মাসের ১৮ তারিখে জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা নামক মহল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা সাহেবের জন্মের সময় ঐ শহরে ইসলামের আদেশ পালনকারী এবং শরিয়তের নির্দেশানুযায়ী আমলকারী ছিল না বললেই চলে। বিদ্বান লোক ছিলেন সত্য। কিন্তু আদেশ পালনকারী ছিলেন না। খানকাগুলো (ইবাদতখানা) নামে মাত্র ছিল। মসজিদ সমূহ ছিল সত্য কিন্তু সেগুলোতে না ছিল মুয়াজ্জেন, না ছিল ইমাম, না ছিল সালাতী আর জামা'আত তো মোটেই হত না। ভোরে ও সন্ধ্যায় আযান দিয়ে লোকদেরকে সন্ধ্যা ও প্রভাত আগমনের সংবাদ ব্যতীত শহর বাসীদের মসজিদগুলোর সাথে অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না। ঠিক এরূপ এক অন্ধকার যুগে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। সত্য বলতে কি, এ হেদায়েতের রবি উদয় হয়েছিল কেবল অন্ধকার জগতকে আলোকিত করার জন্য। আল্লাহর কি অপার মহিমা মাওলানা সাহেবের স্বর্গীয় পিতা আবু ইবরাহিম শেখ ইমাম বখস (রা.) পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তার বিষয়ে কোন জ্ঞানী লোক বলেছিলেন যে, এ একটি সন্তান দ্বারাই বস্তি-সমূহ আবাদ হবে। বাস্তবিকই হযরত মাওলানা সাহেবের শুভ-আগমনের দ্বারা উপরোক্ত দোয়া ও সুসংবাদ প্রতিফলিত হয়েছিল।"[৩২৯]

---

৩২৮. এম ইউ এ কাদের, হাদীয়ে বাঙ্গাল মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.), (ঢাকা : পাইওনিয়ার পাবলিকেশনস,২০০৬ খ্রি.), পৃ.১

৩২৯. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী, অনুবাদ : মৌলবি আছমত আলী, (ঢাকা : দি সিটি প্রেস), পৃ.৭

"ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর রক্তধারায় স্নাত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা মহল্লায় ১২১৫ হিজরীর ১৮ মহরম জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন বই-পুস্তকে তার ইংরেজি জন্ম তারিখ ১১ ই জুন, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ আছে। তার পূর্বপুরুষগণ সৌদি আরব থেকে বাগদাদে চলে আসে। তার বাবার নাম ছিল মৌলবি আবু ইব্রাহীম শেখ মোহাম্মদ ইমাম বখ্শ এবং মায়ের নাম ছিল মোসাম্মৎ বাস্তি বিবি বিনতে শায়খ লুৎফে আলী। পিতা ও মাতা দুজনেই ছিলেন উচ্চ বংশীয়। বংশের দিক থেকে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বংশধর।"[৩৩০]

ভারতে মুসলিম শাসনামলে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর পরিবার ছিল বিখ্যাত। মুসলিম আমলে এ পরিবারের লোকেরা খতীবী করতেন। সকলেই ইমামত এবং খেতাবতের দায়িত্ব বেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। আবু ইবরাহীম শেখ মুহাম্মদ নিজে ছিলেন একজন শায়েখ। তিনি ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান। ছিলেন সুবিজ্ঞ, ফারসি ভাষার একজন কবি, দক্ষ লিপিকার এবং জৌনপুর কালেক্টরেট এর সেরেস্তাদার। এমনি এক উচ্চবংশে জন্ম হযরত কারামত আলী (র.) এর। তার বাবা মা উভয়ে ১২০০ হিজরীর প্রথম দিকে সুদূর বাগদাদ থেকে জৌনপুর শহরে মোল্লাটোলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা মহল্লাটি প্রাচীনকাল থেকেই আলেম ওলামাদের বাসস্থান হিসাবে সুপরিচিত। উল্লেখ্য মওলানা কারামত আলীর দাদা শায়খ জারুল্লাহ ও দাদী মোসাম্মাৎ জামিলা বিবির একমাত্র ছেলে শেখ ঈমাম বখ্শ একজন কামেল বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। জীবন ধারণের জন্য তিনি জৌনপুর কালেক্টরেট এ শারেস্তাদারের চাকুরী নেন। মাওলানা কারামত আলীর ছোট ভাই শাহ রযব আলী (র.) একজন বড় ফকিহ্ ছিলেন। তারা উভয়ই হযরত সাইয়্যেদ আহমেদ বেরেলভী (র.) এর খলিফা ছিলেন। হযরত শাহ্ কারামত আলী (র.) বংশানুক্রমে সাইত্রিশ পুরুষে গিয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর সাথে মিলিত হয়েছেন।

নসবনামা (বংশ পরিচিতি)

"আমিরুল মুমেনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), তারই ছেলে হযরত মোহাম্মদ (রা.), তারই ছেলে হযরত খাজা আহাম্মদ (রা.), তারই ছেলে হযরত খাজা ইব্রাহীম (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা আবু মোহাম্মদ (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা আওহাদ (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা ওমর (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা আবু আলী (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা আবু সাহাম (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা নাসির উদ্দিন (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা সায়ফউদ্দিন (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা মাসআব (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা মোজাফ্ফর (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা সুফি (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা আবদুল্লাহ (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা বায়েজীদ (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা শামসুদ্দিন (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা সায়ফুল্লাহ (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা নাজীব (র.), তারই ছেলে হযরত খাজা শায়খ নাসিরুদ্দিন (র.), তারই ছেলে হযরত কাজী নেজামুদ্দিন (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ আশরাফ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ বোরহানুদ্দিন (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ সায়াদাল্লাহ হাফেজ (র.), তারই ছেলে হযরত মাখদুম শাহলাজ হাফেজ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ মোহাম্মদ হাফেজ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ হামিদ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ আবুল ফাতাহ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ আবদাল্লাহ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ আবু মোহাম্মদ

৩৩০. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.১

(র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ মোহাম্মদ অলি (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ মোহাম্মদ ফাজেল (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ নাজিবুদ্দিন (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ গুল মোহাম্মদ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ জারুল্লাহ (র.), তারই ছেলে হযরত শায়খ আবু ইব্রাহীম মোহাম্মদ ইমাম বখ্স (র.), তারই ছেলে হযরত মাওলানা শাহ সুফি কারামত আলী জৌনপুরী (র.)"[৩৩১]

শাজরানামা (খেলাফত নামা)

"সাইয়্যেদুল মুরসালিন নবিয়ে দো-জাহা হযরত আহাম্মদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (স.), আমিরুল মুমেনিন খোলাফায়ে রাশেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত সালমান ফারসি (রা.), হযরত কাসেম ইবন মোহাম্মদ (র.), হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.), হযরত বায়েজিদ বোস্তামিন (র.), হযরত খাজা আবিল হাসান খারকানি (র.), হযরত খাজা আবু আলি ফারমেদি (র.), হযরত খাজা ইউসুফ হামদানি (র.), হযরত খাজা আবদুল খালেক আজদাওয়ানি (র.), হযরত খাজা আরেফ রেগওয়ারি (র.), হযরত খাজা মাহমুদুল খায়ের ফাগনুবি (র.), হযরত খাজা আলি রামিতিনি (র.), হযরত খাজা বাবা সাম্মাছি (র.), হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি (র.), হযরত মাওলানা ইয়াকুব চারখি (র.), হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (র.), হযরত খাজা মোহাম্মদ আমকানকি (র.), হযরত খাজা মোহাম্মদ বাকি বিল্লাহ (র.), হযরত শায়খ আহম্মদ সেরহিন্দি মোজাদ্দেদে আলফেসানি (র.), হযরত সাইয়্যেদ আদম বনুরি (র.), হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদি (র.), হযরত শাহ আবদুর রহিম মোহাদ্দেসে দেহলভি (র.), হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভি (র.), হযরত শাহ আবদুল আজীজ মোহাদ্দেসে দেহলভি (র.), হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভি (র.), হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরি (র.)।"[৩৩২]

শৈশবকাল

"হযরত মাওলানা সাহেব বাল্যকাল হতেই খেলাধুলার প্রতি স্বভাব সুলভ অনাসক্ত ছিলেন। তার এ অবস্থা দেখে অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলতেন যে, এ বালক এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেছে যে যুগে ফরয ও ওয়াজিব নিয়মানুবর্তীতা কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। লোকের ধর্ম বিশ্বাস বিপথগামী হয়ে গিয়েছে। বিদ্বান লোকগণ কু-রীতিনীতি জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কাজেই এ ছেলের স্বভাব এবং খেলাধুলার প্রতি বিতৃষ্ণা নতুন কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করছে। জনাব মাওলানা সাহেব যখন খুব ছোট ছিলেন এবং যখন কথাবার্তা বলতে ও বুঝতে সক্ষম হলেন, তখন তিনি বড়দের ও বৃদ্ধদের নিকট বসে তাদের কথাবার্তা শ্রবণ করতেন। এতে কোন কোন কৌতুকপ্রিয় লোক বলতেন যে, এ বালকের মধ্যে বৃদ্ধের প্রাণ বিদ্যমান, কেননা সে ছেলে হলেও বৃদ্ধদের সাথে উঠাবসা করে। তিনি শৈশব হতেই খুব চতুর, সাবধান, বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলতেন, আমার প্রসবের স্থান এবং যে স্থানে আলো রাখা হত সেটি আজও স্বপ্নের মত স্মরণ হয়। এভাবে তিনি তার শৈশবের বহু ঘটনাবলি এবং দুগ্ধ পান কালীন অনেক ঘটনা এভাবে বর্ণনা করতেন যার সত্যতার প্রমাণ পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। অথচ এরূপ ঘটনা অপর কোনও বালকের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির পর সম্ভব ছিল না। তিনি শৈশব হতেই মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলে অল্প বয়সে যাবতীয় বিদ্যা ও বিষয়সমূহ পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে সহজ বোধগম্য উর্দু ভাষায় ফিকাহের সুপ্রসিদ্ধ 'মিফতাহুল জান্নাত' নামক কিতাবখানা

৩৩১. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.২-৩

৩৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.৬

প্রণয়ন করেন, যা আজ প্রত্যেক আল্লাহভক্ত মুসলিমের ঘরে ঘরে বিদ্যমান। এ কিতাবখানার সমাদর লাভের বিষয় এটাই যথেষ্ট হবে যে, কোন এক বুজুর্গ লোক বলেছেন যে, এ কিতাবখানা ১৮-টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ছাপাখানার মালিকগণ শত শত বার এটিকে ছেপেছেন। হযরত মাওলানা সাহেবের খাটি নিয়তের দরুন এটি এত সমাদর লাভ করেছে যে, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সর্বসাধারণ এটিকে পড়ে ও পড়ায় এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তা মনোনীত করে থাকে।"[৩৩৩]

প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বভাব

"হযরত মাওলানা সাহেব যখন জ্ঞানের বয়সে পৌছালেন, তখন তার পিতা মৌলবি আবু ইবরাহীম সাহেব তার বংশের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সর্বপ্রথম কুর'আনের আমপারা যথা নিয়মে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত স্মৃতিশক্তির বলে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই আমপারা কণ্ঠস্থ করে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নামাজের রোকন, সিফাত, দোয়া, সানা, দরুদ ইত্যাদিও মুখস্থ করে ফেলেন। মাওলানা সাহেবের পিতা পরিবর্তনশীল সময়ে, যখন লোকে সৎকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং দৌরাত্নের শেষ সীমায় পৌছেছিল, তখন তিনি শরিয়তের সুন্নতের সম্পূর্ণ অনুগামী ছিলেন। সাত বছর বয়সে মাওলানা সাহেবকে নামাজে দাড় করানো হল এবং শরিয়তের অনুশাসিত দশ বছরের সময় মাওলানা সাহেব জামাতের নিয়মানুবর্তী ও আসক্ত হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি কখনো কখনো বয়স্ক লোকদেরকেও নামাজের কথা স্মরণ করে দিতেন এবং আযানের সংবাদ প্রদান করতেন। আল্লাহ তা'য়ালাই প্রিয় বরগুযীদা অস্তিত্বকে প্রথম বয়স হতেই পৃথিবীবাসীর মঙ্গল ও আল্লাহভক্ত লোকদের খাদেম বানিয়ে দিয়েছিলেন। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আবশ্যকীয় সব কাজ শেষ করে অযু করত সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হতেন। কখনও কখনও নিজেই আযান দিতেন এবং সালাত পড়ার জন্য ব্যস্ত হতেন। তিনি তার ঘরের কাজ কর্মের এরকম দৃষ্টি রাখতেন যে তার পিতামাতার কোন কাজ করতে না হয়। তিনি নিজে অনেক দুরুহ ও আবশ্যকীয় কাজ সমূহ স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করে পিতামাতার আন্তরিক দোয়া ও খুশির বরকত লাভ করতেন। কখনও কোনও অতিথি এসে উপস্থিত হলে তিনি তার স্বভাবসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী তার খেদমতের জন্য উপস্থিত থাকতেন এবং অতিথির প্রকৃত হক আদায় করতেন। এসকল অতিথিদের মধ্যে অনেক সময় আল্লাহর খাস প্রিয় বান্দাগণও থাকতেন। তারা তার পিতাকে ধন্যবাদ ও সুসংবাদ দিয়ে বলতেন যে, আপনার এ সন্তান নবির ওয়ারেস (প্রতিনিধি) হবে। প্রথম থেকে তার শরিয়তের আদেশ সমূহের প্রতি গভীর প্রীতি ও মনোযোগ ছিল। এ অবস্থায় তিনি ক্ষমতানুসারে চেষ্টা করছিলেন। সালাত, রোজার প্রচলন করার সঙ্গে সঙ্গে বেদাত, কুপ্রথা এবং বিবাহকালে শরিয়ত বিরোধী রীতিনীতিগুলো থেকে লোকদেরকে সর্বদা বাধা প্রদান করতেন ও ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। তদ্রুপ সহায়হীন দুর্বল বিধবা এবং ইয়াতিমদেরকে সাহায্য ও সহায়তা করতেন। কোন কোন বাড়ির পারিবারিক কাজ কর্ম অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সদায়-পত্র এনে দিতেন। কোন ঘরে যদি পানির অভাব হত তবে পানি এনে দিতেন। ফল কথা, তিনি শৈশবকাল হতেই নিজ জন্মজাত স্বভাব অনুযায়ী সুন্নতের অনুসরণকারী এবং নবি করিম (স.) এর সদগুণ সমূহের আমলকারী ছিলেন।"[৩৩৪]

৩৩৩. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮-৯

৩৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৯-১১

বিদ্যা শিক্ষা

"মাওলানা সাহেবের পিতা ফারসি বিদ্যায় সুপ্রসিদ্ধ ও লেখার দিক দিয়ে একজন অতি উচ্চ ধরনের সুন্দর হস্তাক্ষর বিশারদ ছিলেন। মাওলানা সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা তার পিতা আপন পিতৃবৎসল স্নেহের দ্বারা নিজেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে অন্যান্য ওস্তাদ ও প্রসিদ্ধ বিদ্বান মণ্ডলীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং প্রত্যেক বিদ্যার শিক্ষকদেরকে অন্বেষণ করে পূর্ণত্ব লাভ করেন। তিনি নিম্নলিখিত বিদ্বানদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। যথা:-

ক্র.নং	ওস্তাদগণের নাম	যে বিদ্যা শিক্ষালাভ করেছেন
০১	মাওলানা কুদরতউল্লাহ রুদলব	ধর্ম বিষয়ক বিদ্যা
০২	মাওলানা আহাম্মদউল্লাহ আনাবী	হাদিস
০৩	মাওলানা আহাম্মদ আলী চেরিয়াকুটি	ইলমে মাকুলাত
০৪	কারী সৈয়দ ইবরাহীম মাদানী	ইলমে তাজবীদ
০৫	কারী সৈয়দ মোহাম্মদ এসকান্দরানী	ইলমে তাজবীদ

৩৩৫

ইলমে তাজবীদের চর্চা

"তিনি ঐ সময়ে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ কারী সৈয়দ ইবরাহীম মাদানী ও কারী সৈয়দ মোহাম্মদ একান্দরানীর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এ ইলমে তাজবীদের তিনি যথেষ্ট খেদমত করে গেছেন। লোকে যাতে সহিহ, মাখরাজসহ কুর'আন শরিফ পাঠ করতে পারে সেটাই উনার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এ বিষয়ে তিনি বহু কিতাব লেখেছেন। তিনি লোকদেরকে কুর'আন মুশক করিয়েছেন এবং অনেককে ইলমে তাজবীদ ও কিরা'আত শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত কারী তৈরি করে গেছেন। ইলমে তাজবীদ বিষয়ে তার প্রণীত কিতাব 'মাখারেজুল হুরুফ শরূহে জজরী হিন্দী', 'জিনাতুল কারী', 'কাওকাবে দুররী' পড়বার ও উপকার পাওয়ার মত। এ সকল কিতাব লোক সমাজে এতই আদরনীয় হয়েছে যে আজ পর্যন্ত সেগুলো পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়ে চলেছে। ইসলামিয়া মাদ্রাসা সমূহে এ কিতাবগুলো পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছাড়া কিরাতের ওস্তাদগণ সেগুলোকে দলিল স্বরূপ পেশ করে থাকেন।

মাওলানা আব্দুল আব্দুল বাতেন জৌনপুরী (র.) বলেন, আমার মরহুম পিতা হযরত মাওলানা হাফেজ আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেব তার প্রণীত 'আহসানুত-তাওয়াবীল' নামক কিতাবে লেখেছেন যে, "আমি উপরোল্লিখিত কিতাবসমূহ মক্কা শরীফেও পাঠ্য তালিকাভুক্ত দেখেছি।" এগুলো তার খাটি নিয়ত ও সর্বসাধারণের নিকট আদরণীয় হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে যে সকল মাদ্রাসায় ইলমে তাজবীদের শিক্ষার প্রচলন আছে। সেখানে উক্ত কিতাবগুলোকে অত্যন্ত সম্মান ও আদরের চোখে দেখা হয়।"[৩৩৬]

ফনে কিতাবাত বা লিখন কৌশল

"হযরত মাওলানা সাহেব সুলেখা বিষয়ে বিদ্যা বিশারদ হাফেজ আব্দুল গনি মরহুমের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি লেখক হাফেজ মোহাম্মদ আলী সাহেবের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। মাওলানা সাহেব যখন সুলেখায়

৩৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১১
৩৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১২

তার গুরুর সমকক্ষতা লাভ করেন তখন মরহুম হাফেজ আবদুল গনি সাহেব সুন্দর লেখা বিষয়ক বিদ্যার যাবতীয় সম্পদ, যা তিনি তার শিক্ষক এর নিকট থেকে লাভ করেছিলেন, সেসব কিছু মাওলানা সাহেবকে অর্পণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালার অপার মহিমায় এ সম্পদ মাওলানা সাহেবের বংশেই রয়ে গেল। যেহেতু মাওলানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ মুহসেন মরহুম যখন লিখন বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন, তখন মাওলানা সাহেব লিখন বিদ্যার যাবতীয় সম্পদ তার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করেন। অতঃপর মাওলানা মোহাম্মদ মুহসেন সাহেব পূর্ব নির্দেশানুসারে নিজের সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সুফি মরহুম আবুল হোসাইন সাহেবকে অর্পণ করেন। জনাব মাওলানা সাহেব ৭ প্রকারে লিখতে পারতেন। তিনি বহু লোককে লিখন বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সুলেখক করেছিলেন। তার লিখিত আরবি পুস্তকাবলি এবং হাতের লেখা কুর'আন শরিফ আজও বহু লোকের নিকট রয়ে গেছে।

জনাব মাওলানা সাহেব একটি মাত্র চালের ওপর বিসমিল্লাহ সহ সুরা ইখলাস সম্পূর্ণটা লেখে দিতেন এবং শেষে নিজের নাম পর্যন্ত লেখে দিতেন। এর বিশেষত্ব এ ছিল যে অক্ষরগুলো স্পষ্ট সুন্দর এবং পরিষ্কার ছিল। দর্শক এটা দেখে আশ্চর্য বোধ করত। চাউলের ওপর সুরা ইখলাস লেখার সময় সেটাকে ধরার বিশেষ কৌশল ও লেখার তাৎপর্য যা গোপনভাবে চলে আসতেছিল, তিনি তা আপন ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ মুহসেন সাহেবকে শিক্ষাদান করেছিলেন। অতঃপর মাওলানা মুহসেন সাহেব চাউলের ওপর লেখার নিয়ম আপন ছেলে মাওলানা সুফি আবুল হুসাইন সাহেবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ ফকির লেখক শৈশবে তাদের লিখিত চাল দেখেছি।

মাওলানা আবুল বাশার সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, ঢাকা শহরের একজন ধনী লোক চাউলের ওপর সুরা ইখলাস লেখার নিয়ম কৌশল শিক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং তৎপরিবর্তে ৫০০ শত টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুপযুক্ত বিবেচনায় মাওলানা সাহেব সে ব্যক্তিকে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দেননি। যেহেতু এ কাজের সম্মান ও গুরুত্ব টাকা পয়সার দ্বারা করা যেতে পারে না। হ্যা, তবে যদি উক্ত ধনী ব্যক্তি টাকা পয়সার বিনিময়ে না চেয়ে বরং বিদ্যা অন্বেষণকারী হিসেবে চাইতেন তাহলে সেটা সম্ভবপর হত। তিনি ভুল করেছিলেন, যেহেতু এটি তিনি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে শিক্ষা লাভ করতে চেয়েছিলেন।"[৩৩৭]

সৈনিক বিদ্যা

"জনাব মাওলানা সাহেব দ্বীনি ইলম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে সৈনিক বিদ্যাও লাভ করতে লাগলেন। সেসময়ে বোহারী নামক একজন স্বর্ণকার সৈনিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং তাকে সে বিদ্যার ওস্তাদ বলা হত। শহরের হিন্দু ও মুসলিম তার নিকট সৈনিক বিদ্যা শিক্ষা করত। মাওলানা সাহেবের অন্তরেও এ বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মে। তার সমবয়স্ক বন্ধুগণ তাকে এ কাজে অনর্থক সময় ব্যয় করতে নিষেধ করায় তিনি উত্তর প্রদান করেছিলেন, এটাও একটা বিদ্যা। আমি এটাকে ধর্মের সাহায্যার্থে শিক্ষালাভ করতে চাই, যা ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় আমার সাহায্য ও সহায়তাকারী হতে পারে।

মাওলানা সাহেবের দিনের বেলায় কোন অবসর ছিল না। মাগরিবের নামাজের পরে তিনি বেহারী স্বর্ণকারের বাড়িতে গমন করতেন। অপরাপর বহু লোক রাতে যেত। কিন্তু মাওলানা সাহেব মাগরিবের সালাত পাঠ করেই সেখানে চলে যেতেন এবং সর্বপ্রথম ওস্তাদের বাড়ির পানি উঠিয়ে দিয়ে তারপর ব্যায়ামশালায় যেতেন। তিনি পানি উঠাবার কাজকে কুস্তিগীর ও সৈনিক বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে গন্য করে নিয়েছিলেন। ওস্তাদের খেদমত এবং নিজের অশেষ

৩৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩-১৪

চেষ্টার দ্বারা সৈনিক বিদ্যা শিক্ষা করা তার একটি স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। এজন্যই প্রত্যেহ তিনি খুব দ্রুত গতিতে উন্নতি করতে লাগলেন যা দেখে দর্শকগণও আশ্চর্য বোধ করতেন। বেশিরভাগ স্থানে মাওলানা সাহেব অপরাপর ছাত্রদের তুলনায় দর্শকগণ এমনকি ওস্তাদের দৃষ্টিতেও তিনি প্রথম স্থান লাভ করতেন। এতে কোন কোন হিন্দু ওস্তাদের নিকট বলতে লাগল, আমরা দিনের বেলায় পরিশ্রম করার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি বেলায়ও হুজুরের খেদমতে উপস্থিত আছি কিন্তু তবুও হুজুরের কৃপা দৃষ্টি আমাদের প্রতি কম। অথচ এ বিদ্যার বিশেষ কৌশল ও গুঢ় রহস্য আপনি একমাত্র মাওলানা সাহেবকেই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তদুত্তরে ওস্তাদ বলতেন, বন্ধুগণ আমি যা কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকি এবং বলে থাকি তা তোমাদের সম্মুখেই বলে থাকি। তবে মৌলবি সাহেবের ওপর আল্লাহু তা'য়ালার অসীম দয়া রয়েছে। বিশেষত, তার মনোযোগ এবং স্মরণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। প্রত্যেক কথাই তিনি স্মরণ রাখতে পারেন। তোমরা দিনের বেলায়ও আস এবং যা কিছু আদেশ করি তাও কর, এমনকি রাতে অবসর সময়েও এসে কাজ কর। কিন্তু মাওলানা সাহেব একজন উচ্চ বংশীয় ও বিদ্যান হিসেবেও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি দিনের বেলায় নিজের আবশ্যকীয় কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকার জন্য আসতে পারেন না। কিন্তু রাতে সর্বাগ্রে এসে উপস্থিত হন এবং মনুষ্যত্বের খাতিরে আমার সুখ শান্তির প্রতি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন যে, এমনকি আমার ঘরে পানি না থাকলে নিজের ধৈর্য সাহস সহকারে পানিপূর্ণ করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি এটাকে কষ্ট বা পরিশ্রম মনে করেন না এবং অসম্মান বলেও মনে করেন না। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এসবের প্রতি দৃষ্টি রাখ? মনে হয় তোমরা এসকল কাজ নিজের নাম বাড়ানোর জন্যই করে থাক। কেউ হয়ত মনে করবে যে অমুক ব্যক্তি বেশ লাঠি খেলোয়াড় এবং খুব বড় তলোয়ারবাজ। কিন্তু মৌলবি সাহেব নামের জন্য নয় বরং কাজের জন্যই শিক্ষা করেন এবং যে কষ্ট সহ্য করেন তাতে মনে হয় তিনি খাটি ধর্মীয় প্রেরণায় ও প্রকৃত দরদ দিয়েই করে থাকেন। এজন্যই আমার বিশেষ আগ্রহ তার প্রতি পরিদৃষ্ট হয়। এ বিদ্যায় তার দিন দিন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূল কথা এ যে মাওলানা সাহেব যখন যার নিকট থেকে যা শিক্ষা লাভ করতেন তা খেদমতের এবং খুশির দ্বারা লাভ করতেন। কাজেই তিনি ওস্তাদদের দোয়াও লাভ করতেন। পরে যখন তিনি হেদায়েত ও তাবলিগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন সৈনিক বিদ্যা তার সাহায্যকারী হয়েছিল। একজন হেদায়েতকারীর জন্য সেসময়ে এ বিদ্যার কতটুকু প্রয়োজন ছিল তা অনেক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে জানা গিয়েছিল। কাজেই আল্লাহ তা'য়ালা তার মনকে সৈনিক বিদ্যা শিক্ষা লাভ করার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি সৈনিক বিদ্যায় এতটুকু দক্ষতা লাভ করেছিলেন যে, কোন কোন সময়ে এমনকি এ বিদ্যায় পারদর্শী ওস্তাদগণ পর্যন্ত তার নিকট পরাভব স্বীকার করে যুদ্ধের অস্ত্র তার হাতে অর্পন করতে বাধ্য হত এবং তার শিষ্যত্বে দীক্ষা গ্রহণ করত। আজমগড় জেলার অন্তর্গত সদহারী নামক স্থানে মুসলিম জমিদারদের সাথে একবার তার এরূপ এক ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার বিখ্যাত সৈনিকবৃন্দের অনুরোধে মাওলানা সাহেব লাঠি এবং বনুটের (ব্যায়াম বিশেষ) কৌশল দর্শনে সেসব লোকজন তার নিপুণতাকে স্বীকার করে নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। ইসলাম প্রচারের কাজ করতে যেয়ে কোন কোন সময় তাকে শত্রুদের দ্বারা এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু 'বনুট'-এর দ্বারা তিনি সহজেই নিজকে মুক্ত করে নিয়েছেন। হেদায়েতের প্রথম অবস্থায় মাওলানা সাহেবের অসংখ্য শত্রু ছিল এবং প্রতি মুহূর্তেই প্রাণের ভয় ছিল। সেসময় তিনি সর্বদাই সশস্ত্রে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি তার প্রণীত কোন কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

"এ ফকির ধর্ম প্রচারের সময় অনেক কষ্ট ও চেষ্টা করেছে এবং নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ভ্রমণ করেছে। কুর'আন শরিফ লেখে এবং ব্যবসা করে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়েছে। এমনকি মুসাফেরি থেকে ফিরে ঋণ করে ভ্রমণের খরচ আদায় করতে হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাণের ভয়ে এ হতভাগাকে হাতিয়ার সহ প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।"

মুরুব্বিয়ানদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মোল্লাটোলা থেকে বাজার পর্যন্ত যে পথ চলে গেছে সে পথের সংলগ্ন একটি দ্বিতল পাকা বাড়ি ছিল। একবার বেদাতি লোকজন মাওলানা সাহেবকে প্রবঞ্চনা দিয়ে সে বাড়ির দ্বিতলে নিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মাওলানা সাহেব আসল মৌলিক বিদ্যার কৌশল প্রদর্শন করে শত্রুদেরকে হতভম্ব করে নিজেকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।"[৩৩৮]

রায়বেরেলি গমন এবং সৈয়দ সাহেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

"১৮ বছর বয়সে জনাব মাওলানা সাহেবের অন্তরে তার চরিত্র সংশোধন এবং আন্তরিক বিশুদ্ধতা লাভের আকাঙ্খা জন্মে। কিছুদিন আগে থেকেই তার দিল্লী যাওয়ার বাসনা জন্মেছিল। কেননা এ সময় দিল্লীতে জামেউল বারাকাত মুহিয়ে সুন্নাত হযরত মাওলানা সৈয়দ আহাম্মদ শহিদ এর হেদায়েতের সূর্য প্রকাশিত হয়ে চারদিকে আলো বিচ্ছুরণ হচ্ছিল। যার আলোক রশ্মি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছিল। এসময় মাওলানা কারামত আলী সাহেবের পিপাসা নিবারণ ও আন্তরিক ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা গায়েব থেকে হয়ে গেল। কেননা ঠিক এ সময় সৈয়দ সাহেব (র.) তার খাস খলিফা এবং সঙ্গীদেরকে নিয়ে নিজের বাসস্থান রায়বেরেলির তাকিয়ায়ে শাহ ইলমুল্লাতে আগমন করেন। দিল্লীর তুলনায় রায়বেরেলি জৌনপুর থেকে খুব নিকটবর্তী। মাওলানা কারামত আলী সাহেব সৈয়দ সাহেবের পবিত্র আস্তানায় উপস্থিত হন এবং সেখানে এক জামা'আত (দল) আলেমকে উপস্থিত দেখতে পান। এসকল আলেম পরস্পর সকলেই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এক ধ্যানে ও এক খেয়ালে একত্রিত হয়েছিলেন। এরকম পবিত্র ও সৌভাগ্যপূর্ণ সভা ও সঙ্গ লাভের সৌন্দর্য যদি কেউ জামা'আতের কোন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করে তবে তিনিই সেটার সদুত্তর দিতে সক্ষম হবেন। যা মাওলানা সাহেব জৌনপুরে ফিরে এসে আপন পিতা ও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট খুব আনন্দ ও কৌতূহলের সাথে বর্ণনা করেছিলেন। তার সারমর্ম এ দাড়ায় যে, আমি যা দর্শন করেছি, যা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি এবং যাকিছু আশানুরূপ লাভ করেছি, তা কারও চক্ষু দর্শন করেনি,কারও কর্ন শুনেনি এবং কোন আদম সন্তানের অন্তরে ভাসেনি। এর চেয়ে অতিরিক্ত আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

হযরত মাওলানা সাহেবের রায়বেরেলি উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত সৈয়দ সাহেব প্রথম দৃষ্টি ও সাক্ষাতের দ্বারা তাকে পরীক্ষা করে নিলেন এবং বাই'য়াত করে উচ্চ সম্মান দান করলেন। প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মাওলানা সাহেবকে বললেন, এখন থেকেই হেদায়েতের কাজে লেগে যাও। অতঃপর হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহিদ দেহলবীর মধ্যস্থতায় খেলাফত ও শাজরানামা প্রদান করেন যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এ পবিত্র জামা'আত থেকে পৃথক হওয়া মাওলানা সাহেবের অন্তর কখনও চায়নি। কিন্তু 'আল আমরু ফাওকাল আদাব' (আদেশের মূল্য আদবের চেয়েও বেশি) এ কথার প্রতি লক্ষ্য করে পীরের আদেশ পালন করাকে অবশ্য কর্তব্য এবং প্রকৃত সৌভাগ্য মনে করে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। অপর দিকে মুর্শেদে কামেল এরকম প্রিয় অতিথিকে আপন আন্তরিক আবেগ ও পূর্ণ ভালবাসার টানে এবং হেকমতপূর্ণ শুভকে সামনে রেখে এরশাদ করলেন, "আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে খুব তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা হয়ে গেছে। তবে মেহমান হিসাবে দু-চারদিন অবস্থান করে ভাল করে দেখে নাও।"
এ সুসংবাদ মাওলানা সাহেবের আন্তরিক পূর্ণত্ব এবং মোকামাতে সুলুকের যাবতীয় দরজাগুলো অতি সত্ত্বর অতিক্রম করার নিদর্শন স্বরূপ এবং মাওলানা সাহেবের বিষয় সৈয়দ সাহেবের এ এরশাদ তার প্রতি এক বিশেষ যোগ্যতা ও উপযুক্ততা প্রকাশ করে।

৩৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫-১৮

রায়বেরেলিতে অবস্থানকালে মাওলানা কারামত আলী সাহেব ১৮ দিন যাবত ইলমে 'তাসাউফ' এবং 'রূহানী তাওয়াজ্জুহ' লাভ করেন এবং ইলমে তাসাউফের ভেদ উদঘাটন করতে থাকেন। কামেল মুর্শেদের সাথে উপযুক্ত মুরীদের ১৮ দিন সঙ্গলাভ কোন এক বোজুর্গের কথায় ১৮ বছরের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। সৈয়দ সাহেবের বাতেনী তাওয়াজ্জুহ এবং আন্তরিক অনুশীলনীর দ্বারা মাওলানা সাহেব মোকামাতে সুলুকের দরজাগুলো ১৮ দিনের মধ্যেই লাভ করেছিলেন। এরকম বাতেনী ধন লাভ করার বিষয়ে মাওলানা সাহেব বলতেছেন যে, "আমার মুর্শেদে বরহক রায়বেরেলির মসজিদে ১৮ দিন পর্যন্ত আমাকে ইলমে মারফতের ভেদ শিক্ষা দান করেছিলেন। তারই উসিলায় এ ফকির এমন পথ পেলাম যে, মাত্র ৪ দিনের মধ্যে নূরের পর্দা অতিক্রম করতে লাগলাম এবং দশ দিনের মধ্যে দুগ্ধ ত্যাগকারী সন্তানের ন্যায় হয়ে উঠলাম। এতে মুর্শেদে বরহকের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ কালে কোন ভয় রইল না"

জনাব মাওলানা সাহেবের প্রণীত তাসাউফের কিতাব 'নুরুন আলা নুর' নামক কিতাবে তিনি তার নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে উপরোক্ত ঘটনার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উক্ত কিতাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একদিন এ নির্বোধ মাওলানা আব্দুল হাই[৩৩৯] মরহুমের কাছে নিবেদন করলাম, কাশফ এবং মোশাহেদার ভেদ বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন কিতাবসমূহে যেরূপ লেখা আছে তাই বর্ণনা করতে পারি। তুমি নিজেও দেখতে পার। তুমি যে উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেছ তা একমাত্র পীর সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পার। এ হতভাগা তখনই পীর সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'কাশফ' ও 'মোশাহেদা' লাভের নিয়ম অন্যান্য কিতাবের ন্যায় 'সিরাতুল মোস্তাকিম' নামক কিতাবে লেখেছি। কিন্তু এটা প্রচলিত আছে যে, কোন প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ২ ও ২ এ কত হয়? তখন সে উত্তর দেয় ৪ হয়। পুনরায় যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ৪ ও ৪ এ কত হয়? তবে সে উত্তর দেয় ৮ হয়। আবার যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে ৮ ও ৮ এ কত হয়? তখন সে উত্তর দেয় যে ১৬ হয়। ১৬ ও ১৬ এ কত হয়? জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিবে ৩২ হবে। আবার যদি বলা হয় যে ৩২ ও ৩২ এ কত হবে? তখন সে বলবে ৬৪ হবে। পুনরায় যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে ৬৪ ও ৬৪ এ কত হয়? তখন সে চক্ষু বন্ধ করে একটু চিন্তা করে উত্তর দিবে যে ১২৮ হয়। জনাব পীর সাহেবও আমাদেরকে বুঝাবার জন্য চক্ষু বন্ধ করে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। তার সে অবস্থার কথা আমি যে এখনও দেখছি। তারপর তিনি বললেন আমি চোখ খুলে মোরাকাবা করি এতে আমার মোশাহাদা লাভ হয়। তুমি চোখ খোলা অবস্থায় মোরাকাবা কর। পীর সাহেবের একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এ হতভাগার উদ্দেশ্য সফল হল এবং মোশাহাদা, ফানা, বাকা এবং হককুল ইয়াকিন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল। অতঃপর আমার যাবতীয় পবিত্রতা, ইবাদত ও জিকেরের মধ্যে মোশাহাদা লাভ করতে লাগলাম। আল্লাহ তাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিফল দান করুন এবং এজন্য আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় প্রশংসা।

সত্যিই যখন কোন উর্বর জমিতে সামান্য বৃষ্টিও হয়, তবু সেটা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। অপর পক্ষে যদি কোন লবণাক্ত ও কঙ্করময় জমিনেতে বারিপাত হয়, সেখানে এমনকি সারা বছর ধরে বৃষ্টিপাত হলেও কোন উপকার হয় না। প্রত্যেক বিষয়ে মাওলানা সাহেব অত্যন্ত তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করতে লাগলেন। এটির প্রকাশ্য কারণ এ বলে মনে হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালার অসীম কুদরতের দ্বারা মাওলানা সাহেবকে তার সৃষ্ট মানব জাতির সেবার জন্য উপযুক্ত করে দেয়া। একারণেই তার সময়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ দীর্ঘতা লাভ হত। এক বাংলা ও আসামে হেদায়েত ও তাবলিগের কাজে তিনি একান্ন বছরের বেশি অতিবাহিত করেছেন। এসময়ের মধ্যে তিনি হিন্দুস্তানের জেলা সমূহ

৩৩৯. মাওলানা আব্দুল হাই মরহুম সৈয়দ সাহেবের খাস এবং প্রধান খলিফা ছিলেন। এসকল কথোপকথন বেরেলিতে হয়েছিল।

ব্যতীত বাংলা ও আসামের ঘরে ঘরে হেদায়েতের আলো পৌছে দেন। ঠিক এ সময়ে তিনি ধর্মীয় কিতাবাদি প্রণয়নের কাজও শেষ করেন এবং পাঠদানের ব্যবস্থা করে ছাত্রদেরকে ধর্ম প্রচারক রূপে রাজ্যের চতুর্দিকে আল্লাহ তা'য়ালার কালেমাকে ও ইসলামের দাওয়াতের জন্য পাঠিয়ে দেন। জনাব মাওলানা সাহেব জনাব সৈয়দ সাহেবের নিকট থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মারফতের যাবতীয় রহস্য ভেদ এবং আন্তরিক ধনে ধনবান হতে পেরেছিলেন এবং মাওলানা সাহেবকে শান্তিদান করার জন্য খোদ সৈয়দ সাহেবের জবান মোবারক থেকে একথা প্রকাশিত হল যে, 'কাজ আল্লাহর রহমতে সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং দ্রুত হয়ে গেছে' ।

হযরত সৈয়দ সাহেব তার কামেল ও উপযুক্ত খলিফাকে তৃতীয় সপ্তাহে বাড়ি যাওয়ার অনুগ্রহপূর্ণ অনুমতি দান করেন এবং মাওলানা সাহেবও নিজ পীরে কামেলের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে স্বীয় বাসস্থান জৌনপুরে গমন করেন। যেহেতু তাবলিগের কাজে তিনি পূর্ব থেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, জৌনপুরে আগমন করে তিনি আরও জোরেশোরে উক্ত কাজ করতে লাগলেন। তিনি মহল্লায় মহল্লায় ঘরে ঘরে গমন করে সালাত, রোজা, পর্দা এবং শরিয়তের অপরাপর আরকানগুলো শিক্ষা দিতেন ও আদায়ের জন্য তাকীদ দিতেন। সেসময়ে জৌনপুরে নামাজের জন্য দিনে আজান দেয়া হত না। ভোরে ও সন্ধ্যায় সূর্যের উদয় ও অস্তের বার্তা জানানোর জন্য নামে মাত্র আজান দেয়া হত। তিনি এসকল অজ্ঞান অন্ধকারময় প্রচলন সমূহ সংশোধন করে অপরিসীম চেষ্টার দ্বারা মসজিদ সমূহে দৈনিক পাচবার অজান ও জামা'আতের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা'য়ালার নাম ব্যতীত দেব দেবতার নামে মান্নত করা ও শিরকি প্রচলন সমূহ লোকের মধ্যে তখন অবাধভাবে ছিল। বিবাহ ইত্যাদির মধ্যে হিন্দুদের প্রচলিত নিয়ম-কানুন বিদ্যমান ছিল। এ সমূদয় কুসংস্কার ও পাপের কাজ থেকে ওয়ায নসিহত দ্বারা লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখতেন। সর্বসাধারণ মাওলানা সাহেবের এমন বিরামহীন চেষ্টা দেখে তার বাধ্য ও অনুগত হয়ে পড়ল। মাওলানা সাহেবের এসকল কাজে এত শীঘ্র কৃতকার্য হওয়ার একমাত্র কারণ হযরত পীর সৈয়দ সাহেবের দোয়া। জৌনপুরের মুসলিমদেরকে ধর্মের হেফাজত ও সেটিকে ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানকার জামে মসজিদে প্রতি শুক্রবার নামাজের পর ওয়াজের রীতি প্রচলন করেন। কেননা প্রতি সপ্তাহে লোকজন ধর্মের কথা ওয়ায শ্রবণ করলে ধর্মের ওপর তাদের বিশ্বাস দৃঢ় থাকবে। জুম'আর পরে ওয়ায নসিহতের নিয়ম প্রচলন করলেন এবং সবসময়ের জন্যই এ রীতি পাকাপাকি ভাবে চলতে লাগল। এ ওয়ায নসিহতের দ্বারা জৌনপুর বাসীদের যথেষ্ট উপকার সাধন হয়েছিল। এজন্যই জৌনপুর বাসীগণ ধর্মের বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠে। এ নিয়ম মাওলানা সাহেবের মৃত্যুর পরও প্রায় ৫০ বছর যাবত জৌনপুরের মসজিদে প্রচলিত ছিল। আজ কয়েক বছর যাবত এ নিয়মের মধ্যে কিছু শিথিলতা দেখা দিয়েছে। তবুও আজ পর্যন্ত উক্ত নিয়ম কতেকটা প্রচলিত আছে।"[৩৪০]

জৌনপুরের জামে মসজিদের আবাদী ও পবিত্রতা

জনাব মৌলানা সাহেব তাবলিগের সঙ্গে সঙ্গে জৌনপুরের সর্ববৃহৎ শাহি মসজিদের পবিত্রতা, জামা'আত ও জুম'আর সালাত আদায়ের চিন্তা করতে লাগলেন। এ মসজিদটি সুলতান ইব্রাহীম শরুকী তার পীরে কামেল হযরত ঈসা তাজের আদেশানুসারে একান্ত আগ্রহ সহকারে প্রস্তুত করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত এ বৃহৎ মসজিদটি বিদ'আতিদের অধিকারে ছিল। আযান, জুম'আ ও জামা'আতের পরিবর্তে সেখানে পার্থিব সভা সমিতি এবং বিবাহ কাজে ব্যবহার করা হত। বর যাত্রির দল নির্বিশেষে এক তাজিয়ার কাজে সেটাকে ব্যবহার করত। অতএব সেসময়ের

৩৪০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯-২৫

মসজিদগুলোর অবস্থা মাওলানা সাহেব নিজেই বর্ণনা করেছেন : "মসজিদগুলো এমন ছিল যে, লোকজন সেখানে গান বাদ্য করত। হিন্দুগণ বরযাত্রি রাখত। আড্ডা দিত এবং সরাব পান করত।" (জাদুদ তাকওয়া)

মোটকথা, যাবতীয় খেলা তামাশার জন্য উক্ত বিরাট মসজিদটিকে ক্লাব ও নাট্যশালারূপে ব্যবহার করা হত। এমনকি মসজিদের কোন কোন অংশে গবাদি পশুও বাধা হত। মসজিদের এমন অবস্থা জৌনপুরের বিখ্যাত কবি মুনসী আব্দুল মজিদ 'দেমাগ' কবিতাকারে বর্ণনা করেছেন। এটাকে অন্ধকার যুগের কাবা ঘরের সাথে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, ঐ মসজিদ খানার অবস্থা কাবা ঘরের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল। কবির কয়েকটি কবিতার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল :

"সুপ্রসিদ্ধ কাবা ঘর অপেক্ষাও,
জৌনপুর জামে মসজিদের অবস্থা অধিকতর খারাপ ছিল।
কেননা এ মসজিদে কৃষকরা গবাদি পশু বেধে রাখত,
আর কাবা ঘরে মুর্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।
এ মসজিদে শুধু জানোয়ার গুলো রাখা হত,
কিন্তু কাবা ঘরে মুর্তিগুলোর সাথে কিছু মানুষও থাকত।
এ মসজিদে গবাদি পশুর মল ও গোবরের স্তুপে ভরপুর ছিল,
আর কাবা ঘর ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
কাবা ঘরে একমাত্র উপাসনা করা হত,
এ মসজিদে পূর্ণ ছিল পাপাচার ও ব্যভিচারে।
কাবা ঘরে আলো দান করা হত,
কিন্তু এ মসজিদ অন্ধকার ও পাপাচারের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল।"

যে মসজিদে এক আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত ও উপাসনা করা হত। যাতে আওলিয়া শিরোমনি হযরত ঈসা তাজ (রা.) এর মত মহান ব্যক্তি পাচবার সালাত আদায় করতেন এবং বিশ্বস্ত বর্ণনা অনুসারে সেখানে মহামান্য আলেমদের ৯০০ পালকি জুম'আর নামাজের জন্য সমবেত হত। আজ এরকম মসজিদের কি দুর্দশাই না, আজ সেটা খেলা ধুলার আড্ডায় পরিণত। আল্লাহ তা'য়ালার তৌহিদের ধ্বনির পরিবর্তে দোতারা, সেতারা ও ঢোল তবলার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মসজিদের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা, অসম্মান ও অবিচারকে একজন সামান্য ঈমানদারও যদি সহ্য করতে না পারে, তাহলে মাওলানা কারামত আলি সাহেবের মত একজন খাটি আলেম ও প্রকৃত মুজাহিদ তা কিভাবে সহ্য করতে পারেন? মসজিদের অসম্মান দেখে তার প্রাণে কঠিন আঘাত লাগল এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় মাওলানা সাহেবের প্রতি উক্ত মসজিদটিকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও ধর্মের শত্রুদের নিকট থেকে উদ্ধার করা সবচেয়ে বড় ইবাদত ও জিহাদ স্বরূপ ছিল। অতএব মাওলানা সাহেব আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ষোল আনা নির্ভর করে জামে মসজিদ আবাদ এবং তাতে জামা'আত ও জুম'আর সালাত আদায় করার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী চেষ্টা করতে লাগলেন। এ বিরাট মসজিদ থেকে বিদ'আতিদেরকে বিতাড়িত করে খাটি মুসলিমদের অধিকারভুক্ত করার ব্যাপারে মাওলানা সাহেবকে কঠিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, তার খাটি নিয়তের দরুন যাবতীয় বিপদ সহজ ও সরল হয়ে গেল। ধর্মের শত্রু শয়তানের স্থলাভিষিক্তদের ধোকা ও প্রবঞ্চনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। শত্রুগণ সত্য দ্বারা ভীত হয়ে তার সামনে আসতে সক্ষম হল না এবং তার পর্দার অন্তরালে এভাবে অদৃশ্য হল যে আজ পর্যন্ত আর আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। মাওলানা সাহেব তার উদ্দেশ্য লাভের জন্য বাহ্যিক চেষ্টা ব্যতীত আন্তরিক সাধনারও সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে

তিনি মসজিদে দৈনিক পাচবার আযান ও জামা'আতের ব্যবস্থা করেন এবং সর্ব প্রথম মাত্র ৫ জন নামাজি নিয়ে জৌনপুরের জামে মসজিদে জুম'আর সালাত আদায় করেন। এ পাচ জনের মধ্যে একজন হলেন মাওলানা সাহেবের চাচা শেখ আমির উল্লাহ। আর তিনজন হলেন উক্ত মহল্লার খাটি ও সাচ্চা ইমানদার। এ কাজ করার সঙ্গে তিনি প্রত্যেক মহল্লায় গিয়ে লোকদরকে সালাত শিক্ষা দিতেন এবং মসজিদগুলোকে আবাদ করা, আযান দেয়া এবং জামা'আত আদায় করার ওয়াদা করাতেন। এমনকি নিজে গিয়ে তত্ত্বাবধান করতেন। ঐ সময় মানুষ আযান, ইবাদত, সালাত ও জামা'আতের সাথে এত সম্পর্কহীন ও অপরিচিত ছিল যে দিনের বেলা আযানের শব্দ শ্রবণ করলে আশ্চর্য বোধ করত এবং বলত, আরে মিয়া দিনের বেলায় আবার কিসের আযান, জনাব মাওলান সাহেবের নিজের বর্ণনায় উক্ত বিষয় লেখেছেন : "এ ফকির যখন পাচবার আযানের ব্যবস্থা করলাম তখন কোন কোন অজ্ঞ মুসলিম বলতে লাগল, ভোরে ও সন্ধ্যায় আযান শুনেছি। কিন্তু দিনে কখনও আযান শুনিনি। এটি একটি নতুন নিয়ম বের হয়েছে।

মাওলানা আবুল বাসার সাহেব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কোন এক বিশ্বস্ত বুজুর্গলোকের নিকট শুনেছেন যে, জনাব মাওলানা কারামত আলী সাহেব নিজেই বলেছেন : "আমি একদা জৌনপুরের প্রসিদ্ধ নেতা মুন্সী ইমাম বক্সের বাড়ির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একজন বৃদ্ধা মেয়েলোক দূর থেকে আমাকে দেখল। তার হাতে একটি পাতিল ছিল। সে সেটাকে ধৌত করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। যখন বৃদ্ধা আমার নিকটবর্তী হল তখন সে পাতিলটি সজোরে আমার ওপর নিক্ষেপ করল ও বলল, এ নতুন মৌলবিই দিনের বেলা আযানের প্রচলন করেছে।"
মোট কথা, মাওলানা সাহেব জৌনপুরের জামে মসজিদে নিজেই পাচ ওয়াক্ত আযান ও জামা'আত আরম্ভ করেন। জামে মসজিদ তার বাড়ি মোল্লাটোলা থেকে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে ছিল। তিনি শেষ রাতে মসজিদে গমন করতেন। কখনো কখনো সেখানে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর আযান দিয়ে সালাত আদায় করত বাড়ি ফিরতেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি এভাবে অতিবাহিত করেন। এটি নিঃসন্দেহ যে, যেখানে আল্লাহ তা'য়ালার তৌহিদের আওয়ায উচ্চস্বরে উত্থিত হয় সেখানে শয়তানের চেলা চামুণ্ডাদের অবস্থান করা কতক্ষন সম্ভব হয়? আযান ও জামা'আতের বরকতে বিদ'আতি ও মোফসেদিগণ দূরে সরে যেতে লাগল। কিন্তু মাওলানা সাহেবকে উৎপীড়ন করতে বিরত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার রহমতে অল্পদিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'য়ালার ঘর পাক পবিত্র হয়ে গেল এবং আজ পর্যন্ত শহরের লোকজন মাওলানা সাহেবের বংশধরদের ইমামতিতে জুম'আর সালাত আদায় করে থাকে।[৩৪১]

হানাফী মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন

"জৌনপুর এক সময় যাবতীয় বিদ্যার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং বিখ্যাত আলেমদের বাসস্থান ছিল। আল্লাহ তা'য়ালা মাওলানা সাহেবকে হেদায়েতের জন্য মনোনীত করেছিলেন এমন এক যুগে, যে যুগে খাটি আলেম সমাজ এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করেছিল। তবে যেসকল আলেম অবশিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে আমল বলতে কিছু বাকি ছিলনা। শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সময় জৌনপুরে কোন রীতিমত মাদ্রাসা ছিল না। জামে মসজিদে মাওলানা সাহেব মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। তাতে শুধু কুর'আন শিক্ষা ও কুর'আন শরিফ হেফজ করার ব্যবস্থা ছিল। ঠিক সে সময় সেখানে একটি দীনি মাদ্রাসা স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সত্যিই এমন এক সময় এসে উপস্থিত হল যখন জৌনপুরের সুপ্রসিদ্ধ সরদার হাজি মুন্সী ইমাম বকস্ সাহেবের মনে ধারণা জন্মাল যে, তিনি তার জমিদারীর

৩৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬-২৯

কিছু অংশ ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ওয়াকফ করে যাবেন। তা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত পুণ্য ও সওয়াবের কারণ স্বরূপ হয়। অতঃপর তিনি মাওলানা সাহেবের পরামর্শানুযায়ী একটি আরবি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। যা আজ পর্যন্ত 'হানাফী মাদ্রাসা' নামে বিখ্যাত। মাওলানা সাহেব এ মাদ্রাসার নাম উপরোক্ত নামে বিশেষ উপযুক্ত কারণে রেখেছিলেন। এ মাদ্রাসায় বড় বড় আলেমগণ শিক্ষা দান করেছেন এবং এখানে শিক্ষা লাভ করে বহু আলেম দূর দেশে গমন করেছেন। এ মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক হিন্দুস্তানের সুবিখ্যাত আলেম লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গি মহল্লার অধিবাসী হযরত মাওলানা আব্দুল হালিম সাহেব (মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব লক্ষ্ণৌবির পিতা) নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সময় মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব (র.) তার পিতার তত্ত্বাবধানে থেকে মাদ্রাসায়ে হানাফিয়ায় পবিত্র কুর'আন শরিফ হেফজ (মুখস্ত) করতেছিলেন।"[৩৪২]

আলী হতে কারামত আলী হওয়ার কারণ

"জনাব মাওলানা সাহেবের প্রকৃত নাম ছিল 'আলী'। কেননা তার প্রণীত কিতাবসমূহে কোন কোন সময় 'আলী জৌনপুরী' আবার কোন কোন কিতাবে 'আলী জৌনপুরী' প্রসিদ্ধ কারামত আলী বলে উল্লিখিত হয়েছে। 'আলী' শব্দের সাথে কারামত শব্দ যোগ করার কারণ তা হতে অসংখ্য কারামত ও অস্বাভাবিক ঘটনা সমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এতে পরে তার নামের আগে কারামত শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং আলী শব্দের পরিবর্তে কারামত আলী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যে সময়ে তিনি দাওয়াতে ইসলাম ও হেদায়েতর বোঝা গ্রহণ করেন তখন কল্পনার যুগ ছিল। তখনকার যুগে একজন হেদায়েতকারীর পক্ষে একজন পাকা আলেম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা হতে অসংখ্য কারামত ও আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক ঘটনা সমূহ প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। যুগোপযোগী হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালা অসীম কুদরতের দ্বারা তার মধ্যে এসকল গুনাবলি দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার কারামত সমূহ হেদায়েতর কাজে খুবই সহয়ক হয়েছিল। মাওলানা সাহেবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঐ সকল বিস্ময়ের (কারামত) বিশেষ আবশ্যক ছিল। বিশেষত ঐ সময় বাংলা ও আসামে যাদু-টোনার খুব বেশি প্রচলন ছিল। খেলাফে শরিয়ত ও বাজীকর ফকিরের বিশেষ জোর জিল। প্রতারণা, যাদুগিরি, যোগীদের অলৌকিক ঘটনা এবং নজরবন্দি ইত্যাদিকে কারামত বলে মনে করা হত। প্রবঞ্চকদের অস্বাভাবিক কার্যকলাপ দেখে লোকজন তাদেরকে অলিয়ে কামেল ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে ধারণা করত। জনসাধারণের ধারণাও তখন ঐ দিকেই প্রবল ছিল। কাজেই ঐ যুগে তার মত একজন কারামত বিশিষ্ট পথ প্রদর্শকের বিশেষ আবশ্যক ছিল। যে ঐ সকল প্রবঞ্চক ও ধোকাবাজদের ধোকা ও প্রবঞ্চনাকে ধ্বংস করে লোকদেরকে রক্ষা করতে পারে। অতএব ঐ সময় যে রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল তার ঔষধও সেভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালা তার অসীম কৌশলে এবং নিজের অভ্যাস ও ইচ্ছানুসারে এমন একজন পথ প্রদর্শক প্রেরণ করেছিলেন, যার থেকে অসংখ্য কারামত ও অস্বাভাবিক ঘটনা সমূহ ঘটেছিল। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক নবিকে সে যুগের লোকদের মানসিক ও স্বাভাবিক অবস্থানুযায়ী মোজেজা বা অলৌকিক শক্তি প্রদান করে প্রেরিত করা হয়ে থাকে। এটিই আল্লাহ তা'য়ালার চিরন্তন রীতি। কাজেই প্রত্যেক নবি তার সমসাময়িক যুগের অবস্থানুসারে মোজেজা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। যেমন নাকি হযরত মুসা পয়গাম্বরের সময় যাদু বিদ্যার খুব জোর প্রচলন ছিল। তার মোজেজা দ্বারা সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি প্রস্তুত করে লোকদেরকে আশ্চর্যান্বিত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলত এবং এ যাদু বিদ্যাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করত। কাজেই মুসা পয়গাম্বরকে এমন একটি লাঠি মোজেজা স্বরূপ দান করা হয়েছিল, যাদ্বারা তিনি সকলের ওপর জয়লাভ করেছিলেন। ফেরাউনের যাদুকরগণ যখন হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে যাদুর প্রতিযোগিতা করতে আসল এবং নিজ নিজ যাদু দ্বারা সর্প ও বিচ্ছু তৈরি করে দেখাল। তখন হযরত

৩৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

মুসা (আ.) এর লাঠি ইশারা পেয়ে বিরাট সর্পে পরিণত হল এবং যাদুগরদের প্রতারিত সাপ বিচ্ছুগুলোকে গলধঃকরণ করল। এ অলৌকিক ঘটনা বিশেষ করে জাদুকরদের ওপরই কার্যকরী হয়েছিল। কারণ তারা সকলেই তৎক্ষণাৎ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। তদ্রুপ আমাদের হযরত ঈসা (আ.) এর যুগে চিকিৎসা বিদ্যার খুব জোর প্রচলন ছিল এবং এটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানত। কাজেই হযরত ঈসা পয়গাম্বরকে চিকিৎসা দ্বারা রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা বড় শক্তিশালী বিদ্যা মৃত লোকদেরকে জীবিত করার মত শক্তি দান করেছিল।

আমাদের নবি হযরত মোহাম্মদ (স.) এর সময় ফাসাহাত ও বালাগত (বাগ্মীতা ও বাকপটুত্ব) এর পূর্ণ প্রচলন ছিল। এ যুগে উন্নতির মাপকাঠি ছিল ফসিহ বা বাগ্মী হওয়া। এমনকি যে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশি বাগ্মী ও বাকপটু হতেন ঐ ব্যক্তিই আরববাসীদের শাসনকর্তা হতেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) কে এমন এক মোজেজা দান করেছিলেন যা সমগ্র আরবের বাগ্মীতাকে পানির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। আর সে মোজেজা হল পবিত্র কুর'আন। সমগ্র আরবের বাগ্মীগণ মিলিত হয়েও তার মত একটি ক্ষুদ্র সুরা পর্যন্ত লিখতে পারল না। তার আল্লাহ প্রদত্ত একটিমাত্র কথার বা বাক্যের দ্বারা তারা অস্থির ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত। বাংলাদেশের এ অবস্থাই ছিল। সেখানে বাজিকর ফকির, প্রতারক পীর, যোগী, ঋষি এবং ভেল্কিবাজদের কাজেও যাদুর কারখানায় পরিণত হয়েছিল। জনসাধারণ একজন বিশেষ ও মহান লোককে পাওয়ার আকাঙ্খা ও কামনা করেছিল। এজন্যই তখন বাংলাদেশে এমন একজন খাটি ও উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়েছিল, যিনি উপদেশ ও শিক্ষা ব্যতীত কারামত বিশিষ্ট। এ যুগের প্রকৃত একজন শুভাকাঙ্খী হতে পারে এবং লোকের বিষাক্ত ধারণার প্রকৃত চিকিৎসা করতে পারেন এবং রোগীও তার প্রকৃত চিকিৎসক দেখে শান্তি লাভ করতে পারে। তার কারামত ও অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ দেখে লোকের সংশোধন হওয়া সম্ভব। কাজেই ঐ সকল বস্তু সেটিতে বর্তমান। যেহেতু মাওলানা সাহেব বাংলাদেশের হেদায়েতকারী হবেন, কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে অস্বাভাবিক কতগুলো কারামত দান করে অনুগৃহিত করেছিলেন। অধিকন্তু তা হতে অত্যধিকরূপে কারামত প্রকাশিত হওয়ার দরুন তার নাম 'আলী' হতে 'কারামত আলী' রূপে পরিচিত হয়েছে।"[৩৪৩]

"হযরত মাওলানা কারামত আলী (র.) এর পিতা প্রদত্ত নাম ছিল মোহাম্মদ আলী। তার রচিত কিতাব সমূহে তিনি লেখেছেন আলী জৌনপুরী। তার হেদায়েত কালে অসংখ্য কারামাত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তিনি কারামত আলী জৌনপুরী নামে পরিচিতি লাভ করেন। এ সকল অলৌকিক ঘটনার বেশিরভাগই বিভিন্ন বই পুস্তকে এবং লোক মুখে প্রচারিত হয়েছে। তন্মধ্যে রংপুর মুন্সিপাড়ার অধিবাসী সুফি মোদাব্বের হোসেন, এ্যাডভোকেট কর্তৃক প্রণীত "মাওলানা কারামত আলী (র.) এর জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধে (পাতা ২৪-২৭) যে সকল অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন নিম্নে তা উদ্বৃত হলো-

১। মাওলানা সাহেব একটি মাত্র চাউলের ওপর স্পষ্ট, সুন্দর ও পরিষ্কার অক্ষরে বিসমিল্লাহর সাথে সূরা এখলাস তার নাম সহ লিখতে পারতেন। দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি এ চাউল খেলে আরোগ্য লাভ করত।

২। নোয়াখালী জেলার এক প্রসিদ্ধ সুদখোর মাওলানা সাহেবকে নিজ বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। উক্ত ব্যক্তি সুদ খাওয়া না ছাড়লে মাওলানা সাহেব তার বাড়িতে যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। এতে ঐ ব্যক্তি ও তার লোকজন ক্ষেপে মাওলানা সাহেবের বোট আক্রমণ করে। ফলে বোট ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। মাওলানা সাহেবের লোকজন আত্মরক্ষার জন্য উক্ত সুদখোরকে হত্যা করে। অন্যান্য লোকেরা পালিয়ে গিয়ে থানায় এজাহার

৩৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১০১-১০৩

দেয়। থানার পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য বোটে এলে মাওলানা সাহেব পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেন যে, তিনি কোন মানুষ হত্যা করেননি। যাকে হত্যা করা হয়েছে সে একটা শুকর। তাৎক্ষণিক পুলিশ কাপড় সরিয়ে উক্ত ব্যক্তির লাশ দেখতে চাইলে একটি মৃত শুকর দেখতে পায়। অর্থাৎ ঐ সুদখোর ব্যক্তির মৃত দেহটি শুকরে পরিণত হয়েছে। এ অলৌকিক ঘটনাটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন সুদ খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং মাওলানা সাহেবের কাছে তাওবা করে মুরিদ হয়।

৩। একদা কলকাতা হাওড়া পুলের নিকটে গঙ্গা নদীতে মাওলানা সাহেবের বোট নোঙ্গর করা হয়। নদীর অপর পাড়ে এক হিন্দুযোগী বটবৃক্ষের নিচে ধ্যানে মগ্ন ছিল। লোকজনকে মাওলানা সাহেবের নিকট বোটে যাতায়াত করতে দেখে ঐ সাধু এর কারণ জানতে চাইলে সকলেই বললো যে, এখানে এক বিখ্যাত পীর সাহেবের আগমন হয়েছে, তিনি বোটে অবস্থান করছেন। তখন সাধু বললেন, তোমাদের পীরকে বলো তিনি যদি জুতা পায়ে হেটে গঙ্গা নদী পার হতে পারেন, তবে আমি তার শীষ্যত্ব গ্রহণ করব। আর আমি যদি পায়ে হেটে গঙ্গা নদী পার হতে পারি তবে তাকে আমার শীষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। মাওলানা সাহেব সাধুর উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দিনক্ষণ ধার্য করা হলো। অগণিত মানুষ গঙ্গা নদীর উভয় তীরে সমবেত হল ঘটনাটি দেখার জন্য। মাওলানা সাহেব জুতা পায়ে পানির ওপর দিয়ে হেটে গঙ্গা নদী সহজেই পার হয়ে গেলেন। কিন্তু সাধুর পা পানিতে বার বার ডুবে গেল। অর্থাৎ সাধু পায়ে হেটে গঙ্গা নদী আর পার হতে পারলেন না। মাওলানা সাহেবের এ অলৌকিক শক্তি দেখে উক্ত হিন্দু সাধু সহ সমবেত বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

৪। বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি থানায় এক হিন্দু ব্যক্তি মাওলানা সাহেবের হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরের বছর মাওলানা সাহেব ঐ এলাকায় পুনরায় এলে জানতে পারলেন যে, ঐ লোকটি আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে গেছে। মাওলানা সাহেব বিষন্ন হলেন। ঐ সময় মাওলানা সাহেবের বোট থেকে কিছু মোরগ ছুটে যায় এবং মন্দিরে প্রবেশ করে মুর্তির সামনে রাখা প্রসাদ খেয়ে ফেলে। এতে হিন্দু লোকজন তাদের জাত, ধর্ম, মান ইজ্জত সব নষ্ট হয়েছে বলে ক্ষেপে ঢাল তলোয়ার নিয়ে মাওলানা সাহেবের বোট আক্রমণ করেন। মাওলানা সাহেব বিষয়টি জেনে উপস্থিত হিন্দু জনগণকে বলেন যে, তোমরা মন্দিরের মুর্তিকে জিজ্ঞাসা কর এতে কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। তারা উত্তর দেয় মন্দিরের মুর্তি কথা বলতে পারে না। আমরা কি করে জিজ্ঞাসা করবো। উত্তরে মাওলানা সাহেব বললেন যে, মন্দিরের মুর্তি যখন কথা বলতে পারে না, মোরগ তাড়াতে পারে না, তোমাদের দেয়া প্রসাদ খেতে পারে না, তখন তোমরা কেন তার পূজা করো? তোমাদের ঐ মুর্তি যদি আমার সাথে কথা বলে তবে তোমরা কি ইসলাম ধর্ম কবুল করবে? বিষয়টি অসম্ভব ভেবে সকলেই সম্মতি দেয়। তখন মাওলানা সাহেব মন্দিরে গিয়ে বললেন, হে মুর্তি কথা বলো, আমার মোরগ মন্দিরের দেয়া প্রসাদ খেয়ে ফেলাতে কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা? সঙ্গে সঙ্গে মুর্তিগুলো হাত তুলে বললো, এতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। এ অলৌকিক ঘটনা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং দলে দলে লোক মাওলানা সাহেবের কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

৫। মাওলানা সাহেব রংপুর শহরে অবস্থানকালে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে একজন জীবিত ব্যক্তিকে মৃত সাজিয়ে কাফন পড়িয়ে তার কাছে জানাজার নামায পড়ার জন্য নিয়ে আসে। মাওলানা সাহেব আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং পর পর তিনবার জানাজা পড়াতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু ঐ লোকগুলো বার বার তাকে জানাজা পড়ানোর জন্য পিড়াপিড়ি করতে থাকে। অবশেষে তিনি ঐ লোকটার জানাজার নামায পড়ান। নামায শেষে লোকেরা হাসতে হাসতে জীবিত লোকটার কাফনের কাপড় সরিয়ে দেখতে পায় যে, লোকটা মৃত। এ অলৌকিক ঘটনা দেখে দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন অনুতপ্ত হয়ে মাওলানা সাহেবের কাছে তাওবা করে মুরিদ হয়।

৬। রংপুরে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর আগমনের আগে এক দরবেশ সব সময় উলঙ্গ হয়ে রাস্তার পাশে থাকতেন। তাকে কাপড় দিলেও তিনি কাপড় পড়তেন না এ বলে যে, রংপুর শহরে কোন মানুষ নেই যে, কাপড় পড়তে হবে। এখানে যারা আছেন তারা পশুর তুল্য। মাওলানা সাহেবের বোট যেদিন রংপুর শহরের উপকণ্ঠে ঘাঘট নদীর তীরে নোঙ্গর করলো ঐ দিন ঐ ব্যক্তি কাপড়ের দোকানে গিয়ে পরিধানের কাপড় চাইলেন এবং বললেন যে, আজ রংপুরে মানুষ এসেছে আর উলঙ্গ থাকা যাবে না।

৭। রংপুর শহরে অবস্থান কালে মাওলানা সাহেব পালকি চড়ে একদিন এক জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তার ধারে জঙ্গলে এক মহিলা লাকড়ী সংগ্রহ করছিল। মাওলানা সাহেব পালকীর দরজা খুলে ঐ দৃশ্যটি দেখতে থাকেন। পালকী গন্তব্যে স্থানে পৌছার পর সঙ্গের লোকজন মহিলাটির লাকড়ী সংগ্রহের দৃশ্য অবলোকন করার কারণ জানতে চাইলে মাওলানা সাহেব বলেন যে, হযরত আজরাইল (আ.) সাপের সুরত ধরে ঐ স্ত্রী লোকটিকে দংশন করে তার জান কবজ করবে। এ জন্যই তিনি ঐ দৃশ্য দেখেছিলেন। পরবর্তীতে সত্যি সত্যিই সাপের দংশনে মৃত ঐ মহিলার লাশ জানাজার জন্য মাওলানা সাহেবের কাছে নিয়ে আনা হলো। তখন সকলেই মাওলানা সাহেবের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে অবগত হলো।

৮। রংপুর শহরে অবস্থান কালে দৈনিক অগণিত লোক আরোগ্য লাভের জন্য মাওলানা সাহেবের পানি পড়া নেয়ার জন্য তার কাছে আসতেন। একদিন প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে এক ব্যক্তি এক গ্লাস পানি দম করে নেয়। কিন্তু লোকটার সন্দেহ হয় যে, মাওলানা সাহেবের ফুক ঐ গ্লাসের পানিতে পড়েনি। তাই সে পুনরায় মাওলানা সাহেবকে পানিতে ফুক দিতে বললে মাওলানা সাহেব ফুক দেয়া মাত্র গ্লাসটি ভেঙ্গে যায়। প্রতিদিন প্রচন্ড ভীড়ের কারণে মাওলানা সাহেব শেষ পর্যন্ত এক গ্লাস পানি দোয়া কালেমা পড়ে ফুক দিয়ে রংপুর শহরের পুরাতন জামে মসজিদ সংলগ্ন কুয়ায় ফেলে দেন এবং মানুষকে ঐ কুয়া থেকে পানি নেয়ার জন্য উপদেশ দেন। মাওলানা সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সে কুয়ার পানি পান করে সকলেই আরোগ্য লাভ করেছেন।"[৩৪৪]

মাওলানা সাহেবের ওপর জীবন নাশমুলক আক্রমণ

বিদ'আতিদের মধ্য থেকে যাদের বাড়ি মসজিদের আশে-পাশে ছিল তারা মাওলানা সাহেবের এ চালচলন সহ্য করতে পারল না এবং সেটা তাদের মনঃপীড়ার বিষয় হয়ে দাড়াল। তারা মাওলানা সাহেবকে হত্যার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। এ জঘন্য কাজ সমাধা করার জন্য তারা একজন পাঠানকে ৫০০ শত টাকা দিয়ে স্থির করল যে মাওলানা সাহেব ভোরে অন্ধকার থাকতে যখন মসজিদে আসে তখন তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিবে। সকলের সমবেত চেষ্টায় টাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ঐ ব্যাঘ্র-প্রাণ পাঠান টাকার লোভে ও পুরস্কারের আশায় মাওলানা সাহেবকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হল এবং নির্দিষ্ট সময়ে তরবারীসহ মসজিদের এক কোণে আত্মগোপন করে দাড়িয়ে রইল। মাওলানা সাহেব তার নিজের অভ্যাস মত যখন অন্ধকার থাকতে মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন ঐ ঘাতক তার প্রতি তরবারি নিক্ষেপ করতে হাত উপরে উত্তোলন করার সঙ্গে সঙ্গে আর নিচে নামাতে সক্ষম হল না। হাত উপরেই রয়ে গেল। মাওলানা সাহেব যখন একটু দূরে সরে গেলেন তখন ঐ খা সাহেব নিজকে নড়াচড়া করতে অক্ষম দেখে চিৎকার করে উঠল এবং বলল, মাওলানা সাহেব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মাওলানা সাহেব শব্দ শুনে ফিরলেন। তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করত হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনা অবগত হলেন। কিন্তু তাতে তার মুখমণ্ডলের কোন পরিবর্তন পর্যন্ত দেখা গেল না এবং এ ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের কথা শুনে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। কিন্তু খা সাহেবের ক্রন্দনের দরুন

৩৪৪. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-১১

মাওলানা সাহেবের মনে দয়ার উদ্রেক হল। মাওলানা সাহেব তার হকপুরস্ত হস্ত তার বাহুতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে হাত নিচে নেমে আসল। খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ তওবা করে সর্বদার জন্য মাওলানা সাহেবের দলবদ্ধ হল এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সালাত রোজার প্রতি অটল হয়ে রইল।"[৩৪৫]

মাওলানা সাহেবের একটি প্রকাশ্য কারামত

মাওলানা সাহেবের হাজার হাজার কারামত ছিল এবং সেটি বহু লোকের অন্তরে রক্ষিত। যা সুশৃঙ্খল ও নিয়মিতভাবে একত্রিত করলে এক বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। তিনি নিজকে একটি কাজের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। সে কাজের উপযোগী একটি অসাধারণ কারামত তার মধ্যে প্রকৃত অবস্থায় বর্তমান ছিল। স্বয়ং মাওলানা সাহেব বাংলা ও আসামের যে সকল অংশে ভ্রমণ করেছিলেন এবং যেসকল জেলায় তিনি শুভাগমন করেছিলেন, সেখানকার লোকজনের জীবনধারণ প্রণালী ইসলামি ছাচে গড়া বলে দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমস্ত স্থানের লোকদেরকে প্রথম দৃষ্টিতে অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম বলে মনে হবে। অপর পক্ষে যে সকল স্থানে মাওলানা সাহেব গমন করেননি সেখানকার লোকজন হতে ইসলামি জীবনধারন ও দ্বীনদার বিদায় গ্রহণ করেছে। তাদের জীবন ধারন প্রণালী, চলাফেরা, বসবাস, পোশাক পরিচ্ছদ এবং আকৃতি প্রকৃতি দেখে তাদেরকে মুসলিম বলেই সন্দেহ হবে। কাজেই পাঠকের নিকট পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলিমদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হবে। উভয় অংশের মুসলিমদের মধ্যে আকৃতি, পোশাক ও আচরণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে পার্থক্য প্রতীয়মান হবে। এমনকি বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রেও ঐরূপ পার্থক্য দেখা যাবে। যে সকল ভদ্রমহোদয়গণের ভাগ্যে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সাথে মিলিত হবার সুযোগ লাভ হয়েছে তারা নিশ্চই আমার লেখার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবেন। মাওলানা সাহেব তার তাবলিগের কাজের জন্য পূর্ব বাংলাকে পছন্দ করেছিলেন। কেননা ঐ সময় পূর্ব বাংলা জাহেলি ও গোমরাহির কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। আল্লাহ তা'য়ালার শুকরে যে আজ সে পূর্ব বাংলা ইসলামি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। অথচ কেন্দ্র হবার উপযোগীও বটে। কিন্তু পাঠক যদি পশ্চিম বাংলার শহর ও গ্রামে গিয়ে ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার মুসলিমদের আমল ও আকিদা, জীবনধারণ প্রণালী, আকৃতি, পোশাক এবং চরিত্রের বিচার করেন তবে অন্ধকার যুগের কথা নিশ্চই মনে পড়বে। পশ্চিম বাংলার মুসলিমদের মধ্যে আপনি শরিয়তের বিরোধী সর্বপ্রথম যে কাজটি দেখতে পাবেন, সেটি হচ্ছে টুপি ব্যবহার না করা এবং হিন্দুদের ন্যায় গোছ দিয়ে ধুতী পরিধান করা। কোন কোন মুসলিমদের মোছ হয়ত দেখতে পাবেন কিন্তু মাথা খালি। এ অবস্থা বর্ধমান হতে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত দেখা যাবে। কোন কোন লোক বলেছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে এ পার্থক্যের একমাত্র কারণ মাওলানা সাহেবের স্বয়ং বর্তমান থাকার ফল। এটি মাওলানা সাহেবের কেরামতের একটি বিশেষ ফল স্বরূপ বা শান্ত্বনার উপযোগী। এখানে শহর বা গ্রাম সমূহে বেশি সংখ্যক মাদ্রাসা, মসজিদ, বা-আমল আলেম, স্বাভাবিক চালচলন, অতিথি বাৎসল্য ইত্যাদি সর্বত্র দেখতে পাবেন।"[৩৪৬]

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচারণ যখন দেশীয় হিন্দু মুসলিম সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল তখনই এফিল্ড রাইফেল নামক একপ্রকার বন্দুকে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত টোটা যা দাত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করা হত তা নিয়ে কলকাতার নিকট ব্যারাকপুরে ১৮৫৭

৩৪৫. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০-৩১
৩৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪-১০৬

খ্রিস্টাব্দে ২৯ মার্চ হিন্দু মুসলিম সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। পরে দাবানলের মতো ভারতের মীরাট, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে আরো বিভিন্ন ইস্যুতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিদ্রোহ শুরু হয় যাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ সময় হিন্দু মুসলিম একসাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। জৌনপুরে তখন নীল চাষ করা হতো। মাওলানা কারামত আলী এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন এবং তিনিই ছিলেন আন্দোলনের মূল পরিকল্পনাকারী। আন্দোলনের সময় ২ জন মহিলাসহ ১৮ জন ইংরেজ লোক প্রাণ রক্ষার্থে মাওলানা কারমত আলীর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সাতদিন পর ঐ ইংরেজ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ঘোড়ার গাড়িতে পর্দা দিয়ে ওদেরকে জৌনপুর থেকে সাইত্রিশ মাইল দুরে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট এ নিয়ে যান। তখন কর্নেল হাডসন ছিলেন ঐ ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। ইতিমধ্যে আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়ে মাওলানা কারামত আলীকে গ্রেফতার করা হয় এবং মৃত্যুর আদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জৌনপুরে আশ্রিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত ১৮ জন ইংরেজ মাওলানা কারামত আলীর পক্ষে জৌনপুর জজকোর্টে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ফলে মাওলানা কারামত আলীকে মুক্তি দেয়া হয়। ইংরেজদের জীবন রক্ষার জন্য তাকে কুইন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এবং রাজা এবারাত আলী জাহান এর পুরো জমিদারী দান করা হয়। কিন্তু মাওলানা কারামত আলী উক্ত ক্রেষ্ট ও জমিদারী প্রত্যাখান করেন। তবে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং (পরবর্তীতে ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি উপাধীতে ভূষিত) এর অনুরোধে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে তিনি ঈদুল ফিতরের নামাযের ইমামতি করেন। গভর্নর জেনারেল ঈদের মাঠের কাছে তার জন্য তৈরি সুরক্ষিত মঞ্চে উপস্থিত থেকে ঐ ঈদের নামাযের জামা'আত অবলোকন করেন।"[৩৪৭]

১৮৫৭ইং সনের বিদ্রোহের সময় মাওলানা সাহেব দুই উচ্চ বংশীয় ইংরেজ মহিলাকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং নিজে আশ্রয় প্রদান করেন। দুইজন ইংরেজ নেতা ডবলিও এফ লেগ ও আর এম এডওয়ার্ডস উপরোক্ত ঘটনাটিকে তাদের নিজের লেখায় নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন : মাওলানা কারামত আলী সাহেব ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রি. এর বিদ্রোহের সময় জৌনপুরের দুর্গের মধ্যে দুই জন ইংরেজ মহিলাকে, বেনারস হতে ইংরেজ সৈন্য জৌনপুরে না আসা পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। মাওলানা সাহেব মানবতার বিশেষ রক্ষক ছিলেন। বিদ্রোহ শেষ হওয়ার পরে ঐ দুইজন ইংরেজ মহিলা সরকারি কর্মচারীদের নিকট মাওলানা সাহেবের সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহারের কথা প্রকাশ করলেন। এতে ইংরেজ সরকার মাওলানা সাহেবকে সেটির পরিবর্তে রাজা এবারাত জাহানের জমিদারীটি (যা গভর্ণমেন্ট দখল করে নিয়েছিল) পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করলেন না। কেননা মাওলানা সাহেব এবং তার বংশধরদের পক্ষে এটি প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাড়াতে পারে। হযরত মাওলানা সাহেব উক্ত মহিলাদের সাথে যে সৎব্যবহার করেছিলেন যদি তিনি তার বিনিময় গ্রহণ করেন তবে তা ইসলামি শিক্ষা ও সৌন্দর্যের বিপরীত কাজে পরিণত হয়। কিন্তু মাওলানা সাহেবের মত ব্যক্তির পক্ষে তা করা শোভা পায় না। কাজেই মাওলানা সাহেব তার ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে জমিদারী ও ধন সম্পত্তির বিবাদ বিসংবাদ থেকে রক্ষা করে গেলেন এবং পার্থিব গোলযোগ থেকে পরিত্রাণ দান করে যান। দীর্ঘকাল অতীত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাওলানা সাহেবের বংশাবলি হযরত সৈয়দ সাহেবের আদেশ (তাবলিগ) পালন করে আসতেছেন এবং মাওলানা সাহেবের হুবহু (অবিকল) অনুসরণ করে তাবলিগের কাজে লিপ্ত রয়েছেন। মাওলানা কারামত আলী সাহেবের 'খান্দানে কারামতীর' মধ্যে আজ পর্যন্ত জমিদারী, ধনসম্পত্তি অথবা জায়গীরদারের কোন সম্পর্ক নেই। সকলেই আল্লাহ-তা'য়ালার ওপর নির্ভরশীল এবং তার ওপরই জীবন যাপন করে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালার ধন্যবাদ যে জনাব সৈয়দ সাহেবের

৩৪৭. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫-১৬

দোয়ার বরকতে উক্ত খান্দান দরিদ্রতা ও সংকীর্ণতার হাত থেকে নিরাপদ রয়েছেন। এ খান্দানে সর্বসাধারণ তাবলিগ ব্যতীত চাল চলন ও আকৃতি, বসবাসের নিয়ম পদ্ধতি, থাকা, খাওয়া, দান-খয়রাত, অতিথি সেবা এবং বিদ্যাচর্চায় জনাব মাওলানা সৈয়দ সাহেব ও মাওলানা কারামত আলী সাহেবদ্বয়ের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার যথাযথ আজও ঠিক রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।"[৩৪৮]

হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তিতে সমর্থন

মাওলানা কারামত আলী (র.) হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার বা নিন্দনীয় প্রথার তীব্র বিরোধীতা করেছেন যেগুলোর কারণে হিন্দু সমাজে হিন্দুরা সঠিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতো। এমনি একটি প্রথা হলো সতীদাহ প্রথা। এ বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধাব বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় সর্বশান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু হাল ছাড়েননি। বিধাব বিবাহকে সমর্থন করে প্রচন্ড চাপের মুখেও নিজের পুত্রকে বিধবার সাথে বিবাহ করান।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতার সামাজিক জীবনে 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ফলে ১৮২৯ সালে তৎকালীন গভর্নর উইলিয়াম বেন্টিং সতীদাহ প্রথা নিবারণে আইন প্রবর্তন করেন এবং এটি সমাজে নিষিদ্ধ হয়। মাওলানা সাহেব সমাজে কুসংস্কার দূরীকরণে তরুণদের এ আন্দোলন সমর্থন করেন এবং বিধবা বিবাহ দেয়ায় বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখে ধন্যবাদ জানান।"[৩৪৯]

মাওলানা সাহেবের লিল্লাহিয়াতের একটি মিসাল (উপমা)

এ হেদায়েত ও সরল পথ প্রদর্শনকালে এক শুভক্ষণে মিশরের এসকান্দারনীয়ার অধিবাসী ইলমে কিরাত ও তাজবীদে সুপ্রসিদ্ধ একজন কারী সাহেব ঢাকা শহরে শুভাগমন করেন। আরব দেশেও তার বেশ প্রসার ছিল। মাওলানা কারামত আলী সাহেবের প্রসিদ্ধি ও তাবলিগের প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। তখন কোন কোন বিশিষ্ট বন্ধু ও নেতা ঢাকায় মাওলানা সাহেবের সাথে মিলিত হবার ও ঢাকা শহরের দুরবস্থার প্রতিকারের আশায় তার খেদমতে উপস্থিত হল। তখন ঐ সকল নেতাদের সঙ্গে কারী সৈয়দ মুহাম্মদ এসকান্দরানী সাহেব যিনি আরবে হযরত সৈয়দ সাহেবের ফয়জ ও বরকত এবং কতকগুলো আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন, মহব্বত ও ভালবাসার টানে মাওলানা সাহেবের খেদমতে হাজির হলেন এবং তার সাথে মিলিত হয়ে কারী সাহেব হৃদয়গ্রাহী হয়ে আকর্ষিত অবস্থায় রয়ে গেলেন। তিনি আর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন না। মাওলানা সাহেব নিজের মাননীয় পিতা ও কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ হাফেজও কুর'আন শুদ্ধ করে পাঠকারীদের নিকট কুর'আন শরিফ সহি (শুদ্ধ) করে পাঠ করেছিলেন। আজমী উচ্চারণে ও সুমধুর স্বরে কুর'আন শরিফ পাঠ করতেন। কারী সাহেবের তাজবীদ কিরাত ও আরবি উচ্চারন শুনে এ সুযোগকে একটি বিশেষ মহান দান মনে করে কুর'আন শরিফ শুদ্ধ করে পড়তে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কারী সাহেবের নির্দেশানুসারে তাজবীদের কিতাবসমূহ রীতিমত সবক নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। এভাবে উক্ত ইলমে কিরাতে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেন। মাওলানা সাহেবের খাটি নিয়ত ও পূর্ণ মনোযোগের একটি নিদর্শন এ যে, তিনি জনসাধারণের কর্মস্থল হওয়া সত্বেও বিদ্যা শিক্ষার্থে ওস্তাদের সামনে কিতাব নিয়ে বসাকে সঙ্কোচ বোধ করেননি বা লজ্জা ও কাওম তার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। এটি আল্লাহ ওয়ালাদের একটি বিশেষ চিহ্ন স্বরূপ। এ

৩৪৮. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩-৩৪

৩৪৯. তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

বিদ্যা (তাজবীদ) শিক্ষালাভ করার পর এ বিষয়ে বহু কিতাব লেখে গিয়েছেন। তিনি উর্দু ভাষায় একটি কিতাব প্রণয়ন করে কারী সাহেবকে পাঠ করে শুনালেন এবং সেটি প্রচারের হুকুম নিয়ে সর্বসাধারণ মুমিনদের উপকারার্থে প্রথমবার কলকাতায় পাঠিয়ে বিশেষ চেষ্টা চরিতের দ্বারা ছাপিয়ে হিন্দুস্তানের চতুর্দিকে প্রচার করলেন। এ কিতাব ব্যতীত তিনি ইলমে তাজবীদের বিষয়ে আরও বহু কিতাব লেখে প্রচার করেছিলেন। যা আজ পর্যন্ত মাদ্রাসা সমূহে পাঠ্যরূপে পরিগণিত। দশ বছর পর্যন্ত কারী সাহেব মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। মাওলানা সাহেব কারী সাহেবের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন ব্যতীত শুধু পকেট খরচ বাবত মাসিক ১০০ ঢাকা করে নগদ প্রদান করতেন।"[৩৫০]

একজন অশিক্ষিত লোকের শুভ ধারণা

মাওলানা আবুল বাসার সাহেব বলতেন যে, মাওলানা সাহেবের একজন অশিক্ষিত নিরক্ষর মুরিদ ছিল। সে ব্যবসা উপলক্ষে কলকাতা বসবাস করত। ঐ ব্যক্তি এ খাকসারের নিকট বর্ণনা করেছেন: হুজুর, কত অসংখ্য মাশায়েখ ও আলেম কোথা থেকে এ কলকাতা শহরে এসেছে এবং আসছে। বিদ্বান ও মাশায়েখের তরিকার সাথে আন্তরিক ভালবাসা থাকার দরুন বেশিরভাগ জৌনপুরী মাওলানাদের সভায় আমি অংশ গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি শরিয়তানুযায়ী শপথ করে বলতে পারি যে, মাওলানা সাহেবের ন্যায় কেউই দৃষ্টির মধ্যে পড়েনি। তার সাহস, উৎসাহ ও তৎপরতার সমতুল্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি অথবা ঐ রকম কোন গ্রহণীয় বস্তু কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি। ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভীষণ শত্রুও যখন মাওলানা সাহেবের সাথে কথাবার্তা বলত তখন মাত্র দুই চারটি কথাবার্তার পর নিরুত্তর হয়ে তার পক্ষ সমর্থন করতে প্রভাবিত হত ও চুপ করে যেত। প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা মাওলানা সাহেবের মুখ হতে নির্গত হত না। তিনি যা বলতেন তা কিতাব দ্বারা প্রমাণ করে দিতেন। কাজেই কথা বলতে মোটেই ভয় ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন না এবং কোন প্রকারের ভদ্রতা ও খাতিরের ধার ধারতেন না। মাওলানা সাহেবের ঈমানের নির্ভীকতার একটি ঘটনা-হেদায়েতের উদ্দেশ্যে মাওলানা সাহেব এমন এক স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে একজন মুসলিম জমিদার ছিলেন। তিনি খুব অত্যাচারী ও আলেম বিদ্বেষী ছিলেন। যখন মাওলানা সাহেবের উপস্থিতির সংবাদ তার নিকট পৌছাল, তখন তিনি মাওলানা সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। এতে মাওলানা সাহেবের ভক্তদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। বেশিরভাগ লোক মাওলানা সাহেবকে পরামর্শ দিত, যেভাবেই হোক উক্ত ব্যক্তিকে পরিহার করা উচিত এবং সুযোগ মত এ স্থান পরিত্যাগ করা ভাল। কিন্তু মাওলানা সাহেব কিছুতেই ভীত হলেন না বরং লোকদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে জমিদারের বাড়ি গমন করলেন। জমিদার সাধারণত কাউকে এমনকি মাটিতেও বসতে আদেশ করতেন না। মাওলানা সাহেবকে দেখেই একখান চেয়ার বসবার জন্য দিলেন এবং আল্লাহর একত্ববাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। মাওলানা সাহেব তাকে আকলী এবং নকলী দলিল দ্বারা যতই বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু সে বুঝেও বুঝতে চাইল না এবং বলল, যদি আমি আপনার আলোচনার দ্বারা না বুঝি তবে আপনি কি করবেন? মাওলানা সাহেব উত্তর করলেন আমি একবার বুঝাব, দুই বার বুঝাব এমনকি তিনবার বুঝাব। তখন সে (জমিদার) বলল, তবুও যদি আমি না বুঝি তা হলে আপনি কি করবেন? তখন মাওলানা সাহেব তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন, তোমাকে এ তরবারী দ্বারা বুঝাব। জমিদার মাওলানা সাহেবের এরকম ইসলামি জোশ ও ইসলামের তেজ দেখে ভীত হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, আমি এ বিষয়ে আরো কতিপয় মৌলবি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার এমন কথায় এবং হুজুর হুজুর করায় আমি রাগান্বিত হই। তাদেরকে হত্যার আদেশ দিয়েছি। কেননা তাদের দ্বারাই ধর্ম ধ্বংস ও বরবাদ

৩৫০. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬-৫৭

হয়। নিশ্চই আপনি একজন সত্য হেদায়েতকারী। আপনার দ্বারা ইসলামের আলো ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর জমিদার মাওলানা সাহেবের হাতে বাই'য়াত গ্রহন করল এবং একজন খাটি ভক্তে পরিনত হল।"[৩৫১]

শত্রুদের একটি ধোকা

হযরত মাওলানা সাহেব এবং তার খলিফাদের এমন কতগুলো ধর্মের শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছিল, যারা ধর্ম প্রচারক ও ওয়াযকারীদেরকে একথা বলে লজ্জা দিত, লোকের মধ্যে দুর্নাম রটনা করত যে, এসকল ধর্ম প্রচারকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য টাকা পয়সা অর্জন করা। স্বর্ণাদি আহরণ করা। বিরুদ্ধবাদীদের এসকল কুপ্রচারণার আসল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ লোকদেরকে দুর্ভাবনায় পতিত করা এবং ওয়ায নসিহতের কথাবার্তাগুলোকে অকর্মন্য করা। এভাবে সাধারণের মনোযোগ ওয়াযকারীদের ওপর হতে ফিরিয়ে রাখতে চাইত। অপরপক্ষে ওয়াযকারীদেরকে লজ্জা দিয়ে ঐ কাজ হতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হত। এরকম নতুন ধরনের ইসলামের শত্রুদের বিষয় স্বয়ং মাওলানা সাহেব বলেন, বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে মুনাফিকগণ বলত যে, মৌলবিগণ টাকা পয়সা নিজেরা গ্রহণ করার জন্য যাকাতের মাসয়ালা প্রকাশ করে থাকে। মুনাফিকগণ বলে, যে সকল লোক দেশে দেশে ঘুরে ওয়ায নসিহত করে শুধু টাকা পয়সা অর্জন করার জন্য, এসকল কুমন্ত্রণার প্রতিবাদ তৃতীয় ফায়দার জাহিলিয়াতের বুরাইর বর্ণনার স্থানে পাওয়া যাবে।

মুনাফিকদের এসকল প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মতামতকে বিষাক্ত করে তোলা। দ্বিতীয় উদ্যেশ্য যা মাওলানা সাহেব নিজের লেখায় প্রকাশ করেছিলেন, তাতে এ ওয়াযকারী লোকজন লজ্জিত হয়ে দুর্নামের ভয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে ওয়ায করার প্রথা বন্ধ করে দেয়। বাস্তবিকই মুনাফিকদের প্রচারণার ফলে কোন কোন স্থানে ওয়াযকারীদের মধ্যে অলসতা ও অবহেলা দেখা যেতে লাগল এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকজন বিপথগামী হতে লাগল। এ বিষয় মাওলানা সাহেব আক্ষেপ সহকারে বলেছেন যে, ১২৮৮ হিজরিতে একবার পূর্ণিয়া জেলায় ভ্রমণকালে মালদহ জেলার বারঘরিয়ার অধিবাসী আমার বিশিষ্ট খলিফা শাহ তোফায়েল উল্লাহ সাহেবের নিকট শুনতে পেলাম এরং নিজেও দেখতে পেলাম যে, তৃতীয় ওয়াজের প্রথম উপকারিতায় যারা মুনাফিকদের ধোকার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেটিতে কোন কোন স্থানে কোন কোন ওয়াযকারী ঐসমস্ত ধোকাবাজীর দুর্নাম রটনার ভয়ে যাকাত ও সদকায়ে ফিতরার মাসয়ালা বর্ণনা করতে লজ্জা বোধ করত। তারা তাদের পাথেয় খরচ পাওয়ার ক্ষমতা কোথা হতে পাবে? ঘটনা এমন হয়েছিল যে কোন কোন ওয়াযকারী যখন কোন স্থানে যাওয়ার পর সেখানকার লোকজন মুনাফিকদের উল্লিখিত ধোকার দরুন ওয়াযকারীদেরকে অবজ্ঞা করত ও অমনোযোগের সাথে ওয়ায শ্রবণ করত। দানস্বরূপ যদি কেউ কিছু প্রদান করত তবে তা গ্রহণ করতেন, আর যদি না দিত তবে চুপচাপ থাকতেন। কেউ কেউ নৌকা ইত্যাদির ভাড়ার টাকা ঋণী হয়ে নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। এটির পরিণাম এ দাড়াল যে ওয়াযকারীগণ বাড়িতে বসে রইল। ওয়াজের প্রথা বন্ধ হয়ে গেল। হেয়ায়েতপ্রাপ্ত লোকজন গোমরাহ হয়ে গেল। পূর্বের আলেমদের নাম শুনে দূর দূরান্ত হতে লোকজন তাদের সাথে দেখা করতে আসত। কিন্তু এখন আলেমগণ যদি গ্রামেও আসতেন তবু তাদের সাথে কেউ দেখা করতে আসে না। মেয়ে লোকজন পর্দা করত এবং লম্বা আস্তিন বিশিষ্ট কোরতা পরিধান করতে অভ্যাস করেছিল। কিন্তু এখন আবার বেপর্দা হয়ে গেল। এমনকি মুসলিমদের মেয়ে লোকজন নদীর ঘাটে এসে গোসল করে। তাদের স্তন ও পেট সকল লোকে দেখে থাকে। হিন্দু মেয়েদের মত মুসলিম মেয়েরাও সিদুর লাগাতে লাগল। যে সকল লোক 'তাজিয়া' ত্যাগ করেছিল তারা পুনরায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে তাজিয়ার কাজ করতে লাগল এবং তাদের স্ত্রীলোকজন তাজিয়ার নিকট এসে বিলাপ ও ক্রন্দন আগের

৩৫১. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২-৬৩

চেয়ে বেশি করতে আরম্ভ করল। যে সকল মসজিদ আবাদ হয়েছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেল এবং গরুর গোবর পূর্ণ এবং মুসাফিরদের রান্না করবার চুলা স্বয়ং দেখেছি। যেসকল লোক ঢোল বাজানোর কাজ ত্যাগ করেছিল তারা পুনরায় উক্ত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। শত্রুদের চক্রান্তের ফলে হেদায়াতের উন্মুক্ত ও প্রস্ফুটিত ক্ষেত্রকে এভাবে ধ্বংস হতে দেখে মাওলানা সাহেবের কেমন দুঃখ ও ব্যথা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। উদ্যমকে নিস্তব্ধকারী এসকল অবস্থা কতই বেদনাদয়ক। কেননা বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা ও শ্রমের পর মানুষগণ সৎপথে আসতেছিল এবং ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছিল। মাওলানা সাহেবের পিছনে পিছনে মুনাফিক ও ধোকাবাজগন সর্বসাধারণকে কুমন্ত্রণা ও সন্দেহের মধ্যে ফেলে ওয়াযকারীর প্রতি কুভাব জন্মে দিয়েছিল এবং ওয়ায শ্রবণ হতে বাধা প্রধান করেছিল। ওয়াযকারীদেরকে লজ্জা ও কাওম প্রদান করত দুর্নাম রটিয়ে তাদেরকে ঘরে বসতে বাধ্য করেছিল। সাধারণ লোকদেরকে লাগামহীন করে দিয়েছিল। যার বিষাক্ত ফলের কথা স্বয়ং মাওলানা সাহেবের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। এ দুঃখজনক বিপ্লবের মধ্যেও মাওলানা সাহেব তার সাহস হারালেন না। তার সংকল্প ও ধৈর্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি। বরং ঐ পথভ্রষ্টদেরকে পুনরায় শরিয়তের পথে আনয়ন করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন এবং মাত্র ছয় মাসের চেষ্টা চরিতের ফলে আগের চেয়ে বেশি কৃতকার্য হলেন। এ কৃতকার্যতাকে মাওলানা সাহেব আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসার সাথে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসার পরে ...."এ হতভাগা যখন কোন কোন স্থানে গমন করলাম এবং ওয়ায শ্রবণ করালাম, তখন হাজার হাজার লোক মুরিদ হয়ে পড়ল। ছয়মাস ধরে তাবলিগকালে আমি একজন লা-মজহাবী গোমরাহকারী বেদাতির সাক্ষাত পেলাম না। সকলেই পলায়ন করল। কাজেই এখন মুসলিমদের ওয়াজিব, তারা যেন ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে।"

ধর্মীয় উপযোগিতাকে সামনে রেখে ওয়ায ও নসিহতের পথকে চালু রাখার জন্য মাওলানা সাহেব ওয়াযকারী ও সাধারণ লোকদেরকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করে সতর্কতার সাথে বলতেছেন-এ যুগে ওয়ায নসিহত শ্রবণ করা ও অপরকে শুনানো খুবই আবশ্যক। কেননা মানুষ মুর্খ ও গাফিল হয়ে চলছে। এমন আবশ্যক হওয়ার দরুনই 'রদ্দোল মোখতার' নামক কিতাবে বহু কিতাব হতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এ যুগে কুর'আন, ফিকাহ, ইমামত, আযান, ইকামত, এবং ওয়াজের জন্য বেতন নির্দিষ্ট করা জায়েজ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন নাকি একটু আগে তৃতীয় বর্ণনার দ্বারা জানা গিয়েছে যে, এ যুগের লোকদের ওপর ওয়াজিব যে উপরোক্ত কাজগুলোর সমাধানকল্পে খরচাদি বহন করা, ওয়ারেসুল আম্বিয়াদের নিকট হতে ওয়ায শ্রবণ করা এবং আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের এমন খেদমত করা উচিত যে তারা সে অপমান ও অভাব অনটন হতে রক্ষা পায়।

অনেক ওয়াযকারী নিজেদের খরচ পত্র বহন করতে অক্ষম হয়ে তাদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল ও ধিক্কার মনে করত। বিশেষত এসকল স্থানে লজ্জা দেয়ার জন্য একদল সুশৃঙ্খল লোক সজ্জিত থাকত। মওলানা সাহেবের উপরোক্ত আদেশ সর্ব সাধারণ এবং বিশেষ লোকদের জন্য সতর্কতাস্বরূপ ছিল। তিনি বিশেষ বিশেষ ওয়াযকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, ওয়াযকারীদের পক্ষে হাদিয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করা মাসনুন (রীতি সিদ্ধ) এবং এতে বরকতও আছে। এরকম হাদিয়া গ্রহণ করার হুকুমকে ফিকাহের কিতাবসমূহে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত আছে। যেমন : 'আলমগিরি' কিতাবের কিতাবে আদাবুল কাজী নামক নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যদি কোন লোক ওয়াযকারীকে কোন হাদিয়া দেয় তবে তার পক্ষে উক্ত হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ। কেউ যদি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয় অর্থাৎ নিজেই গ্রহণ করে তবে এমন ওয়াযকারীর ওপর কোন প্রকার প্রতিবাদ করার কিছু থাকে না।[৩৫২]

৩৫২. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৮০

সাধারণভাবে বোধগম্য হওয়া দলিলের একটি উদাহরণ

নিজের কথাকে লোকের পছন্দনীয় করার জন্য এবং সাধারণ লোককে বুঝাবার জন্য মাওলানা সাহেবের দলিল প্রমাণের ধারা ও পদ্ধতি খুব সহজ ও সাধারণভাবে বোধগম্য হত। মাওলানা আবুল বাসার সাহেবের বর্ণনানুসারে (প্রকাশ) জুম'আ ও জামা'আত কায়েম করতে করতে যখন মাওলানা সাহেব কুমিল্লা শহরে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি সেখানে সুজা বাদশা কর্তৃক প্রস্তুত শাহী মসজিদে জুম'আর সালাত কায়েম করেন এবং ওয়াযও করেন। তিনি বলেন লোকে অযথা বলে থাকে যে, আমি নতুন কথা প্রকাশ করে থাকি। আমার নতুন কথা এ যে, আমি আদেশ করে থাকি, সালাত পড়, জুম'আ আদায় কর। যারা বলে যে, এ দেশে জুম'আর সালাত জায়েজ নয় এবং হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশকে 'দারুল হরব', জুম'আ ফরয হওয়াকে অমান্য করে এবং জুম'আ আদায়কারীদেরকে জবরদস্তি সহকারে বাধা প্রদান করে, আমি তাদের সাথে মোনাজেরা করি ও জুম'আ জায়েজ হওয়ার ফতওয়া দিয়ে থাকি। এখন আপনারা বলুন, এ মসজিদটি কে প্রস্তুত করেছিলেন? লোকজন উত্তর প্রদান করল, এটি সুজা বাদশাহ প্রস্তুত করেছিলেন।

প্রশ্ন: কি উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল?

উত্তর: সালাত পড়ার জন্য।

প্রশ্ন: এ মসজিদ কতদিন আগে তৈরি করা হয়েছে?

উত্তর: শত শত বছর অতীত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন: এ মসজিদে মিম্বার কি উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে?

উত্তর: খোতবা পাঠ করার জন্য।

প্রশ্ন: খোতবা কখন পাঠ করা হয়?

উত্তর: জুম'আর নামাজের সময়।

তখন মাওলানা সাহেব বললেন, তাহলে মনে হয় এ মসজিদ পুরাতন প্রস্তুত এবং মিম্বারও বহুদিনের পুরাতন। এমনকি জুম'আ পড়ার চর্চা এবং প্রচলনও বহুদিনের। তবে কেবল মধ্যখানে কিছুদিনের জন্য লোকজন অবহেলা করে জুম'আর সালাত পাঠ ছেড়ে দিয়েছিল যা আমি পুনরায় প্রচলন করে থাকি মাত্র। আমি পুরাতন কথা মনে করে দিয়ে থাকি মাত্র। তৎপর তিনি বললেন, দেখুন, আমি শত শত বছরের পুরাতন বিষয়টি পুনরায় প্রকাশ করে থাকি এবং ভুলে যাওয়া মাসয়ালাকে স্মরণ করে থাকি মাত্র। আমার কথা নতুন নয়, বরং পুরাতন ও বহুদিনের। মাওলানা সাহেবের এরকম সহজ ও আকর্ষণীয় দলিলের ফল সাধারণের মধ্যে ভাল ভাবেই দেখা দিল এবং অসংখ্য লোক জুম'আ আদায় করতে আরম্ভ করল। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা বর্ণনাকারী কুমিল্লার ময়নামতি নিবাসী মরহুম মুনসী আল্লাহ বখস সাহেব। তিনি মাওলানা কারামত আলী সাহেবের কথা প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের নিকট বর্ণনা করেছেন। মুনসী সাহেব ঐ সময় স্বয়ং সুজা বাদশার মসজিদে উপস্থিত ছিলেন।"[৩৫৩]

জৌনপুর প্রত্যাবর্তন

জনাব মাওলানা সাহেব আঠার বছর ধরে ভ্রমণ করে আসাম পর্যন্ত পৌছে তা সমাপ্ত করেন। অতঃপর আত্মীয় সজন সহকারে নিজ আবাসভূমি জৌনপুরে উপস্থিত হন এবং স্বীয় মাননীয় পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম, মোসাফাহ ও কোলাকুলি করার পর সৌভাগ্যশালী হন। মাওলানা সাহেবের মাননীয় পিতা মৌলবি আবু ইবরাহিম শেখ ইমাম বক্স

৩৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৮০-৮২

সাহেব এ সময় সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিজ করনীয় কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন যে, কোন কোন লোকের নিকট এটি খুবই আশ্চর্য বোধ হয়েছিল যে, জনাব সৈয়দ সাহেব মাওলানা কারামত আলী সাহেবকে প্রথম সপ্তাহেই বলে দিয়েছিলেন যে কার্য সিদ্ধি হয়ে গেছে। এখন হেদায়েতর কাজে লেগে যাও। অতঃপর আঠার দিন পরে অনুমতি ও খেলাফত প্রদান করত বিদায় দান করেন এবং জিহাদে যাওয়ার সময় তার ওপর বাংলাদেশের তাবলিগের ভার অর্পণ করে যান। মাওলানা সাহেব ও তার (সৈয়দ সাহেবের) আদেশানুসারে কাজে লেগে যান। এখন বলুন, তার (কারামত আলী সাহেবের) ভ্রমণকাল কতদিন হয়েছে এবং কতকাল পরে ফিরে এসে সমবেত লোকদের সাথে মিল হয়েছে। উপস্থিত লোকজন বললেন যে, মাওলানা সাহেব আঠার বছর পরে আল্লাহর রহমতে পরিবার ও সন্তানাদির এক জামা'আত সহকারে বাড়ি ফিরেছেন। তখন মাওলানা সাহেবের পিতা বললেন, এখন দেখুন সৈয়দ সাহেবের ফয়েজ ও বরকতের ফলস্বরূপ এক এক দিন পূর্ণ বছরের তাবলিগের ক্ষমতা রাখে। এটি প্রত্যক্ষ যে, প্রিয় বন্ধু-বান্ধবগণ আমাকে বলেছিল আপনি মাওলানা সাহেবকে লেখেন যে বহুদিন অতীত হয়েছে এবং মাওলানা সাহেব জৌনপুরের কথা ভুলে এবং আশেপাশের মুরিদগণ আশা ও নিরাশার মাঠে অবস্থান করতেছে। কিন্তু আমি কখনও তাকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করিনি। আঠার বছর পরে যখন মাওলানা সাহেব জৌনপুর আগমন করেন। চারদিক হতে ভক্তগণ ও মুরিদদের জনকোলাহল হতে লাগল। শহরের চারদিকে এবং আজমগড়, গাজীপুর, ফয়জাবাদ ও সুলতানপুর ইত্যাদি জেলা সমূহে ভ্রমনের ইচ্ছা করলেন এবং এসকল জেলার তাবলিগের কাজ পূর্ণভাবে আদায় করেন। মাওলানা সাহেবের বাংলাদেশে প্রথম ভ্রমনের পর আরও তিন চারবার আত্মীয় পরিজন সহকারে দীর্ঘকালের জন্য বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালার রহমতে মাওলানা সহেব প্রত্যেক বার তার শুভ আকাঙ্ক্ষা ইসলাম প্রচারের কাজে কৃতকার্যতা লাভ করেন এবং হেদায়েতের আলো দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মাওলানা সাহেব বাংলাদেশে তাবলিগ ও পর্যটনের কাজ ৫১ বছর পর্যন্ত চালিয়েছিলেন। বাংলাদেশে যাওয়ার আগে মাওলানা সাহেব ইউ পির কতক জেলায় তাবলিগের কাজ করেছিলেন। ওয়ায করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিতাব প্রণয়ন ও সংকলনের কাজও সমাধা করেছিলেন। জৌনপুরের পুরাতন লোকদের নিকট হতে জানা গেছে যে, একবার মাওলানা সাহেব পূর্ব বঙ্গ হতে বোট যোগে আত্মীয় সজন সহকারে জৌনপুরে উপস্থিত হন। সামুদ্রিক দীর্ঘ ও কঠিনাতিক্রমপূর্ন রাস্তা অতিক্রমকালে বিহার প্রদেশে উপস্থিত হয়ে এ প্রদেশের জেলা সমূহের লোকজনকে সুমধুর ওয়ায দ্বারা বাধিত করেছিলেন। খুব সম্ভব এ ভ্রমণকালেই পাটনার মৌলবি আবুল হাসান সাহেবের সাথে তার বহস হয়ে থাকবে। জৌনপুরবাসীদের জন্য বোট একটি আশ্চর্য বস্তু ছিল। কারণ এর আগে আর কেউ বোট দেখেনি। যখন বোট জৌনপুরে পৌছাল, তখন বহুদূর হতে মুসলিম ও অমুসলিম সেটিকে দর্শন করার জন্য আসতে লাগল। সব সময়েই লোকের ভীড় জমে থাকে এবং এ আশ্চর্যজনক বস্তু দেখে লোকজন আনন্দিত হত।"[৩৫৪]

মাওলানা সাহেবের ইন্তেকাল, একটি বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান

মাওলানা কারামত আলীর জীবন ছিল বৈচিত্রময় এবং মহিমান্বিত। শৈশবে যে বয়সে ছেলেরা আনন্দ উল্লাস এবং খেলাধুলা করে বেড়ায়, তিনি ছিলেন এর বিপরীত। ছেলেবেলায় তিনি মুরুব্বীদের সাথে উঠা বসা করতেন এবং তাদের কথা শুনতেন। বাবার সান্নিধ্যে ও তত্ত্বাবধানে অল্প বয়সে আলী জৌনপুরী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে আমল আখলাক ও ধর্মীয় অনুশাসনে নিজেকে শরিয়তের পাবন্দ করেন। উর্দু, আরবি ও ফার্সি ভাষায় তার পান্ডিত্য ছিল অতি গভীর। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কারামত আলী বিভিন্ন ভাষায় ৪৬ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ৪২টির নাম

৩৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৯২-৯৩

পাওয়া গেছে যার অধিকাংশ উর্দু ভাষায় রচিত। এগুলো হাদিস, ফিকাহ, শরিয়াহ, মাসলা, মাসায়েল এবং তাসাউফ বিষয়ক। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্বারী ও নিপুণ হস্তলিপি বিশারদ। আরবি কিতাব ও কুর'আন তিনি নিজ হাতে লেখতেন। তার লিখিত অনেক পান্ডুলিপি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট তার্কিক। যখনই ধর্মীয় কোন জটিল বিষয়ে আলেম ওলামাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত তখনই যুক্তি তর্ক বা বাহাস এর মাধ্যমে তার ভিন্ন মতাবলম্বীদের মোকাবেলা করতেন এবং আল্লাহর রহমতে প্রতিবারই জয়ী হতেন। যুদ্ধ বিদ্যায়ও তার পারদর্শিতা ছিল। তার চিন্তা ছিল সুদুরপ্রসারী। A.B. Millich তার প্রণীত বই British Policy and Muslim in Bengal (Dacca, 1961) এর ১০১ পাতায় মন্তব্য করেন যে-মাওলানা কারামত আলী জিহাদে অংশ গ্রহণ না করলেও বালাকোট বিপর্যয়ের আগ পর্যন্ত তিনি এ সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। জীবনের ৭৫ বছরের মধ্যে ৫৭ বছর তাবলিগের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করার সাথে সাথে তার সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। সন্তানদের জন্য কোন ঘর বাড়ি টাকা পয়সা কিছুই রেখে যাননি। হাদিয়া হিসেবে যে অর্থ পেতেন তা দিয়ে বোটে ভাসমান মাদ্রাসার খরচ চালাতেন এবং গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতেন। মৃত্যুর তিন দিন আগে তার জ্যেষ্ঠ ছেলে হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদকে রংপুর থেকে জৌনপুরের ঠিকানায় লিখিত একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, বেটা তোমরা একথা ধারণা করোনা যে, তোমাদের বাবা লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়েছেন, অথচ তোমাদের জন্য কিছুই রেখে যান নি। আমি তোমাদের জন্য ইলম ও কিতাব রেখে যাচ্ছি। এটাই আমার মিরাস। হেদায়েতকালে তার অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার জন্য পরবর্তীতে আলী জৌনপুরী থেকে তিনি কারামত আলী জৌনপুরী নামে পরিচিতি লাভ করেন। কারামত আলী জৌনপুরী ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংস্কার আন্দোলনে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। নেংটি পরিহিত লোকদেরকে বিনা মূল্যে কাপড় দিয়ে সভ্য করেছিলেন। বাংলার গ্রামে গঞ্জে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সংস্কার করতে গিয়ে মাওলানা সাহেব অনেক সময় উপোস থেকেছেন। এমনকি তার জীবন হয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি। বরিশালে কয়েকবার তার বোটে আক্রমণ করা হয়েছিল। তারপরও তিনি সত্য প্রচারে ক্ষান্ত হননি। দীর্ঘ ৫৭ বছর তাবলিগের প্রচারে ক্লান্ত মাওলানা রংপুর শহরে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১২৯০ হিজরীর ২রা রবিউসসানী/১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সুবহে সাদিকের সময় ফকির হযরত মাওলানা কারামত আলী (র.) ইহধাম ত্যাগ করেন। রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ায় পুরাতন জামে মসজিদের ভেতর আল্লাহর এ অলির মাজার অবস্থিত। তার স্ত্রী মোসাম্মৎ বাতুল বেগম, দুই ছেলে শাহ মোহাম্মদ উমর ওরফে বড় মিয়া ও আব্দুল আউয়াল, দুই মেয়ে আয়শা ও হাযেরা এবং জামাতা মওলানা মুসলিহ উদ্দিন তার মৃত্যু শয্যার পাশেই ছিলেন। মরহুম মাওলানা সাহেবের ওফাতের দুমাস পর মাওলানা আব্দুল আউয়ালের মা রংপুরেই ইন্তেকাল করেন। মাওলানা কারামত আলী সাহেবের মাজারে পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। জনাব এইচ এম হায়দার আলী (পারভেজ) বর্তমানে কারামত আলী মসজিদ ও মাজারের মোতাওয়াল্লি। রংপুর মুন্সীপাড়া আজ একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দেশ বিদেশ থেকে আগত হিন্দু মুসলিম বহু লোকের গমনাগমন হয় এ মাজার প্রাঙ্গণে। রংপুর মুন্সিপাড়ায় একটি কারামতিয়া হাইস্কুল, কারামাতিয়া একাডেমি, হাফেজিয়া ও এবতাদায়ি মাদ্রাসা আছে। মরহুম মাওলানা কারামত আলী (র.) এর সাদামাটা মাজারটি দেখলে শুধু একটি কথাই বারবার মনে জাগে "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান।"[৩৫৫]

৩৫৫. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬-৩৭

ছেলে মেয়েদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর মোট ছয় ছেলে ও নয় মেয়ে ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

মরহুম হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরে প্রথম বিয়ে করেন। তার প্রথম স্ত্রীর নাম মোসাম্মৎ জয়নব বিবি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ঘরে তিন ছেলে ও ছয় মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেরা হচ্ছেন- হাফেজ আব্দুল্লাহ, হাফেজ আহমদ, হাফেজ মাহমুদ। মেয়েরা হচ্ছেন- উম্মে কুলসুম, উম্মে সালমা, উমদা বিবি, সুগরা, যোহরা, মুনা। মরহুমা জয়নব বিবিকে জৌনপুর মোল্লাটোলায় পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশে হেদায়েতকালে মাওলানা সাহেব লক্ষ্মীপুর দায়রা বাড়িতে মরহুম আজিম শাহের মেয়ে আসমাতুন্নেসাকে বিয়ে করেন। উল্লেখ্য যে, মরহুম আজিম শাহ হযরত দায়েম উল্লাহ (র.) এর খলিফা ছিলেন যার নামানুসারে ঢাকার আজিমপুর নামকরণ হয়। আসমাতুন্নেসা এর ঘরে মওলানা হামিদ সাহেব এবং কন্যা মাসুমা খাতুন জন্মগ্রহণ করেন। মরহুমা আসমাতুন্নেসাকে লক্ষ্মীপুর দায়রাবাড়ির কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা কারামত আলী সাহেব ভারতের আজমগড়ে মোসাম্মৎ বাতুল বেগমকে বিয়ে করেন। সে ঘরে দুই ছেলে শাহ মুহাম্মদ উমর ওরফে বড় মিয়া ও মওলানা আব্দুল আউয়াল এবং দুই কন্যা মোসাম্মৎ আয়েশা ও হাযেরা জন্মগ্রহণ করেন। মরহুমা বাতুল বেগমকে রংপুর শহরের মুন্সীপাড়ায় পুরাতন জামে মসজিদের ভেতর মরহুম হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়।

হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেব, মাওলানা কারামত আলী সাহেবের প্রথম সন্তান, ১৮ বছর বয়সে বাবার জীবিতকালেই জৌনপুর মোল্লাটোলায় ইন্তেকাল করেন। তথায় পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব ১২৫০ হিজরী কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব বয়সে বাবার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা, কুর'আন হেফ্জ ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পর হিন্দুস্তানের বিখ্যাত আলেম মুফতি মোহাম্মদ ইউসুফ লক্ষ্মৌবী এবং মাওলানা আব্দুল হালিমের কাছে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন জৌনপুর হানাফিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছিলেন। পিতা মওলানা কারামত আলী (র.) এর জীবনকালেই তিনি হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মাওলানা কারামত আলী সাহেবের ওফাতের পর পরিবারের বড় ছেলে হিসাবে ছোট ভাই বোনদের অভিভাবক হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। হেদায়েতকালে হাদিয়া তোহফা হিসাবে যে অর্থ পেতেন গোটা পরিবারের ব্যয় মিটানোর পর অবশিষ্ট অর্থ অভাবী গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তার জীবিতকালে তার ছোট ভাই মাওলানা হাফেজ মাহমুদ সাহেব ১২৯৬ হিজরীতে জৌনপুর মোল্লাটোলায় ইন্তেকাল করেন। ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর তার ছেলে মওলানা আব্দুর রব সাহেব চাচা হাফেজ আহমদ সাহেবের কাছে বোটে থেকে ইলম হাসিল করেন। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে জৌনপুর পাঠানো হয়। বহুদিন বাংলাদেশে অবস্থানের পর মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব জৌনপুর ফিরে যান এবং হজ্ব পালন করে জৌনপুর থেকে পুনরায় বাংলাদেশে আগমন করেন। হেদায়েতকালে তিনিও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। ১৩১৬ হিজরীর ৬ রমজান বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে ঢাকার সদরঘাটে মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব জৌনপুরী (র.) নিজ বোটে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা শহরের চকবাজার শাহী মসজিদের পাশে মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (র.) এর মাজার অবস্থিত। মৃত্যুর সময় ভাতিজা মওলানা হাফেজ আব্দুর রব জৌনপুরী তার শয্যাপাশে ছিলেন। ৭ রমজান জুম'আর নামাযের পর মরহুম মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (র.) এর পাগড়ি মোবারক মুরিদ মওলানা হাফেজ আব্দুর রব সাহেব এর মাথায় পরিয়ে দেন এবং তাকে গদিনশীন ঘোষণা করেন।

মওলানা হাফেজ মাহমুদ সাহেব ১২৫৫ হিজরী জৌনপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার অবর্তমানে তিনিও পরিবারের ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা দীক্ষার তত্ত্বাবধান করতেন। বাংলাদেশে ও জৌনপুরের আশে পাশে তিনি তাবলিগের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মাত্র ৪১ বছর বয়সে ১২৯৬ হিজরীতে মওলানা হাফেজ মাহমুদ জৌনপুরী (র.) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জৌনপুর মোল্লাটোলায় ইন্তেকাল করেন। তার মাজার জৌনপুর মোল্লাটোলায় অবস্থিত।

মওলানা হামিদ সাহেব ১৮৬৩ সালে লক্ষ্মীপুর দায়রা বাড়িতে অর্থাৎ নানার বাড়ি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি বাবার সাথে জৌনপুরে আসতেন। বাবার ওফাতের পর তার বড় ভাই মওলানা হাফেজ আহমদ তাকে লেখা পড়ার জন্য জৌনপুরে নিয়ে আসেন। মওলানা হাফেজ মাহমুদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে তিনি জৌনপুরে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মওলানা মাহমুদ সাহেবের ইন্তেকালের পর মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব তাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। মওলানা হামিদ সাহেব জৌনপুরী মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরীর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন কামেল ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি সাদুল্লাহপুর মওলানা ইমাম উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে তার বোন মাসুমার কাছে থাকতেন। তথায় মওলানা হামিদ সাহেব প্রথম বিয়ে করেন। ঐ ঘরে কোন সন্তান হয়নি। পরে তিনি নোয়াখালীর নসুয়া নিবাসী প্রখ্যাত কারী রায়হান উদ্দিন ও সৈয়দা জোবায়দার মেয়ে নাজমুন্নেসা বেগমকে বিয়ে করেন। ক্বারী সাহেবদের জায়গা জমিন নিলাম হওয়ার উপক্রম হলে তার মুরিদগণ সেখানে জায়গা খরিদ করে ঘর বাড়ি তৈরি করে দেন, যা সনুয়া মাওলানা সাহেবের বাড়ি নামে সুপরিচিত। তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরিবার পরিজন সহ তিনি ঐ বাড়িতেই ছিলেন। ৬৩ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে মাওলানা হামিদ সাহেব জৌনপুরী (র.) তার নিজ বাড়ি সনুয়ায় ইন্তেকাল করেন। তথায় তার মাজার অবস্থিত। মাওলানা হামিদ সাহেবের পাচ ছেলে ও পাচ মেয়ে ছিল। ছেলেগণ হচ্ছেন মরহুম মাওলানা সালাহ উদ্দিন সিদ্দিকী, মরহুম মাওলানা আব্দুল মুকিত সিদ্দিকী ও মাওলানা বাকের সিদ্দিকী এবং মেয়েরা হচ্ছেন মরহুমা জাকিয়া খাতুন। মরহুমা খাদিজা খাতুন, মরহুমা ফাতেমাতুল বতুল, মরহুমা আমাতুন নাবুয়্যাত ও মরহুমা আতিকা খানম। নোয়াখালী জেলার নসুয়া গ্রামে মওলানা সাহেবের বাড়িতে মরহুম মওলানা শাহ কারামত আলী (র.) এর বংশধরগণ বাস করছেন এবং বংশানুক্রমে তারা হেদায়েতের কাজ করে আসছেন।

শাহ মুহাম্মদ উমর সাহেব ওরফে বড় মিয়ার জন্ম ও মৃত্যুকাল সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায়নি। তিনি ছিলেন মাজযুব এবং সরল সোজা প্রকৃতির। তার কিছু মনে থাকত না। তিনি সব সময় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি তার বড় ভাই মওলানা হামিদ সাহেব এর কাছে সনুয়ায় থাকতেন। হঠাৎ করে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। সনুয়া থেকে নোয়াখালী জেলার বামনীতে তিনি প্রায়ই চলে আসতেন। নোয়াখালীর লোকেরা তাকে খুব ভক্তি করত। মওলানা কারামত আলী (র.) তার এ ছেলে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলতেন যে, আমার পুত্রটি দয়ার পাত্র। তার বিষয়ে বড় ছেলে হাফেজ আহমদ সাহেবকে তিনি বলতেন বৎস, আমার এ মাজযুব ছেলেটির প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখো। উল্লেখ্য যে, মওলানা কারামত আলী (র.) হজে যাওয়ার সময় উমর সাহেবকে সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং হজ করিয়ে এনেছিলেন। তার মাজার সনুয়া মাওলানা সাহেবের বাড়ির মসজিদের পাশে অবস্থিত।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব ১২৮৩ হিজরী/১৮৬৬সালে সন্দীপে বোটে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা কারামত আলী (র.) এর ছেলেদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন এবং সেখানে দুবছর অবস্থান করেন। উর্দু ও আরবি ভাষায় তার প্রখর জ্ঞান ছিল। তিনি হাদিস, ফিকহ, শরিয়াহ এবং মাসলা মাসায়েলের ওপর ১২১টি বই রচনা করেন। তন্মধ্যে ৬৩টির তথ্য ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ তার রচিত 'মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (র.)' শীর্ষক বইতে পাওয়া যায়। জীবনের ৫৫ বছরের

মধ্যে ৩৩ বছর ইসলাম প্রচার ও বই প্রকাশনার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী (র.) ১৩৩৯ হিজরী ১২ শাওয়াল/১৯২১ সালে ১৮ জুন কলকাতা শহরে ইন্তেকাল করেন। কলকাতা শহরের মানিক তলায় তার মাজার অবস্থিত।"[৩৫৬]

মাওলানা সাহেবের আকৃতি, শারীরিক গঠন

"মাওলানা সাহেব লম্বা ছিলেন। চক্ষুদ্বয় বড় বড়, বিস্তৃত ললাট, দীর্ঘ এবং প্রশস্ত নাক, পাতলা ঠোট ও লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। মাথার কেশ দীর্ঘ কানের লতি পর্যন্ত ছিল। তিনি মাথার চুল দাড়িতে মেন্দির খেজাব ব্যবহার করতেন। তার শরীর একহারা বান্দের ছিল। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সাত প্রকার ও উচ্চ শ্রেণীর সুলেখক ছিলেন। তিনি নিজ হাতে বই ও মূল্যবান কুর'আন শরিফ লেখেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু আরবি, ফারসি ও উর্দু, এবং পাঠ্য পুস্তক লেখে গেছেন।"[৩৫৭]

"মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর সেকেল ও সুরত ছিল জ্যোতির্ময়। তিনি লম্বা প্রকৃতির ছিলেন। চক্ষুদ্বয় ছিল বড়। বিস্তৃত ললাট, দীর্ঘ ও প্রশস্ত নাক, পাতলা ঠোট আর মুখ মন্ডল ছিল লম্বা শ্মশ্রুযুক্ত। মাথায় ছিল বাবড়ি চুল। শ্মশ্রু ও চুলে মেহেদীর খেজাব ব্যবহার করতেন। মাথায় পাগড়ী পড়তেন। লম্বা জামা পড়তেন। পায়জামা গিরার ওপর পরিধান করতেন। কখনো মোজা ব্যবহার করতেন না। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। খুব কম খেতেন এবং কম ঘুমাতেন। হালাল সব কিছুই খেতেন। ফলের মধ্যে আম ছিল তার প্রিয়। আমের মৌসুমে প্রচুর আম রাখা হত। ঘি আর চিনি দিয়ে আমের হালুয়া তৈরী করে রাখা হতো যা আমের মৌসুমের পরে খেতেন। তিনি খুব পান খেতেন।"[৩৫৮]

অভ্যাস ও স্বভাব

মাওলানা সাহেবের স্বভাব ইসলামি তেজ ও ইমানের জোশে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইমাম আজম হযরত আবু হানিফা (র.) এর মাজহাবলম্বী ছিলেন। তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের পর ফজর পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালার জিকিরে মশগুল থাকতেন। ফজরের নামাজের পরে এশরাকের নামাজের সময় পর্যন্ত মুরিদানসহ মোরাকাবা করতেন। তার জিকিরের সভায় বহু লোক উপস্থিত থাকত। এরপর ছাত্রদেরকে তাজবিদ সহকারে কুর'আন শরীফের কিরাত শিক্ষা দিতেন। এটির পর চা পান করে কিতাব প্রণয়ন কাজে লিপ্ত হতেন এবং খানা খাওয়ার পর দ্বিপ্রহরের সময় একটু কায়লুল (বিশ্রাম) করতেন। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী জোহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্ত ও এশার সালাত বিলম্বে আদায় করতেন। তিনি সর্বদাই মসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করতেন এবং এশার সালাত আদায়ের পর খাওয়ার কাজ শেষ করে কিতাব লেখা ও কিতাব দেখার কাজে নিমগ্ন হতেন। তিনি রাতে খুব অল্পই নিদ্রা যেতেন এবং সামান্য বিশ্রামের পর তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য জাগরিত হতেন। তিনি বেশিরভাগ সময় অজু সহকারে থাকতেন। তিনি রাসূলুল্লার সুন্নাতের বিশেষ অনুসারী ছিলেন। এমনকি দৈনিক পাচবার অজুর আগে মেসওয়াক করতেন এবং কুলুখ ঢিলা ব্যবহার করতেন। পাগড়ি ব্যবহার করতেন ও পায়জামা গিরার উপরে পরিধান করতেন। কখনও মোজা ব্যবহার করতেন না। সব সময়ই হাতে তসবীহ রাখতেন ও পাঠ করতেন। তার পানের প্রতি খুব

---

৩৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮-৪১

৩৫৭. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬

৩৫৮. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

আশক্তি ছিল এবং হুক্কাকে ঘৃণা করতেন। হুক্কার বিষয় তিনি বলতেন যে, সেটি ত্যাগ করাই উত্তম। মাগরিবের পরে তিনি কিরাত মশক করাতেন। ইলমে কিরাতে তার হাজার হাজার ছাত্র ছিল। তিনি সাত কিরাতে কুর'আন শরিফ পাঠ করতেন। প্রথমতঃ তিনি পাঠ্য পুস্তক পড়াতেন। এরপর ইলমে তজবীদ পড়াবার পর জিকির ও মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন। তার খোরাক খুব অল্প ছিল এবং খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি করতেন না। তার অল্পেই পরিতুষ্ট ছিল। যেকোন রকমের খাদ্যই তার সামনে উপস্থিত করা হত। তিনি সেটি শুকরের সাথে খেয়ে ফেলতেন। আম খাওয়ার প্রতি তার বিশেষ স্পৃহা ছিল। আমার বড় ফুফী সাহেবা বলতেন যে, আমের মৌসুমে তার জন্য আমের ব্যবস্থা থাকত। যা তিনি খাওয়ার পর খেতেন। আমের মৌসুম শেষ হয়ে আসলে ঘৃত এবং চিনির দ্বারা আমের হালওয়া তৈয়ার করে নিতেন এবং কিছুদিন পর্যন্ত সেটি খেতেন। তার সিল মোহরের মধ্যে 'আলী জৌনপুরী' শব্দ খোদাই করেছিলেন। তার প্রণীত কিতাবগুলোর মধ্যে খাকসার আলী জৌনপুরী প্রসিদ্ধ 'কারামত আলী জৌনপুরী' এমন লিখতেন। তার আরবি লেখার পদ্ধতি মোহাদ্দেসিনদের মত সরল, সহজ এবং সাধারণের বোধগম্য এবং পছন্দনীয় ছিল। কেননা, তার লিখিত গ্রন্থ মেলাখখাছ নাসিমুল হারামাইন, বারাহিনে কাতেয়া, মিলাদে খায়রুল বারিয়া ইত্যাদি দেখলেই সেটি সম্যক অবগত হওয়া যাবে।[৩৫৯]

মাওলানা সাহেবের 'সনদের' বর্ণনা

মুহাদ্দিস ও কারিয়ে কুর'আন এবং তরিকার পীরগণের চিরাচরিত নিয়ম এ যে, তারা নিজ নিজ ধারাবাহিক সনদ সমূহ সাবধানে রক্ষা করে থাকেন। এ আবশ্যকীয় স্মরণ লিপির মধ্যে বিশ্বাস ও বরকত উভয় প্রকারের উপকরণ নিহিত রয়েছে। কাজেই মোহাদ্দেসিন ও কারীগণ আপন ছাত্রদেরকে এবং তরিকার পীরগণ আপন মুরিদদের শিক্ষা লাভ শেষ হলে ধারাবাহিক পবিত্র সনদ দান করে থাকেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব তার তরিকার পীর কেবলার নিকট হতে তরিকার যে সনদ লাভ করেছিলেন সেটি তার খেলাফত ও শাজরা নামায় বহুবার ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন। তদ্রূপভাবে মাওলানা সাহেব হাদিস ও কুর'আন পাকের ধারাবাহিক সনদ ওস্তাদদের নিকট হতে লাভ করেছিলেন। তাদের বিস্তৃত বর্ণনা ওস্তাদদের নামসহ 'জখিরায়ে কারামত' ১ম খণ্ডে 'মোকাশেফাতে রহমত' নামক রেসালায় উল্লেখ করা হয়েছে। মাওলানা আহাম্মদ উল্লাহ ইবন দলিলউদ্দিন সিদ্দিকি সাহেবের নিকট হতে মাওলানা সাহেব হাদিসের সনদ লাভ করেছিলেন। ইমাম তিরমিজি পর্যন্ত সমস্ত মুহাদ্দিসিনের নাম ধারাবাহিক রূপে লেখে গেছেন এবং ইমাম তিরমিজি হতে আরম্ভ করে হযরত মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকলের নাম তিরমিজির কিতাবে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা সাহেব এবং ইমাম তিরমিজির মধ্যে মাত্র ১৮ পুরুষের দূরত্ব। অতঃপর মাওলানা সাহেবের কুর'আন শরিফ পাঠের সনদ মাওলানা আহাম্মদ উল্লাহ সাহেবের নিকট হতে আরম্ভ করে হযরত উবাই ইবন কাব পর্যন্ত পৌছেছে। হযরত মোহাম্মদ (স.) এর নিকট হতে কুর'আন শরিফ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কুর'আন পাঠের মধ্যে হযরত মাওলানা সাহেব ও হযরত মোহাম্মদ (স.) এর মধ্যে ৩০ পুরুষ ব্যবধান মাত্র। চিশতিয়া তরিকার দিক দিয়ে মাওলানা সাহেব ও হযরত মোহাম্মদ (স.) এর মধ্যে ৩৪ পুরুষ ব্যবধান। তরিকায়ে কাদেরিয়ার দিক দিয়ে মাওলানা সাহেবের মধ্যে এবং হযরত মোহাম্মদ (স.) এর মধ্যে ৩৬ পুরুষ ব্যবধান এবং তরিকায়ে নকশেবন্দীয়ার মধ্যে ৩৪ পুরুষ ব্যবধান।[৩৬০]

৩৫৯. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭-১০৮

৩৬০. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯-১১০

হযরত সৈয়দ সাহেবের ফযিলত সম্বন্ধে মাওলানা সাহেবের উক্তি সমূহ

হযরত মাওলানা সৈয়দ সাহেব বেরলবীর ফযিলত ও মর্তুবা বিষয় তার প্রণীত কিতাবসমূহে অনেক কিছু লেখেছেন। ঐসকল ফযিলত হতে সামান্য কিছু পাঠকদেরকে বরকত-স্বরূপ উপহার দিচ্ছি। এ সমুদয় হতে আপনারা সৈয়দ সাহেবের উচ্চ দরজা ও মহান ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করতে পারবেন। অপরপক্ষে মাওলানা সাহেবের তার মোর্শেদে কামেল এর সাথে কেমন মহব্বত ও ভালবাসা ছিল এটিও জানা যাবে। মাওলানা সাহেব সৈয়দ সাহেবকে মোজাদ্দিদে জামান বলে প্রকাশ করতেন। নিম্নলিখিত বাক্যাবলির দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। তিনি বলেন, "ধর্মীয় ব্যাপারে যখন নানা প্রকার অবিচার আরম্ভ হয়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা ধর্মকে শক্ত ও মজবুত করার জন্য এমন এক ব্যক্তি প্রেরণ করে থাকেন, যার মধ্যে অলৌকিক সাহায্য ও শক্তি বর্তমান থাকে। অতএব এ যুগের মোজাদ্দিদ ও সাহেবে তরিকা হচ্ছেন আমিরুল মুমিনীন হযরত সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব। তিনি ধর্মকে নবজীবন দান করেছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন, "মুর্শেদে বরহক সাহেব হযরত মোজাদ্দিদে আলফে সানির (র.) হুবহু অনুসরণ করে এ তরিকার নুর লাভ করেছেন। এমনকি আল্লাহ তা'য়ালা তাকেও মোজাদ্দিদে সাহেবে তরিকা করেছিলেন এবং তার তরিকাকে আলোকিত করেছিলেন।"

অপর এক জায়গায় তিনি লেখেছেন, একদিন আমি আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আব্দুল হাই (র.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর, আপনি মিয়া সাহেবের[৩৬১] ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা রাখেন, এবং টাকা পয়সা পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করে মিয়া সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এমনকি আপনার পরিধানের পোশাক ব্যতীত অতিরিক্ত পোশাক পর্যন্ত নেই। আর আপনি যখন মিয়া সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তখন ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সত্য করে বলুন, আপনি মিয়া সাহেবের নিকট হতে কি লাভ করেছেন? এতে মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব বললেন- ইনশাআল্লাহ আমি সত্য কথা বলব। শ্রবণ করুন, সুলুক ইলাল্লাহ ও মোসাহেদ হাসিল করার জন্য খুব আগ্রহান্বিত ছিলাম। তখন আমি হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেবের নিকট আরজ করলাম। হুজুর, আপনি আমাকে সুলুকে ইলাল্লার শিক্ষা দান করুন। এর আগে আমি বহু হিন্দি এবং বেলায়েতি পীরের নিকট হতে তাওয়াজ্জাহ গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হয়নি। অতঃপর তিনি আমাকে হযরত শাহ গোলাম আলী সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে আমি কিছুদিন তাওয়াজ্জাহ গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু আমার আকাঙ্খা পূর্ণ হল না। অবশেষে আমি হযরত মাওলানা সাহেবের খেদমতে আরজ করলাম। হুজুর, এ খাদেম আপনার তাওয়াজ্জাহের প্রত্যাশী, আর হুজুর আমাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। আপনি নিজেই আমাকে শিক্ষা দেন। হযরত মাওলানা সাহেব বললেন, মিয়া আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমি বহুক্ষণ বসে থাকতে অক্ষম। তোমার এ আশা মির আহম্মদ[৩৬২] সাহেবের দ্বারা পূর্ণ হবে। তুমি তার নিকট বয়াত গ্রহণ কর।

তখন তার এ আদেশ আমার ওপর কঠিন বলে মনে হল এবং অসন্তুষ্টচিত্তে বসে রইলাম। অত:পর আরও কয়েক বার অনুরোধ করলাম। কিন্তু ঐ একই উত্তর পেলাম। অবশেষে কিছুদিন পর একটি ঘটনা উপস্থিত হল। আমি, মিয়া সাহেব এবং মিয়া মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব মাদ্রাসার একই ঘরে থাকতাম। একদা রাত্রিতে এশার নামাজের পরে আমরা তিনজনই যখন একটি পালঙ্কের ওপর শয়ন করলাম। তখন মিয়া সাহেব আমাকে বললেন, মাওলানা,

৩৬১. মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব সৈয়দ সাহেবকে মিয়া সাহেব বলে ডাকতেন

৩৬২. মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব সৈয়দ সাহেবকে মির সাহেব বলেও ডাকতেন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে নিজ ফজল ও করমের দ্বারা অবগত করেছেন যে, তুমি অমুক তারিখে অমুক স্থানে মুসাফিরিতে যাবে। অমুক স্থানে এ হবে, অমুক স্থানে ঐ হবে এবং এ পরিমাণ লোক মুরিদ হবে। এভাবে সকল কথাই বর্ণনা করলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ আশ্চর্য ও কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বললেন। এভাবে কয়েক দিন যাবত মক্কা শরিফের ভ্রমণ, জিহাদের ভ্রমণ এবং জিহাদের বিস্তৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আমি ও মিয়া ইসমাইল সাহেব পরামর্শ করলাম যে, যদি এসকল কথাবার্তা বাস্তবিকই সত্য হয়, তবে তিনি একজন মহান ব্যক্তি এবং কুতুব। তার নিকট হতে কিছু ফয়েজ (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) লাভ করা আবশ্যক। অতএব চল, কোন কোন বিষয় তাকে পরীক্ষা করা যাক। তখন মিয়া ইসমাইল আমাকে বললেন, আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি চিন্তা করে কোন এক বিষয়ে পরীক্ষা করুন। অবশেষে মিয়া সাহেব যখন এক প্রহর রাতে ডাকলেন। মাওলানা, তখন আমি অনুরোধ করলাম, হুজুর আপনার বুজুর্গীর বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার এসকল কথা দ্বারা কি লাভ হবে? অনুগ্রহ করে আমাদেরকে বলুন। তখন বললেন, মিয়া মাওলানা কি চাও? তখন আমরা বললাম, হুজুর, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সালাত আদায় করতেন, তদ্রুপ দুই রাকাত সালাত আমাদের দ্বারা আদায় হোক। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিয়া সাহেব একেবারেই চুপ করে গেলেন এবং ঐদিন আর কিছুই বললেন না। এটিতে আমরা বুঝলাম যে, এসকল তার মৌখিক কথা মাত্র। আসল কথার সাথে তার কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু সবসময়ের বন্ধু এবং একত্র বাস করার খাতিরে আমরা কিছুই বললাম না। কারণ এখন শরম দেয়ার কোন আবশ্যক নেই। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। কিন্তু রাত্রি অর্ধেকের কিছু আগে কিংবা পরে হযরত মিয়া ডাকলেন। মাওলানা, তার এ ডাকের সঙ্গেই আমার শরীরের পশমগুলো খাড়া হয়ে উঠল এবং তার প্রতি আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। আমি উত্তরে বললাম, জনাব, তখন তিনি বললেন, যাও এখন আল্লাহর ওয়াস্তে অজু কর। এটিতে আবার আমার শরীরের পশমগুলো দাড়িয়ে গেল। আমি বললাম, খুব ভাল কথা। দুই তিন কদম অগ্রসর হলাম। তিনি পুনরায় ডাকলেন, মাওলানা শ্রবণ কর। আমি ফিরে হযরতের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, তুমি ভাল বুঝেছ, আমি বলেছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে অজু কর। তখন আমি বললাম, খুব ভাল কথা এবং দুই তিন পা অগ্রসর হলাম। তিনি পুনরায় ডাকলেন এবং পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে তিন বার বললেন। তৃতীয়বার গিয়ে আমি অজু করতে লাগলাম। আর অজু এত আদরের সাথে করতে লাগলাম যে আগে আর এত মনোযাগ ও আল্লাহর ভয়ের সাথে কখনও অজু করিনি। অজু শেষ করে আমি হুজুরের সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, যাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এখন দুই রাকাত সালাত আদায় কর। এটিতে আমার শরীরের সূক্ষ্ম লোমগুলো পর্যন্ত দাড়িয়ে গেল এবং নামাজের জন্য চললাম। দুই তিন পা অগ্রসর হলাম। তখন তিনি পুনরায় ডাকলেন এবং আমি তার সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন তুমি ভাল করে বুঝেছ কি না? আমি বলেছি যাও এখন আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকাত সালাত উত্তমরূপে আদায় কর। আমি বললাম খুব ভাল করেই বুঝেছি এবং নামাজের জন্য অগ্রসর হলাম। তৃতীয়বারও ঐ ভাবে ডাকলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি একটি কামরায় গিয়ে সালাত আরম্ভ করলাম। তাকবীরে তাহরীমার সঙ্গে সঙ্গে আমি এত গভীর জালাল অনুভব করতে লাগলাম যে, এটিতে আমি একেবারে ডুবে গেলাম। এমনকি আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং এত বেশি ক্রন্দন করলাম যে, চোখের পানিতে আমার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। নামাজে এত নিমগ্ন হয়ে গেলাম যে, আমি দুনিয়ার কথা ভুলে গেলাম এবং অতি ভীত সন্ত্রস্তভাবে মনোযোগের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম। তখন আমার মনে হল যে নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পাঠ করিনি। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দুই রাকাত নামাজের নিয়ত করলাম। আবার সালাত শেষ করার পর মনে হল যে সুরা ফাতেহার সাথে সুরা মিলিয়ে পাঠ করিনি। আবার সালাত আরম্ভ করলাম। এভাবে প্রত্যেক বার সালাত পড়তে লাগলাম। আর প্রতি বারেই এক একটি ওয়াজিব ত্যাগ করেছি বলে মনে হতে লাগল এবং সালাত অসম্পূর্ণ মনে করে পুনঃপুনঃ পড়তে লাগলাম। এভাবে কত রাকাত সালাত পাঠ করলাম আল্লাহ জানেন। তবে ১০০ রাকাআত হতে কিছু বেশি বা কম হতে পারে। এভাবে সুবহে সাদিক ঘনিয়ে আসল। অক্ষম হয়ে সালাম ফিরালাম এবং অত্যন্ত

লজ্জিত হয়ে ভাবলাম, আমার মানসিক শক্তি কি এতই কম যে মাত্র দুই রাকাত সালাত মনোযোগের সাথে আদায় করতে সক্ষম হলাম না। অথচ এমন একজন কামেল পীরকে আমি পরীক্ষা করলাম। তিনি যদি আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করেন, মিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছ কি? তখন আমি কি উত্তর দিব? যে প্রকার মনোযোগের সাথে সালাত পড়া অবশ্য কর্তব্য সেভাবে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে সক্ষম হলাম না। এসব ভেবে চিন্তা ও লজ্জার সাগরে ডুবে গেলাম। অতঃপর আমার অক্ষমতার কথা স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে লাগলাম। যখন আযান দেয়া হল তখন আমার জ্ঞান হল এবং মনে হল যে সাহাবায়ে কেরামের এ অবস্থাই ছিল। তারা সারা রাত্র আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন থাকতেন আর শেষ রাতে আল্লাহর নিকট আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তেন। তাদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'য়ালা কুর'আন মাজীদে এরশাদ করেছেন যে, 'ওয়াল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার' অর্থাৎ (তারাই শেষ রাত্রিতে গোনাহ মাফ প্রার্থনাকারীগণ)। মনে মনে আরও চিন্তা করলাম যে, তিনি নিশ্চই একজন কামেল লোক। তার আদেশে আমার আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে এবং যে মত দীর্ঘকাল যাবত লাভ করতে পারিনি তা আজ এক মুহূর্তের মধ্যেই লাভ করলাম। অতপর মসজিদে গমন করলাম এবং ফজরের নামাজের আগে আমি মিয়া সাহেবের নিকট বাই'য়াত গ্রহণ করলাম। ফজরের নামাজের পরে আমি মিয়া ইসমাইলের নিকট রাত্রির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। কেননা তিনি আমাকে সত্যবাদী বলে মনে করতেন। তিনিও মিয়া সাহেবের নিকট বাই'য়াত গ্রহণ করলেন। অতঃপর দিবাভাগে আমি হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের নিকট গমন করলাম এবং রাতের ঘটনা ও আমার বাই'য়াতের কথা তার নিকট প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, বারাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ খুব ভাল করেছ। মিয়া আমি তোমাকে এজন্যই বলতাম। মিয়া তুমি কেন মিয়া সাহেবের কামালিয়ত দেখতে চাও? আমি বললাম, হযরত আমি বহু দরবেশের খেদমত করেছি এবং তরিকানুসারে বহু কাজ ও মোরাকাবা করেছি কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হয়নি। হযরত সৈয়দ সাহেবের মুখে একটি মাত্র কথা বলে দিলেন আর আমি আমার আন্তরিক কামনা লাভ করলাম। হযরত এটি কোন তরিকা? তখন তিনি (আব্দুল আজিজ সাহেব) বললেন, মিয়া, এসকল লোকের কোন তরিকার আবশ্যক হয়না। বরং তারা জবানের দ্বারা যা কিছু বলেন সেটিই তরিকা এবং তারা নিজের তরিকার মালিক এবং তারাই তরিকার প্রচলন করেন। মাওলানা সাহেবের কথায় আমার মনে একথা আরও বদ্ধমূল হল যে, সৈয়দ সাহেব নিশ্চই সাহেবে তরিকা। আমার বিশ্বাস আরও গাঢ় হল। একারণেই আমি মিয়া সাহেবের গোলামিতে উপস্থিত হয়েছি। আমি তার গোলামির উপযুক্ত বলে নিজকে মনে করতাম না।

'মোকাশেফাতে রহমত' নামক কিতাবে মাওলানা জৌনপুরী বলেন : "হযরত রাসূলে করিম মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) হযরত সৈয়দ সাহেবকে স্বপ্ন যোগে একটি একটি করে তিনটি খুরমা খাইয়েছিলেন। সৈয়দ সাহেব নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে সেটির তাছির নিজ শরীরে অনুভব করেন। এ ঘটনার পর হতে সৈয়দ সাহেব নবুয়তের রীতিনীতির পথ প্রাপ্ত হন। এটির কিছুদিন পর একদা স্বপ্নে জনাব বেলায়েত মায়াব হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াযহু এবং সাইয়েদাতুন্নেছা হযরত ফাতেমা (রা.) তাকে নিজ হাতে খুব উত্তমরূপে গোসল করিয়েছেন। যেমন নিজ সন্তানকে গোসল করান। অতঃপর হযরত ফাতেমা জোহরা (রা.) তার নিজ হাতে সৈয়দ সাহেবকে এক প্রকার সম্মানিত পোশাক পরিধান করিয়েছেন। এ ঘটনার অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) দ্বয়ের গোসল করানো ও পোশাক পরিধান করানোর দরুন সৈয়দ সাহেব, রাহে নবুয়তের পূর্ণ দরজা লাভ করেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ হতে সৈয়দ সাহেব আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, যদি আপনার হাতে লক্ষ লক্ষ লোকের মুরিদ হয়। তবু আমি তাদেরকে প্রচুরভাবে দান করব।

হযরত সৈয়দ সাহেবের তরিকায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাতেনি বরকত প্রকাশিত হওয়া ব্যতীত একটি জাহেরি বরকত লাভের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা (জৌনপুরী) সাহেব বলেন, যে ব্যাক্তি তার (সৈয়দ সাহেবের) তরিকায় বাই'য়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে, সে আগে থেকেই মুর্তি পূজা, শিরক, বিদ'আত এবং ঢোল বাজনা ও নাচ গান ত্যাগ করতে দৃঢ়তা অবলম্বন করে থাকে। এটিই সৈয়দ সাহেবের তরিকায় প্রবেশ লাভের এ দেশে ইসলামের আলামত (নিদর্শন)।

জানাব সৈয়দ সাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়ার বিষয় মাওলানা সাহেব বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হযরত মোহাম্মদ (স.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি একশত বছরে এমন একজন লোক প্রেরণ করেন, যিনি উম্মতের জন্য ধর্ম প্রচার করে থাকেন এবং কুসংস্কার মুক্ত করেন। এ উম্মতের হেদায়েতর জন্য আল্লাহ কুতুবুল আফতাব, আমিরুল মুমিননিন হযরত সৈয়দ আহমদ সাহেবকে তেরশত শতাব্দীর মুজাদ্দেদ রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ধর্মকে তাজা ও নতুন করে দিয়েছেন এবং অলসদেরকে সাবধান করেছেন। ধর্মীয় বিদ্যার বিস্তার করেছিলেন। আল্লাহর জিকির ও মোরাকাবা এত সহজবোধ্য এবং মোশাহাদা এর হাকিকত এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এমন নেয়ামত বহু বছর হতে লাভ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ হযরতের (সৈয়দ সাহেবের) তরিকার দ্বারা দশ পনের দিনের মধ্যে লাভ হতে থাকে।

ইলমে মারেফাতের প্রসিদ্ধ কিতাব 'জাদুত্তাকওয়া' নামক কিতাবে জনাব মাওলানা সাহেব সৈয়দ সাহেবের মুজাদ্দেদে জামান হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ কতগুলো উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। ঐগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

"হযরত আমীরুল মুমিনীন সৈয়দ আহমদ সাহেব তেরশত শতাব্দীর প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ধর্মকে তাজা জীবন দান করেন। আর এ বিষয় পরবর্তী আলেমগণ ও আরেফগন ভাল করেই জানেন। এমনকি এটি লোকজনের নিকটে বর্ণনাও করে থাকেন। এখানে কয়েকটি আলামত উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেই অবগত হতে পারে। সাধারণ লোকের অবগতির জন্য এটিই যথেষ্ট যে হযরত মুর্শেদে বরহক এ দেশ হতে শিরক, কুফরি চালচলন, কাফেরদের পর্ব ইত্যাদিতে যোগদান এবং বিদাত, ফেছক ফুজুরী হতে পবিত্র করেছেন। এটি পরিষ্কারভাবেই পরিদৃষ্ট হয় যে, হযরত সৈয়দ সাহেবের জন্মের সময় হতে আযান, সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ইত্যাদি শরিয়তের কাজগুলো ভালভাবে প্রচলিত হয়। জুম'আর সালাত জামা'আত এবং সালাতীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে পুরাতন মসজিদগুলো আবাদ হল এবং নতুন মসজিদও প্রস্তুত হল। সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আকিকা প্রদান ও বিবাহের সময় জিয়াফত খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। নাচ গান, আতশবাজি, মাথায় মুকুট পরা, গানবাদ্য ইত্যাদি ধর্ম বিবর্জিত নিয়ম পদ্ধতি এবং কাফেরদের সমতুল্য হওয়াকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। কিন্তু তার (সৈয়দ সাহেবের) প্রকাশ হওয়ার আগে দেশের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, এ ফকির যখন পাচবার অজানের প্রচলন করলেন তখন কোন কোন অশিক্ষত মুসলিম বলত যে, ভোরে ও সন্ধায় আজান শবণ করেছি, কিন্তু দিনের বেলায় কখনও শ্রবণ করিনি। নতুন নতুন কথা বের হয়েছে। আর মসজিদগুলোর এমন অবস্থা ছিল যে লোকেরা সেখানে নাচ করত, হিন্দুদের বরযাত্রী দল একত্রিত হত এবং মদ্য পান করা হত। দেশের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, কোন কোন হাফেজ, কারী, মৌলবি এবং দরবেশ নামধারী লোকজন তাজিয়া প্রস্তুত করত। আর কতগুলো বুজুর্গ নামধারী লোক তাজিয়া দর্শনে অস্থির হয়ে হয়ে ক্রন্দন করত ও সেটি দেখে সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হত।

জনাব সৈয়দ সাহেবের তরিকার দ্বারা হিন্দুস্তান ও বাংলার লোকজন ধর্মপথ লাভ করেছে। সকল লোক শিরক, বিদ'য়াত, ঢোল বাদ্য, নাচ, আতশবাজি, বিবাহকালে মুকুট পরিধান করা, ব্রাহ্মণ পূজা, হুলী, বসন্ত দেয়ালী ইত্যাদিতে আমোদ প্রমোদ করা এবং হিন্দুদের যাবতীয় চালচলন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।"[৩৬৩]

সৈয়দ সাহেবের হানাফী মাযহাবলম্বী হওয়ার বিষয়ে মাওলানা সাহেবের মতামত

বিদ'আতি ও কলহপ্রিয় লোকজন হযরত সৈয়দ সাহেবের তরিকা হতে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখতে ও নানাভাবে ধোকা দিতে আরম্ভ করল। তারা বলতে লাগল যে, সৈয়দ সাহেব এবং তার খলিফাগণ ওহাবী। এ বিষয়ে মাওলানা সাহেব নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

হযরত সৈয়দ সাহেবের দলের লোকদেরকে, যারা প্রকৃত পক্ষে সুন্নতের অনুসারী এবং বিদ'আতের মূল উচ্ছেদকারীদেরকে ধোকাবাজ লোকগণ যারা সুন্নতের বিপরীত এবং বিদাতের প্রিয় হওয়ার দরুন ওহাবী বলে আখ্যা দিতে লাগল। একথা আযাব অপেক্ষাও বেশি কষ্টকর ছিল এবং সেটি তাদের নিরেট মুর্খতা ও অজ্ঞতা স্বরূপ ছিল। কেননা সৈয়দ সাহেবের দলের লোকের অসংখ্য কিতাব বর্তমান রয়েছে। ঐগুলোতে হানাফী মজহাবের কিতাবসমূহ ব্যতীত এবং আহলে সুন্নাত জামা'আতের হাদিস ও তাফসিরের কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। সৈয়দ সাহেবের মতাবলম্বী আলেমদের মধ্যে হাদিসে সিহাহ সিত্তাহ, হানাফি মাযহাবের তাফসির, আকায়েদ, ফিকাহ উসুলে ফিকাহ ইত্যাদি কিতাবসমূহের পাঠদান সর্বদাই দিবারাত্র করে থাকে। উপরোক্ত আলেমগণ সিহাহ সিত্তাহ, আহলে সুন্নাতের মাজহাবলম্বী তাফসির, আকায়েদ ও ফিকার কিতাব এবং তাদের অনুবাদ ছাপিয়ে, কুর'আন মজিদ, হাদিস শরিফের কিতাবসমূহ এবং ফিকার কিতাবসমূহের তরজমা এসকল আলেমগণই করেছেন। তাদের মধ্যে পরহেযগারী অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার ওপর পূর্ণ ভরসা করা, ইলমে মারেফত অনুযায়ী সুন্নতের অনুসরণ, ইলমে তাজবীদের সাথে কিরাত শিক্ষা করা এবং তদানুযায়ী কুর'আন শরিফ পাঠ করা ও শিক্ষা দেয়া, কুর'আন শরিফ হেফজ করা, ছেলেদেরকে কুর'আন হেফজ করানো, সুন্নত মোতাবেক যিকির আযকার ও মোরাকাবা করা, বেশি পরিমাণে দরুদ শরিফ ও দালায়েল খয়রাত পাঠ এবং হিজুবল আজম ও খতমে তারাবিহ, যাবতীয় সুন্নতের প্রচলন এবং বিদ'আত হতে দূরে থাকার প্রচলন তদ্রূপ অন্য লোকের মধ্যে নেই। আর এসকল কথা সূর্যের ন্যায় লোকের নিকট প্রকাশিত ও সত্য। এ কাজকর্ম দ্বারাই আল্লাহওয়ালা ও মোহাম্মদি সুফি এবং হানাফিই বুঝা যায় জানি না যে এসমস্ত কাজকর্মের মধ্যে ওহাবী হওয়ার কি চিহ্ন (নিশান) রয়েছে?

তিনি আরও বলেন : একদিন আমার মুর্শেদে বরহক তার হানাফী হওয়ার বিষয় বর্ণনা করার পর গর্ব সহকারে বলতে লাগলেন, চারজন ইমাম সত্য এবং তাদের ইজতিহাদও সত্য কিন্তু আমাদের ইমাম ইমামে আজম আবু হানিফা (র.) এর ইজতিহাদ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট এতই পছন্দনীয় যে হানাফি লোকদের দ্বারা বড় বড় কাজ করানো হয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেছেন, মুর্শেদে বরহক খেলাফত নামায় তাকলিদ করার আদেশ করেছেন এবং তিনি নিজেও হযরত ইমাম আজমের (র.) মোকাল্লিদ ছিলেন। হযরত মুর্শেদে বরহক নিজেকে হানাফি হওয়ার দরুন গর্ব প্রকাশ করতেন। তার সভায় যখনই হাদিসের কোন কিতাব পাঠ করা হত এবং ইমাম শাফিঈ (র.) এর মাযহাব অনুযায়ী

৩৬৩. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০-১২১

যখন কোন হাদিস পাওয়া যেত, তখনই তিনি বলতেন এ মাসয়ালার বিষয় আমাদের ইমাম আজম (র.) যে হাদিসের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন সেটিও পাঠ কর।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, মুর্শেদে বরহক তার মুরিদদেরকে মোজাদ্দেদে আলফেসানি হযরত শেখ আহাম্মদ সিরহিন্দীর লেখাগুলোর ওপর আমল করার বিশেষ আদেশ ও অসিয়ত করতেন। ফোকাহাদের তাকলিদ করার জন্য জোর তাগিদ দিতেন।

অপর একস্থানে তিনি বলেছেন, এ ফকির একদিন নিজ মুর্শেদে হযরত সৈয়দ আহমদ (র.) এর নিকট আরজ করলাম যে, এমন কতগুলো লোক বের হয়েছে, যারা বলে যে ফিকাহর ওপর আমল করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং হাদিস শরিফের মতে আমল করলেই মুক্তি পাওয়া যায়। এটিতে তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল এবং বললেন ফিকাহর গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোও হাদিস (মুতাওয়াতিরের) মতই বিশ্বাসযোগ্য। তুমি চক্ষু মুদিত করে সেটির ওপর আমল করতে থাক। আমিও সেটির ওপর আমল করি।"[৩৬৪]

তরিকায়ে মোহাম্মদীয়ার বিষয়ে মাওলানা সাহেবের মতামত

বেদাতি ও বিরোধীগণ হযরত সৈয়দ সাহেবের তরিকায়ে মোহাম্মদীয়ার ওপরও নানা প্রকারের সমালোচনা করেছিল। তারা আরও প্রকাশ করল যে, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া এ চারটি তরিকা অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ। আর এ পঞ্চম তরিকায়ে মোহাম্মদিয়ার কি করে কোথা হতে জন্ম হল? কোন কোন ব্যক্তি তরিকায়ে মোহাম্মদিয়ার ওপর এ বলে দোষারোপ করতে লাগল যে, এ দলের লোকগুলো গায়েরে মোকাল্লিদ (চার ইমামকে অমান্যকারী) এবং ওহাবী। কেননা এ দলের লোকজন নিজদেরকে মোহাম্মদি বলেই প্রকাশ করে থাকে। কাজেই সৈয়দ সাহেব এবং তার দলের লোকজন নিশ্চই ওহাবী। অথচ মাওলানা সাহেব তার তরিকার নাম মোহাম্মদিয়া রাখার কারণ বর্ণনা করে বেদ'আতিদের ধোকা ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, হযরত পীর সাহেব তার তরিকার নাম মোহাম্মদিয়া এ কারণে রেখেছিলেন যে, কোন কোন অলি আল্লাহ কোন কোন নবিদের পদানুসরণ করে চলে থাকে। যা নজর বরকদম বয়ানের অষ্টম অধ্যায় হতে জানা যায়। মুর্শেদে বরহক হযরত মোহাম্মদ (স.) এর পদানুসরণ করে চলতেন বলে তার তরিকার নাম তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া রেখেছিলেন। কলকাতায় মৌলবি গোলাম সোবহান মরহুম হযরত মুর্শেদে বরহককে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনি আপনার তরিকার নাম মোহাম্মদিয়া কেন রেখেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সেটি 'নজর বরকদমের ব্যাখ্যা স্বরূপ'। এ উত্তরের বর্ণনা সৈয়দ মোহাম্মদ জাহের সাহেব লেখেছিলেন। তিনি মুর্শেদে বরহকের নিকটবর্তী আত্নীয় এবং খলিফাদের মধ্যে ছিলেন। ঐ সময় তিনিও হযরত সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। বর্ণনা নিম্নরূপ :

- তিনি বললেন, এরকম বুঝে নাও যে, কোন এক শহরের একজন বাদশাহ তার প্রত্যেক কর্ম ও ব্যবসায়ের আগ্রহ আছে। এজন্য ঐ শহরের যত ব্যবসা আছে প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যবসা ও কারিগরির দ্বারা বাদশাহকে সন্তুষ্ট করে এবং তারা বাদশাহের নৈকট্যও লাভ করে। কারিগরদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, কেউ একটি কারিগরি জানে, কেউ দুইটি কারিগরি জানে, আবার কেউ হয়ত তিনটি কারিগরি জানে। এভাবে যতই উপরে যাক প্রত্যেকেই নিজ নিজ কারিগরির তুলনায় বাদশাহের আকর্ষণ লাভ করেছে। আর যত কারিগরিই হোক না কেন প্রত্যেকটিই বাদশার নিকট গ্রহণীয়। মনে করুন ঐ সকল

৩৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১২১-১২৪

লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যিনি সর্বপকারের কাজ ও কারিগরিতে দক্ষ এবং তিনি বাদশাহের নিকটতম। আরও মনে করুন তাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যিনি মুনসীগিরিতে অদ্বিতীয়, তীর ব্যবহারে খুবই পটু, অশ্বারোহণে বেশ দক্ষ, কুস্তিগীর, পালওয়ান, এমন অদ্বিতীয় সৈনিক যে, তিনি যুদ্ধের মাঠে শত্রুদের সম্মুখ হতে পলায়ন করার কথা জানেন না, মিস্ত্রি ও কামারের কাজও খুব উত্তম জানেন। এভাবে যত কারিগরি আছে, প্রত্যেকটির মধ্যে তার বিশেষ আগ্রহ এবং দক্ষতা আছে। ঐ ব্যক্তি সর্বক্ষণ বাদশাহের দরবারে উপস্থিত থাকে। কারণ বাদশাহের যখন যে কাজের দরকার, তার দ্বারা ঐ কাজ করিয়ে নেন। এখন একথা জানা দরকার যে, পূর্ববর্তী যত বুজুর্গ লোক, যারা তরিকার মালিক যেমন, হযরত খাজা মাইনদ্দিন চিশতি (র.), হযরত গাওসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশেবন্দি (র.) প্রমুখ প্রত্যেকেই আমাদের পেশওয়া (অগ্রগামী) ছিলেন। ঐ সকল বুজুর্গদের তরিকার মধ্যে আমি বাই'য়াত গ্রহণ করে থাকি। আমি এ দাবি করি না যে আমি তাদের হতে উত্তম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে ঐ সকল লোকদের তরিকার মধ্যে ক্ষমতা দান করেছেন এবং আমি আল্লাহ তা'য়ালার জিকির ও ইবাদতে যেরূপ মগ্ন থাকি এবং আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র শুদ্ধির প্রতি যতটুকু দৃষ্টি রেখে থাকি, সেরূপ শক্তি আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মোহাম্মদ (স.) কে বিশেষভাবে দান করেছিলেন। সেটি হতে এ ফকিরকে সামান্য পরিমাণে কিছু দেয়া হয়েছিল। আর সে শক্তিগুলো হল, জিহাদের কাজ, হুদুদ ও কিসাসের আদেশ জারি, শিরক ও বিদ'আতগুলোর ধ্বংস করা ইত্যাদি। আল্লাহর রহমতে আমি ঐ কাজগুলোর সমাধা করার ক্ষমতা আমার মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পাই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে শক্তি দান করেছেন সেটির দ্বারা আমি বাসনা করি এবং সে আশা করি যে ঘোড়ায় আরোহণ করে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করি এবং যুদ্ধের অস্ত্র, তরবারি নেজা, বর্শা, তীর, কামান, বন্দুক ও পিস্তল বেধে এবং ঢাল নিজের শরীরে পরিধান করে আল্লাহ তা'য়ালার কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে প্রচার করার জন্য ঐ সকল কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করি। ঐ প্রকার প্রদত্ত শক্তির দ্বারা পরিখা খনন নিজ হাতে করতে পারি, কুড়াল হাতে করে কাঠ চিড়তে পারি। 'হুদুদ ও কিসাস' (শরিয়ত অনুযয়ী শাস্তি) জারি করতে পারি। অতএব এ খাস নিয়ামতের আকাঙ্খায় আমি আমার তরিকার নাম মোহাম্মদিয়া রেখেছি। কারণ হযরত মোহাম্মদ (স.) ঐ সকল কাজগুলো আপন পাক জাতের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন।

- ❖ পঞ্চম তরিকা 'তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া' কোথা হতে আসল, একথা বলা অজ্ঞতার পরিচয়ক। আগে থেকেই বহু তরিকা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এ চার তরিকা ব্যতীত 'চার পীর চৌদ্দ খান্দান' একথা যারা বলে তাদের একথা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে এসব কথা প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী বলে থাকে। পীরের খান্দান বহু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।
- ❖ যেহেতু তরিকায়ে মোহাম্মাদিয়া এক কথায় হযরত মোহাম্মদ (স.) এর বহু অনুসরণকারী। কাজেই যাবতীয় কামালাত এ তরিকার মধ্যে একত্রিত হয়ে রয়েছে। সাধারণ তরিকায়ে মোহাম্মদিয়ার বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। একারণে ফাসাদকারীদের ধোকা দেয়ার দরুন এ তরিকার বিষয় সন্দেহ হতে লাগল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এখন তরিকায়ে মোহাম্মদিয়ার প্রকৃত অবস্থা ও সৌন্দর্য ভালভাবেই জ্ঞাত হওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও মাযহাবের ওপর দৃঢ় থাকার কথা যা সুরায়ে হাশরের নিম্ন আয়াতের ওপর আমল করলে হাসিল হয়। সেটির নাম তরিকায়ে মোহাম্মাদিয়া। অয়াতটি এ, "ওয়া মা আতাকুমুর রাসুল ফাখুজুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু" অর্থাৎ-রাসূল তোমাদের জন্য যে সকল আদেশ আনয়ন করেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেছেন সেটি হতে বিরত থাক।
- ❖ আসল কথা এ যে তরিকায় মোহাম্মাদিয়াতে প্রবেশ করলে অন্বেষণকারী সকল তরিকাতেই প্রবেশ করে। অপর দিকে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়াকে অস্বীকার করলে সমস্ত তরিকাই অস্বীকার করা হয়। কেননা তরিকায়ে

মোহাম্মদিয়া সমস্ত তরিকার সার। যেমন শরিয়তে মোহাম্মদী সমস্ত শরিয়তের সার। এ শরিয়তের অনুসরণ করার অর্থ সমস্ত শরিয়তের অনুসরণ করা।

- ❖ তরিকায়ে মোহাম্মাদিয়া শেষ জামানার লোকদের জন্য কিমিয়া স্বরূপ। স্বীকার করুক বা নাই করুক প্রত্যেকেই এ তরিকা হতে উপকার লাভ করেছে। এ তরিকার অসাধারণ শক্তি এ যে পীর ভাইদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা জন্মিয়ে দেয়। এ তরিকায়ে মোহাম্মদিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রধান স্তম্ভ হল মোকামে উবুদিয়াত অর্থাৎ প্রকৃত বান্দায় পরিণত হওয়া। যে ব্যক্তি ফিকাহ অনুযায়ী কাজ করবে অথবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীত বিশ্বাস করবে, সে ব্যক্তি তরিকায়ে মোহাম্মদিয়ার বিরোধী।
- ❖ সৈয়দ সাহেবের তরিকায় প্রবেশ করলে তার ফল এ হয় যে, সর্বসাধারণ স্ত্রী পুরুষ কেবল তওবা করার জন্য তার তরিকায় প্রবেশ করলে বাই'য়াত করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে এক প্রকারের আন্তরিক পবিত্রতা তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। যে ব্যক্তি সুলুক ইলাল্লাহ (আল্লার নৈকট্য লাভ) এর নিয়তে তার (সৈয়দ সাহেবের) তরিকায় প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবাণীতে ৮/১০ দিনের মধ্যেই নিজ উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্য লাভের কাছাকাছি উপস্থিত হতে পারবে, জিকির ও মোরাকাবার মিষ্টতা উওমরূপে বুঝতে পারবে।
- ❖ হযরত মুর্শেদে বরহক সমস্ত তরিকা, বিশেষত নকশেবন্দিয়া তরিকা হতে নুর লাভ করেছেন।[৩৬৫]

তাকবিয়াতুল ঈমান নামীয় কিতাব সম্বন্ধে মাওলানা সাহেবের মতামত

'তাকবিয়াতুল ঈমান' হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহিদ (র.) এর লিখিত একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। এটি তৌহিদ (একত্ববাদ), সুন্নাত অনুসরণের শিক্ষা, শিরক বিদ'আত এবং কুসংস্কার দূরীকরণ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক। এটি প্রত্যেক যুগে বিদ'আতি ও কবর পূজকদের মধ্যে ভীতি এবং ত্রাসের সঞ্চার করার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। বিদ'আতিগণ 'তাকবিয়াতুল ঈমানকে' তাদের দলের মধ্যে ধোকা ও প্রবঞ্চণার বিষয় চমকিত বিজলীর ন্যায় মনে করে। তারা এ কিতাবের বিরুদ্ধে তাদের জীবন মরণ সমস্যাকে একত্রিত করে সর্বদাই এটির বিরুদ্ধে প্রচার করে এসেছে। এটির বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করেছে। এমনকি মাওলানা ইসমাইল শহিদ সাহেবের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতওয়া এবং বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রচার করেছে। হযরত ইসমাইল শহিদ সাহেবের কাফেরির একটি প্রচারপত্র মাওলানা সাহেবের হাতে পড়েছে। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবের বিরুদ্ধে উগ্র প্রচারের পথ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। কাজেই উক্ত কিতাবের বিষয় মাওলানা সাহেবের মতামত ও প্রচারপত্র সমূহ দেখে তার মতামতের বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান বিষয় বলে মনে করি।

মাওলানা সাহেব বলেন, এ ফকির মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল মুহাদ্দিস (র.) এর কাফের হওয়ার বিষয় লিখিত একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি। উক্ত বিজ্ঞাপনে জনাব মুহাদ্দিস সাহেবের কাফের হওয়ার কারণও লেখেছিল যে, 'তাকবিয়াতুল ইমান' কিতাবের শব্দ হতে নবিগণ ও অলিগণের বিষয় বেয়াদবি প্রকাশিত হচ্ছে এবং বেয়াদবির কথা মনে উদ্রেক হয়। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিজ্ঞাপন লেখকের ধর্ম বিষয় বুঝবার ক্ষমতা দান করুন এবং তার অন্তিমকাল মঙ্গলময় করুন। এ বিজ্ঞাপনে যে ফতোয়া ছিল সেটিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের বিরুদ্ধে ছিল। কাজেই এ নগন্য খাদেম তাকবিয়াতুল ইমান কিতাবখানা খুব ভাল করে দেখলাম। এটিতে দেখতে পেলাম যে উক্ত কিতাবের মূল উদ্দেশ্য সুন্নাতুল জামা'আতের মাযহাব অনুযায়ী। উক্ত কিতাবের শব্দ ও বাক্যাবলি বেশ সুন্দর দেখতে পেলাম। দুঃখের বিষয় এ যে, বিদ'আতিতে যাবতীয় শিরক ও কুফরি পূর্ণ প্রমাণবিহীন। নিয়ম পদ্ধতি সমূহ দেখা সত্ত্বেও তাদেরকে বিদ'আতি, মুশরিক ও কাফির বলা হয়না। অথচ তারা সেটির ওপর জিদ ও হঠ করে

৩৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫-১২৯

থাকে। এমনকি এ হঠকারিতার ফলে তারা এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে পেরেছে এবং একটি সনদী কিতাবের লেখককে যিনি আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় শহিদ হয়েছেন তাকে কাফের বলে থাকে।

জনাব মাওলানা সাহেব 'মোকাশেফাতে রহমত' নামক কিতাবের অন্য এক জায়গায় বলেন, দ্বিতীয় বিপদ এ যে, এ দেশের সর্বসাধারণ ব্যক্তি, বিশেষত স্ত্রীপুরুষ যদিও কালেমা পাঠ করে থাকে, এমন শিরক ও বিদ'আতের ভেতর মগ্ন ছিল যা মক্কা নগরীর অন্ধকার যুগের এবং ভারতের মুশরিকগণ অপেক্ষাও বিশ্বাস ও হঠকারিতায় বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই মুমিনদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং মুশরিকদের শিরকি বিশ্বাস ও হঠকারিতাকে ধ্বংস করার জন্য হযরত মাওলানা ইসমাইল শহিদ (যিনি আল্লার রাস্তায় শহিদ হয়েছেন) সাহেব তার চাচা এবং ওস্তাদ ও পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব মুহাদ্দিস (র.) দেহলবীর ধর্ম বিশ্বাস ও প্রণীত কিতাবসমূহের অনুসারে 'তাকবিয়াতুল ইমান' নামক কিতাব প্রণয়ন করেন। এটির দ্বারা হেদায়েতের বিরাট কাজ হয়েছে এবং মুশরিকদের হঠকারিতা এমনকি তাদের শক্তিকেন্দ্র বিনষ্ট হয়ে যায়। এটিতে ঐ সময়কার কতিপয় আলেম উপরোক্ত কিতাব লেখকের প্রতি কুফরির ফতোয়া দান করেছিল। প্রবঞ্চনা ও ধোকার দ্বারা বিচারক এবং সমস্ত লোকের মনে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল যে 'তাকবিয়াতুল ইমান' নামক কিতাবে হযরত মোহাম্মদ (স.) এর শাফা'য়াতের কথা অবিশ্বাস করা হয়েছে এবং নবি ও দরবেশদের প্রতি অভদ্রতা ও বেয়াদবীর কথা লেখা হয়েছে। এ কথাগুলো হিন্দি ও তুর্কি ভাষায় বিজ্ঞাপনাকারে ছাপিয়ে দিয়েছিল। এ মিথ্যা কথায় মোফসেদ এবং বেশিরভাগ মূর্খ লোক খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কিতাবে তৌহিদ, সুন্নাতের অনুসরণ এবং শাফায়াতের বিষয় খুব ভাল ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৬৬]

মাওলানা সাহেবের খলিফাগণের বিবরণ

এখানে জনাব মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের অসংখ্য খলিফাদের মধ্যে এমন কতিপয় খলিফার নাম উল্লেখ করছি যাদের পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা সহজে আমার জানা সম্ভব হয়েছে। উনারা এমন সব খলিফা যারা হুবহু মাওলানা সাহেবের মত ও পথানুযায়ী চলে তাবলিগ ও হেদায়েতের কাজ সমাধা করেছেন এবং ধর্ম প্রচারার্থে নিজেদের প্রিয় জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। যার ফলাফল আজও তাদের নিজ নিজ এলাকায় বর্তমান আছে। এখানে এলাকার কথা উল্লেখ করার কারণ এ যে, আমি বাংলা ও আসামের যত স্থানেই গিয়েছি। সবস্থানে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হতে পেরেছি যে, জনাব মাওলানা সাহেব তার উপযুক্ত ও কামেল খলিফাদেরকে এক এক জেলায় ও এলাকায় নির্দিষ্ট করে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বস্ততা ও সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রত্যেক খলিফাকে খেলাফতনামা প্রদান করেছিলেন। প্রত্যেক খলিফা তাদের নিজ নিজ এলাকায় পূর্ণভাবে সফলতার সাথে ধর্মের সেবা করে গেছেন। ঐসকল খলিফাগণের বংশধরদেরকে আজ পর্যন্তও লোকে সম্মানের চোখে দেখে থাকে। মাওলানা সাহেবের কতিপয় বিশিষ্ট খলিফার নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. মাওলানা আনওয়ার উল্লাহ সাহেব,[৩৬৭] চট্টগ্রাম।
২. মাওলানা ফয়জুল্লাহ সাহেব, রায়পুরা, নোয়াখালী।
৩. মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ মুহাদ্দিস রামপুরী,[৩৬৮] রামপুর স্টেট।

---

৩৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০-১৩২

৩৬৭. 'শাওয়ারেকে মক্কিয়া' নামক কিতাবের প্রণেতা।

৩৬৮. তিনি রামপুর স্টেটের শহর কাজী মাওলানা হামিদ সাহেবের পিতা। তার ফয়েজ রামপুর ব্যতীত বাংলাতেও পাবনা, নাটোর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে।

৪. মৌলবি আব্দুল আজিজ,[৩৬৯] মুলতগঞ্জ, ফরিদপুর।
৫. মাওলানা গোলাম শরিফ সাহেব, চট্টগ্রাম।
৬. মাওলানা হাকিম আশরাফ আলী সাহেব, সিলেট।
৭. মোহাম্মদ গোলাম আকবর খন্দকার, রঘুনাথপুর, ত্রিপুরা।
৮. মাওলানা সৈয়দ তালেব হোসেন সাহেব, নোয়াবাড়ি, কাওন্দিয়া, ঢাকা।
৯. মৌলবি এলাহী বক্স সাহেব,[৩৭০] ঘরিসার, ফরিদপুর।
১০. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সাহেব,[৩৭১] রায়পুরা, নোয়াখালী।
১১. মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন সাহেব,[৩৭২] পাঞ্জাব।
১২. মৌলবি শাহ তোফায়েল উল্লাহ সাহেব, বারঘড়িয়া, মালদহ।
১৩. মাওলানা রমিজউদ্দিন সাহেব, সন্দীপ, নোয়াখালী।
১৪. শাহ উবায়েদ উল্লাহ সাহেব, হাতিয়া, নোয়াখালী।
১৫. শাহ নুরুল্লাহ সাহেব, হাতিয়া, নোয়াখালী।
১৬. হযরত গোলজার শাহ সাহেব, আওয়াদ,আওয়াদ।
১৭. মৌলবি আমিনউদ্দিন সাহেব, মনোহরগঞ্জ, ত্রিপুরা।
১৮. মুন্সি নেয়ামতউল্লাহ,[৩৭৩] আহাম্মদপুর, পাবনা।
১৯. আকবর মিয়াজি সাহেব, মনোহরগঞ্জ, ত্রিপুরা।
২০. মাওলানা খয়রাত হোসেন সাহেব, আজমগড়।
২১. মৌলবি আব্দুল অদুদ সাহেব,[৩৭৪] চট্টগ্রাম।
২২. মাওলানা আল্লাহ বকস সাহেব, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
২৩. মাওলানা উবায়েদ উল্লাহ সাহেব আলউবাদী, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা।
২৪. কারী মোহাম্মদ জাবেদ সাহেব,[৩৭৫] সিলেট।
২৫. কারী গোলাম সারওয়ার সাহেব, ত্রিপুরা।
২৬. কারী মোহাম্মদ আহমদ সাহেব, ত্রিপুরা।
২৭. মুন্সি কারী সৈয়দ জালাল উদ্দিন সাহেব, হাজিগঞ্জ, ত্রিপুরা।
২৮. শাহ শামসুল হক সাহেব, লক্ষীপুর, নোয়াখালী।

---

৩৬৯. তিনি মাওলানা কারামত আলী সাহেবের উর্দু গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ করে প্রচার করতেন। রদ্দুল মুফসেদিন, দরবেশনামা, আসরারুসসালাত প্রভৃতি তার প্রসিদ্ধ কিতাব।

৩৭০. 'দায়মুদ্দীন' ফতওয়া প্রণেতা

৩৭১. 'খিলাসাতুল মাসায়েল' কিতাব প্রণেতা।

৩৭২. তিনি দীর্ঘকাল যাবত মাওলানা সাহেবের খেদমতে জৌনপুরে থেকে ফয়েজ হাসেল করেছেন।

৩৭৩. তিনি বগুড়া, রংপুর, সিরাজগঞ্জে হেদায়েতের কাজ করেছেন। গোকুণ্ডাতে কোন মসজিদ ছিল না, তিনি সেখানে মসজিদ স্থাপন করেছেন। এখন সেখানে ২০/২৫ মাইল দূর হতে লোক এসে জুম'আর সালাত আদায় করে।

৩৭৪. চট্টগ্রাম মাদ্রাসার শিক্ষক।

৩৭৫. তিনি শামসুল ওলামা আবু নছর (সাবেক উজিরে তালিম, আসাম) এর পিতা। মাওলানা কারামত আলী সাহেবের একান্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। শেষ বয়সে মাওলানার দোয়ার বরকতে শামসুল ওলামা পয়দা হন।

২৯.মুন্সি আব্দুল্লাহ সাহেব, দৌলতখান, বরিশাল।
৩০.মৌলবি ফয়জুল্লাহ সাহেব, দৌলতখান, বরিশাল।
৩১.মৌলবি হাফেজ মোহাম্মদ হাতেম,[৩৭৬] কলকাতা।
৩২.শাহ ওয়াজেদ আলী, ফরিদপুর।
৩৩. মৌলবি জামালুল লাইল সাহেব, মদিনা শরিফ।
৩৪.মুন্সি আজিজুর রহমান মুলফতগঞ্জ, ফরিদপুর।
৩৫. মোহাম্মদ মনিরুদ্দিন সাহেব, চরমটুয়া, নোয়াখালী।
৩৬. মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ সাহেব, চরমনসা, নোয়াখালী।
৩৭.মিয়া রজব আলী সাহেব, কলাতিয়া, ঢাকা।
৩৮. মৌলবি কাজী দেলাওয়ার আলী সাহেব, সিলেট।
৩৯. মৌলবি রফিউদ্দিন সাহেব, মিঠাপুকুর, সিলেট।
৪০.মৌলবি মোহাম্মদ তকী সাহেব, নোয়াখালী।
৪১. মাওলানা হাজি আব্দুল হক,[৩৭৭] মক্কা শরিফ।
৪২.মুন্সি আলিমুদ্দিন, চরমটুয়া, নোয়াখালী।
৪৩.কারী আবদুর রহমান, রহমতগঞ্জ, ঢাকা।
৪৪. কারী আকাসুজাত আলী সাহেব, রহমতগঞ্জ, ঢাকা।
৪৫.মৌলবি আব্দুল আজিজ সাহেব, গেয়ালপাড়া, ঢাকা।
৪৬.মৌলবি শাহ কছিমউদ্দিন সাহেব, আটিয়া, ঢাকা।
৪৭. মৌলবি আহসানুল্লাহ সাহেব,[৩৭৮] ফরাশগঞ্জ, নোয়াখালী।
৪৮.মুন্সি হাজি রহিমউদ্দিন সাহেব,[৩৭৯] ফরিদপুর।
৪৯.মুন্সি ফানাউল্লাহ, ভরালিয়া, ঢাকা।
৫০.মৌলবি গোলাম মুবিন, হাজিনগর, ঢাকা।
৫১.মৌলবি মোহাম্মদ আলী, হাজিনগর, ঢাকা।
৫২.মৌলবি আব্দুল্লাহ, নোয়াখালী টাউন, নোয়াখালী।
৫৩. আসাদউল্লাহ মস্তান, আমানতপুর, নোয়াখালী।
৫৪.কাজী মোহাম্মদ রমজান বোগদাদী-কেওয়ার, ঢাকা।
৫৫.মৌলবি ওয়ারেছ আলী, বোগদাদী-কেওয়ার, ঢাকা।
৫৬. মোহাম্মদ রহিম বক্স খোন্দকার দশদুনা, ত্রিপুরা।
৫৭.মুন্সি অলি উল্লাহ, বাশবাড়ি, ত্রিপুরা।
৫৮. মুন্সি রমিজ উদ্দিন সাহেব, বাশবাড়ি, ত্রিপুরা।
৫৯.মুন্সি আবদুর রহিম সাহেব, রামকৃষ্ণপুর, ত্রিপুরা।

---

৩৭৬. কলকাতা কুলুটোলা মসজিদের ইমাম ছিলেন।
৩৭৭. মোহাজিরে মক্কী
৩৭৮. তিনি মাওলানা সাহেবের বোটে মাল্লারূপে ভর্তি হয়েছিলেন এবং তার খেদমতে থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং যোগ্য আলেম হন। তার পুত্র মাওলানা হামিদ সাহেব জবরদস্ত আলেম ও লেখক হয়েছিলেন।
৩৭৯. তিনিও বোটে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

৬০.মুন্সি আহসান উল্লাহ সাহেব, রামকৃষ্ণপুর, ত্রিপুরা।
৬১.মুন্সি নেয়াজ আলী সাহেব, বড়ালীয়া, নোয়াখালী।
৬২.মৌলবি ফয়জুল্লাহ সাহেব, লক্ষীপুর, নোয়াখালী।
৬৩. মাওলানা দিয়ানত উল্লাহ সাহেব, বড়চাপা, ঢাকা।
৬৪.মৌলবি রুকুন উদ্দিন সাহেব, কালাপাহাড়ীয়া, ঢাকা।
৬৫. মৌলবি হেদায়েত উল্লাহ, পীরপুর, ঢাকা।
৬৬. হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।
৬৭.হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।
৬৮. হযরত মাওলানা মোছলেহ উদ্দিন, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।
৬৯. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোহসেন, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।
৭০.হযরত মাওলানা হাফেজ মাহমুদ, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।
৭১. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।
৭২.হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ হামিদ, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।
৭৩.হযরত মাওলানা হাফেজ আব্দুল আউয়াল, মোল্লাটোলা, জৌনপুর।"[৩৮০]

মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এতদঞ্চলে দ্বীন ইসলামের প্রচারকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত মনীষীগণ তথা খলিফাগণের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা গ্রহণ করেছিলেন। উনারা সকলেই নিজ নিজ এলাকায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে দ্বীনের প্রচার চালিয়ে গেছেন। এসকল ব্যক্তিদের ত্যাগ, তিতীক্ষা, অবদানের ফলেই বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ত্বরান্বিত হয় খুব দ্রুত গতিতে। মহান আল্লাহ উনাদেরকে এ মহৎ কর্মের উত্তম প্রতিফল দান করুন।

৩৮০. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮-১৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান

শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামকে বাংলার মানুষের নিকট পরিচিত ও জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে যেসকল মহামনীষী অসামান্য অবদান রেখেছেন হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তাদের মধ্যে অন্যতম। বৃটিশ শাসনামলে পূর্ববঙ্গ, আসাম তথা বাংলাদেশে মুসলিমদের ধর্মীয় আচার আচরণে কুসংস্কারের যে ছায়া প্রভাব বিস্তার করছিল, তিনি সেখান থেকে দ্বীন ইসলামকে মুক্ত করে সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌছে দেয়ার সংগ্রাম করেছেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় উনি সঙ্গী সাথী সহ ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান পৌছে দিয়েছেন। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার, প্রসারে তার সামগ্রিক কর্মকান্ড এবং অবদানের বিষয়টি এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

হেদায়েতের উদ্দেশ্যে মাওলানা সাহেবের বাংলাদেশ ভ্রমণ

মাওলানা সাহেবের সশস্ত্র জিহাদের আকাঙ্খা খুব প্রবল ছিল। এ আগ্রহের দরুনই তিনি সৈনিক বিদ্যা, খঞ্জর চালনা, ব্যায়াম কৌশল, তরবারী চালনা বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। একজন মুজাহিদ ও সৈনিকের পক্ষে যতটুকু প্রস্তুতি ও শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন তা মাওলানা সাহেব অর্জন করেছিলেন এবং নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে তৈরি করেছিলেন। তার পীর হযরত সৈয়দ সাহেব যখন শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঞ্জাব রওনা হতে ইচ্ছা করেন তখন তিনিও আপন পীর সাহেবের সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মাওলানা সাহেবের মত ধার্মিক ও নওজোয়ান যুবকের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা অন্য কাজ সমাধা করাবেন, সেটি হযরত সৈয়দ সাহেব নিজের অন্তর দৃষ্টির দ্বারা জানতে পেরে তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। কারণ সৈয়দ সাহেবের নিকট তরবারী হস্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মদানকারী অসংখ্য মুজাহিদ বর্তমান ছিল। সৈয়দ সাহেব মাওলানা সাহেবকে (তরবারীর যুদ্ধের পরিবর্তে) বাকযুদ্ধের আদেশ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা দ্বারা ওয়ারেসাতুন্নবী অর্থাৎ তাবলিগ ও হেদায়াত কার্য সম্পন্ন করান। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা তোমার মধ্যে মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন, যা তোমার একান্ত দরকারী। তোমার জন্য তাবলিগের কাজই 'জিহাদে আকবর' (শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ) তোমার জবান এবং কলম আমার হেদায়েতের বিস্তার ও অনুবাদের কাজ করবে। মাওলানা সাহেব একজন আলেম ও সৈনিক হিসাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব যখন এ আদেশ করেন, তখন মাওলানা সাহেবের পরবর্তী কার্যাবলি তার এ আদেশ প্রকৃত পক্ষে সঠিক প্রমাণ করেছিল। এতদ্ব্যতীত মাওলানা সাহেবের প্রতি সৈয়দ সাহেবের কতটুকু পরিমাণ কদর ছিল তাও প্রকাশ পায়। মাওলানা সাহেবের প্রতি সৈয়দ সাহেবের এ ভবিষ্যৎবাণী একটি প্রকাশ্য কারামত বিশেষ। কেননা মাওলানা সাহেবের মৌখিক ও লেখনীর দ্বারা দুনিয়ার কতটুকু উপকার সাধিত হয়েছে এবং সৈয়দ সাহেবের হেদায়েতের কাব্য কি পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করেছে তা প্রত্যেক বিজ্ঞ মুসলিমই জানেন। বাংলা ও আসাম প্রদেশে ইসলামের অস্তিত্বই এর প্রমাণ বিশেষ। আজ পর্যন্ত মাওলানা সাহেবের প্রণীত বহু কিতাব বর্তমান থেকে তার জীবন্ত প্রমাণ দিচ্ছে।

মাওলানা কারামত আলী সাহেবের দ্বারা দুনিয়ার এক বিরাট অংশ বাংলা ও আসামের হেদায়াত ও সৎকাজ সমূহ যে সমাধা হবে একথা জনাব সৈয়দ সাহেব তার নিজ অন্তরদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্যই সৈয়দ সাহেব মাওলানা সাহেবকে তরবারীর যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে 'জিহাদ বিল-লেসান' (মৌখিক যুদ্ধের) আদেশ দিয়েছিলেন এবং মাওলানা সাহেবকে নিজের প্রতিনিধিত্বে বাংলাদেশের দিকে প্রেরণ করলেন। যেরূপভাবে সৈয়দ সাহেব যুদ্ধ

ময়দান থেকে মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব রামপুরী ও মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেব আজীমাবাদীর মত দুই অভিজ্ঞ খলিফাকে তাবলিগ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে বালাকোটের যুদ্ধের আগে হিন্দুস্তানের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ দুইজন মহান ব্যক্তি মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদে দ্বীন ইসলামের কিরকম সেবা করেছেন তা তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে সম্যক অবগত হওয়া যায়।"[৩৮১]

জানাব মাওলানা সাহেব বাংলাদেশে ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে আপন আত্মীয় স্বজনদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য জৌনপুর গমন করতেন। তখন শহরবাসীদের অবস্থা জেনে নিতেন ও তাদের সাথে মিলিত হতেন। একারণে শহরবাসীদেরও আকাঙ্খা পূর্ণ হত। এতদ্ব্যতীত আজমগড়, গাজীপুর, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর, মির্জাপুর ও লক্ষ্মৌ ইত্যাদি স্থানের বিশিষ্ট মুরিদ ও শুভাকাঙ্খীদের আশা ও আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য সেখানে গমন করে ওয়ায নসিহত করতেন। ১২৮০ হিজরীর আগে যখন তিনি জৌনপুর আগমন করেন, তখন শহরবাসীদের আগ্রহ ও আকর্ষণের দরুন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেননি। এসময় তার হেদায়েতর কাজ একমাত্র আগ্রা ও অযুদ্ধা (ইউপি) প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বহুলোক হালকা ও জিকিরের সভায় যোগদান করতঃ ইলমে তাসাউফ লাভ করেছিল। এসময় বাংলার মুরিদ ও ভক্তগদের নিকট হতে বাংলা যাওয়ার জন্য বার বার তার নিকট পত্র আসতে থাকে। বন্ধু বান্ধব ও মুরিদদের আশা আকাঙ্খার দরুন মাওলানা সহেব আনুমানিক ১২৮০ হিজরীতে বাংলাদেশে রওয়ানা হন। তিনি কলকাতা উপস্থিত হয়ে সেখানে কতকদিন অবস্থান করেন। অতঃপর সেখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করতে করতে ১২৮৩ হিজরীতে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দীপে পৌছেন।"[৩৮২]

হযরত সৈয়দ সাহেব 'কাশফ' (স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা অবগত হতে পেরেছিলেন যে, তাদের দ্বারা ইসলাম প্রচার ও তাবলিগ কার্য সমাধা করার কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার এ কাজ করানোই উদ্দেশ্য ছিল। এতে ধর্মের সেবা ও আল্লাহ তা'য়ালার কালেমার মহত্ব প্রকাশ করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। যিনি যে কাজের উপযুক্ত ছিলেন তাকেই সে কাজে নিযুক্ত করলেন। মাওলানা কারামত আলী সাহেব যদি অন্যান্য খলিফাদের ন্যায় বালাকোটে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যেতেন, তবে এতটুকু লাভ হত না যা সৈয়দ সাহেবের আদেশ পালনে বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দ্বারা হয়েছে। আজ বাংলার আনাচে কানাচে জৌনপুরী মাওলানার হেদায়াতের দ্বারা আলোকিত হয়ে উঠেছে। মাওলানা সাহেবের পরে তার উত্তরাধিকারী ও খলিফাগণ তারই মত খাটি নিয়তে ও সাচ্চা দিলে তাবলিগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যা মাওলানা সাহেবের অভীপ্সিত ছিল। আজ বাংলাদেশে অসংখ্য ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও হাক্কানী আলেম পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। আবাদ মসজিদ সমূহ, রোজাদার ও সালাতী মুসলিম, ইসলামি পোশাক-প্রিয় এবং আলেমদের সাথে ভালবাসা পোষণকারী জনসাধারণ প্রতি গ্রামে গ্রামে দেখতে পাবেন। বাংলার মুসলিমদেরকে অপরাপর রাজ্যের মুসলিমদের তুলনায় সৎকাজ সমূহে প্রাধান্য লাভকারী হিসাবে দেখতে পাবেন। এভাবে সেখানে (বাংলাদেশে) সাধারণ লোকদের মধ্যে অতিথি সেবা ও মুসাফিরের তত্ত্বাবধানে আরববাসীদের নমুনা দেখতে পাবেন। এসমস্ত ইসলামি আদব কায়দা ও সৌন্দর্য জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলী সাহেবের শিক্ষার প্রতিফল স্বরূপ।

হযরত সৈয়দ সাহেবের এটি একটি উজ্জ্বল কারামত ছিল যে, তিনি মাওলানা সাহেবকে তার যুদ্ধে যাওয়ার অভিলাস থাকা সত্ত্বেও বাংলার দিকে পঠিয়ে দিলেন। যদি তিনি তা না করতেন তবে অন্ধকারময় বাংলা ও আসামের যে আজ

৩৮১. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪-৩৫

৩৮২. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪-৯৫

কি অবস্থা হত তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন। মৌলবি মোহাম্মদ জাফর থানেশ্বরীর লিখিত 'সাওয়ানেয় আহম্মদী' নামক পুস্তকের ১৪১ পৃ. পাঠে জানা যায় যে, মাওলানা কারামত আলী সাহেব সৈয়দ সাহেবের সাথে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। কিন্তু বালাকোটের যুদ্ধের আগে সৈয়দ সাহেব তাকে ধর্ম প্রচারার্থে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করেন। তবে এটি কতটুকু সত্য তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই ভাল জানেন। বালাকোটের যুদ্ধে পরাজয়ের কথা সৈয়দ সাহেবের নিকট আগে থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই আল্লাহ তা'য়ালা মাওলানা সাহেবের দ্বারা অতীতে যে কাজ করানোর ইচ্ছা করেছিলেন, সৈয়দ সাহেব ও তাকে সে কাজেই নিযুক্ত করলেন। ঠিক এরূপ ঘটনা মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদের বিষয়েও ঘটেছিল। কেননা বালাকোটের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে সৈয়দ সাহেব আপন 'কাশফ' অনুসারে তাকে নিষেধ করেছিলেন। তার (সৈয়দ সাহেব) নিকট যুদ্ধের পরাজয়ের বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল। ইসমাইল শহীদের মত এরূপ একজন মহান ধর্ম প্রচারক যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন তা সৈয়দ সাহেবের মনঃপূত ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খন্ডন হবার নয়। কাজেই সৈয়দ সাহেব যে সন্দেহ করেছিলেন ঘটেছিলও তাই।"[৩৮৩]

"তার পীর কেবলার নির্দেশে বাংলা ও আসামে হেদায়াতের উদ্দেশ্যে ১২৫০ হিজরীতে তিনি সর্বপ্রথম কলকাতায় এসে পৌছেন। ঐ সময় কলকাতা শহরে সাইয়্যেদ আহমদ (র.) এর খলিফাগনের মধ্যে মরহুম মওলানা হাফেজ জামালুদ্দিন সাহেব, মুহাদ্দেস মওলানা ওয়াযীহ সাহেব (কলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার হেড মাওলানা), কাজী আবদুল বারী সাহেব এবং ঐ সিলসিলার আরও কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি মওলানা কারামত আলীকে কলকাতায় স্বাগত জানান। ওখানে কয়েকদিন থেকে ওয়ায নসীহত করেন এবং দলে দলে লোক তার কাছে তওবা করে তার কাছে বাই'য়াত হলেন। কলকাতা শহরে অবস্থান কালে মওলানা সাহেবের পুত্র মরহুম মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (র.) জন্মগ্রহন করেন। কলকাতার কাজ শেষ করে মওলানা কারামত আলী একাধিক বজরাযুগে (বোট) পূর্ববঙ্গের দিকে যাত্রা করেন। একটি বোটে যানানা, একটিতে ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা, একটিতে কাদেম ও কর্মচারীগণ, অপর একটিতে হরযত মওলানা কারামত আলী ও তার খলিফারা থাকতেন। তিনি ৫১ বছর বাংলা ও আসামে পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে শরিয়ত মোতাবেক ইসলামি জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশ জৌনপুর থেকে সুদূর বাংলাদেশে পদব্রজে পালকিতে, নৌপথে বজরায় (বোটে) যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুরা পাবনা, পূর্নিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কুচবিহার সিলেট কাছার ও আসামে ভ্রমণ করে লাউ সিদ্ধ খেয়ে কখনো উপোস থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং বিদ'আত ও শিরকের বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বুঝিয়ে এবং সংগ্রাম করে এমনকি নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে অধপতিত মুসলিমদের শরিয়ত পাবন্দ করেছিলেন যারা ধর্মীয় অনুশাসন ভুলে গিয়ে নামায রোজা ত্যাগ করেছিল যুক্তি-তর্ক ও সংস্কারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত করে শরিয়তের পথে আনতে তিনি যে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত। প্রথম পর্যায়ে একটানা ১৮ বছর বাংলার তাবলিগের পর তিনি জৌনপুরে ফিরে যান।"[৩৮৪]

যুক্তিতর্ক (বাহাস) এর মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলন

ইসলাম প্রচারের সময়ে মাওলানা সাহেব যুক্তিতর্ক বা বাহাস এর মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব প্রদান করতে চেষ্টা করতেন। চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারকালে জনৈক মুখলেসুর রহমান নামে এক বিদ'আতি মৌলবি মাওলানা সাহেবকে কাফের বলতেও ইতস্তত করেনি। মওলানা কারামত আলী সাহেব তার রচিত 'আনওয়ারে

৩৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬-৩৯
৩৮৪. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

কারামত' নামক কিতাবে ফার্সি ভাষায় এর জবাব দিয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তির দুঃসাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কালেমার সাথে নিজের নাম জুড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে ঐ ব্যক্তির সাথে মাওলানা সাহেবের বাহাসের দিন তারিখ ঠিক হলে শহরের বহু গন্যমান্য ও ওলামায়ে কেরাম সহ মাওলানা কারামত আলী বাহাস স্থলে উপস্থিত থাকলেও ঐ ব্যক্তি জেলখানায় গিয়ে আশ্রয় নেন। বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর মুন্সি ফজলুর রহমান, দারোগা করিমুল্লাহ ও মুন্সি ফায়েয আহমদ তাকে জেলখানা থেকে ডেকে আনার চেষ্টা করলেও তিনি সভায় উপস্থিত হননি। অবশেষে শহরবাসী ভন্ড মুখলেসুর রহমানের দল ছেড়ে মাওলানা কারামত আলীর কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি বহুবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু কোন ভয় বা ভীতি তাকে হেদায়েতের পথ থেকে সরাতে পারেনি। একবার তাবলিগ করার সময় চট্টগ্রামে জনৈক দুর্দান্ত জমিদার যিনি বহু আলেমকে হত্যা করেছিলেন, অনেক বাধা বিপত্তির পরও তিনি উক্ত জমিদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। ঐ জমিদার নাকি কাউকে তার সামনে বসতে দিতেন না। কিন্তু তিনি মওলানা সাহেবকে দেখে নিজের কুরসি এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে অনুরোধ করেন। মাওলানা সাহেব বহু যুক্তি দিয়ে তাকে তৌহিদ সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করেন। উক্ত জমিদার মাওলানা সাহেবকে বললেন, আমি যদি যুক্তি ও প্রমাণ না বুঝি তবে আপনি কি করবেন? জবাবে মাওলানা সাহেব বললেন আবার বুঝাবো। বার বার বুঝানোর চেষ্টা করবো। তার পরও যদি আপনি না বুঝতে চান তবে আমার হাতের এ তরবারী দিয়ে আপনাকে বুঝাবো। উক্ত জমিদার মাওলানা সাহেবের এ সাহস দেখে ভীত ও শংকিত হয়ে বললো যে, এ মাসআলাটি অনেক আলেমকে জিজ্ঞাস করেছিলাম কিন্তু তারা ভয়ে আমাকে হুজুর হুজুর বলতে লাগলো। আমি তাদেরকে ক্রোধে হত্যা করেছি। কিন্তু আপনি সত্যিকারের একজন হাদী। আপনার দ্বারা ইসলাম সতেজ ও উজ্জল হবে। অতঃপর উক্ত জমিদার মাওলানার হাতে বাই'য়াত হয়েছিলেন।

শুধু চট্টগ্রাম নয় পাটনার মৌলবি আবুল হুসাইনের সাথে কলকাতার মৌলবি মুহম্মদ সিদ্দিক পাঞ্জাবীর সাথে, বরিশালের মৌলবি আবদুল জব্বার ও ফরিদপুরের দুদু মিঞা প্রমুখের সাথে, মাওলানা শাহ কারামত আলীকে বহু বাহাস করতে হয়েছিল। প্রতিবারই আল্লাহর রহমতে তিনি জয়ী হয়েছেন। তবে তখনকার সময়ে বাংলাদেশে জুম'আ ও ঈদের নামায আদায় সম্পর্কে পীর দুদু মিয়া ও আবদুল জব্বারের সাথে যে বাহাস হয়েছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পীর দুদু মিয়া বিখ্যাত ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা ফরিদপুরের আলহাজ্ব শরিয়তুল্লাহর পুত্র। আবদুল জব্বার ছিলেন এদের খলিফা। ইংরেজ শাসিত ভারতকে Dar-ul-Harb or Country of the Enemy অর্থাৎ শত্রুর দেশ আখ্যা দিয়ে তারা এখানে জুম'আর নামায ফরয বা ঈদের নামায ওয়াজিব হতে পারে না মর্মে ফতোয়া বা মতামত দেন। মাওলানা শাহ কারামত আলী সাহেব ২৩ নভেম্বর বুধবার ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে Muhammadan Literary Society of Calcutta আয়োজিত সভায় ফতুয়া ই আলমগীরের ব্যাখ্যার আলোকে ব্রিটিশগণ যেহেতু মুসলমাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে সেহেতু ভারতবর্ষকে Dar-ul- Harb না বলে Dar-ul-Aman or Country of Faithfully অর্থাৎ ঈমানদারদের দেশ বলে আখ্যা দেন। সুতরাং ভারতবর্ষে জুম'আ বা ঈদের নামায আদায় না করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না মর্মে তিনি মতামত দেন। তবে মাওলানা শাহ কারামত আলী ভারতবর্ষকে Dar-ul-Islam অর্থাৎ ইসলামি দেশ বলেননি। তার রচিত কিতাব 'হুজজাত ই কাতিয়া' পাতা ১৩ এ উল্লেখ করেছেন যে, অমুসলিমরা মুসলিম দেশ জয় করলেও জুম'আর সালাত ও দুই ঈদের সালাত কেবল জায়েয নয় বাধ্যতামূলকও বটে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্বের যে সকল দেশ মুসলিম শাসিত নয় সেখানেও রীতিমত মসজিদে জামা'য়াতের সাথে জুম'আর নামায ও ঈদের নামায আদায় হচ্ছে। মুসলিম আলেমগণ এ নিয়ে আজ আর কোন প্রতিবাদ করছেন না। মাওলানা কারামত আলী সাহেবের তখনকার দেয়া মতামত যে সঠিক ছিল তা প্রমাণিত হলো। প্রকৃত পক্ষে ফারায়েজী আন্দোলনে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। মাওলানা কারামত আলী রাজীনীতির চেয়ে নৈতিক জিহাদের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। তার মনে এ বিশ্বাস ছিল যে,

ভারতবর্ষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলে ইংরেজ ভারত ছাড়লেও অন্য ধর্মের লোকেরাই ভারত শাসন করবে। তাতে মুসলিমদের অবস্থা আরও বিপন্ন হতে পারে। স্যার সৈয়দ আহমদ যেমনি ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিমদের ক্ষমতায়নের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন মাওলানা শাহ কারামত আলী তেমনি ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের ক্ষমতায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে তিনি ইংরেজ শিক্ষার বিরোধিতা করেননি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বৃহত্তম সুন্নী মতবাদের দেশ বাংলাদেশ। মওলানা শাহ কারামত আলীর অনেক সংগ্রামের ফসল। মাওলানা কারামত আলী কঠোর ওহাবী বিরোধী ছিলেন। ওহাবীরা এতই কট্টর পন্থী ছিল যে, যাদের সাথে তাদের মিল নেই তাদের সকলকেই মুশরিক বলে তারা মনে করে। মাওলানা কারামত আলী তার লিখিত কিতাব 'হুজজাত ই কাতিয়া' পাতা ৯-৩৮ এ শিরক, বিদ'আত এবং কালেমা পাঠকারী বেনামাযীদের জানাজা পড়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত কিতাবে তিনি ফাসেক (পাপী) ও কাফেরদের (অবিশ্বাসী) মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেন। তার মতে কালেমা পাঠকারী কোন মুসলিম গাফেলতির জন্য জীবদ্দশায় নামায না পড়লেও তার জানাজা পড়তে হবে। যারা বেনামাযীর মৃত্যুর পর তার জানাজা পড়তে অস্বীকার করেন, তাদেরকে তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন। মিলাদ মাহফিলে রাসূল (স.) এর প্রতি সালাম পাঠ করার নিয়ম কিয়াম (দাড়ানো) মুস্তাহাব মর্মে তিনি মতামত দেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বই লেখেছেন। তন্মধ্যে 'মুরাদুল মুরীদিন' ও 'মোলাখখাস' অন্যতম। Encyclopeadia of Islam Voll-II (k) পাতা ৭৫২-৭৫৩ এ মাওলানা কারামত আলী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করা হয় এর কিছু অংশ নিচে দেয়া হলো-

i) Karamat Ali's life was a double struggle; first he combated the Hindu costoms and superstitions, secondly he tried to bring back into the fold of orthodoxy the new heterodox schools against which he waged a successful war.
ii) He kept in touch with the Musalmans of Bengal and distributed to the needs all the presents that he received. He was a trained kari and an expert calligraphist.
iii) His following was so large that there was hardly a Bengal village without his disciples and he still exerts a living influence in certain districts of the province.

মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। বদরউদ্দীন উমর কর্তৃক লিখিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ বইতে লেখক উনিশ শতকের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন অন্তহীন কুসংস্কার ও অজস্র শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ এর কথা উল্লেখ করেন। সতীদাহের মতো একটি বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজা রাম মোহন রায় হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রবর্তন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে বস্তুতঃপক্ষে প্রায় সর্বশান্ত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এজন্য দেশের লোককে অসার ও অপদার্থ বলে নিজের হতাশাকে ব্যক্ত করলেও সে হতাশার মূল কারণ তৎকালীন হিন্দু সমাজের কুসংস্কার এবং কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনকে সৎকর্ম মনে করতেন। তাই নিজের পারিবারিক ও গ্রাম্য সমাজের আপত্তি সত্বেও তিনি নিজের পুত্র সন্তানের বিধবা বিবাহে আপত্তি তো করেনইনি, ওপরন্তু তাতে গর্বই বোধ করেছিলেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতার সামাজিক

জীবনে যে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দেয়, সে তরঙ্গের নাম ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়ন করেছিলেন, সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়েছিল। মাওলানা কারামত আলী ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছেলের বিধবা বিবাহের পর মাওলানা শাহ কারামত আলী বিদ্যাসাগরকে পত্র লেখে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এক সময়ে আসামের অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে বেশিরভাগ লোকই উলঙ্গ থাকত। কিছু সংখ্যক লোক অবশ্য নেংটী পড়ত। মাওলানা কারামত আলী এসব লোকদেরকে ডেকে এনে একটি করে কাপড় আর প্রত্যেককে একটি করে টুপী বিতরণ করতেন। তিনি ঢাকা থেকে ৪ হাজার লুঙ্গি ও কয়েক হাজার গজ থান কাপড় এনে লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। হাদীয়া হিসাবে যা পেতেন তা গরীব মুসলিমদের দান করে দিতেন। এরূপে আসামে লোকজন কাপড় পড়তে অভ্যস্ত হয়েছিল এবং সভ্যতার আলো দেখল। জনৈক ইংরেজ লেখক এ সম্পর্কে লেখেছেন- "মাওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলা ও আসামের মানুষকে শুধু মুসলিমই করেননি বরং তাদেরকে কাপড় পড়া শিখিয়ে সভ্য করেছিলেন"। বাংলাদেশ ও আসামের গ্রামে গঞ্জে যেখানে কোন আযান দেয়া হত না ও জুম'আর নামায পড়া হত না মাওলানা কারামত আলীর উদ্যোগ ও প্রচারের ফলে সে সকল পরিত্যক্ত মসজিদগুলো আবার আযানের ধ্বনিতে মুখরিত ও আবাদ হয়ে উঠেছিল। তিনি যেখানেই যেতেন নামাযের সময় হলে আযান দিয়ে জামা'আত এর সাথে নামায পড়তেন। এজন্য তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। শিরক, কবর পূজা, পীর পূজা ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বলিষ্ট কণ্ঠস্বর।

ইসলামি মুল্যবোধ, জাতীয় ঐক্য এবং চেতনায় উদ্ভুদ্ধ একজন প্রগতিশীল ধর্ম সংস্কারক হিসাবে মাওলানা কারামত আলীর আন্দোলনকে ঐ সময়ে যারা সমর্থন দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আমীর আলী এবং জয়নাল আবেদীনের নাম অন্যতম। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক James Wise তার লিখিত Notes on Races, Casts and Trades of Estern Bengal (London 1833) পাতা ৩১ এ বর্ণনা করেন যে,

The Most Successful and celebrated missionaries, however, were Maulavi Karamat Ali, Zaynal Abedin and an Arab, Sayyid Mohammad Jamal-ul-Lail whose preaching among the villages of Eastern Muslim Bengal has had the most momentous effects not only by uniting under one banner the vast majority of the middle and working classes, but also by arousing the intolerant spirit of Mohammadinism which had lain dormant nearly a century.[৩৮৫]

"সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার বিখ্যাত কিতাব 'তারিখে দাওয়াত ও আজিমাতের' মধ্যে লেখেন : আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর হাতে ৮০ হাজার লোক মুসলিম হয়েছে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.)-এর হাতে ৯০ লক্ষ লোক মুসলিম হয়েছে। আর হাদীয়ে বাঙ্গাল শাহ্ কারামাত আলী জৈনপুরী (র.) এর হাতে সরাসরি এক কোটি লোক মুসলিম হয়েছে।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক William Hunter এর লিখিত "The Indian Muslims" বইতে স্পষ্ট লেখা আছে; ১৮৭১-১৮৯১ সাল পর্যন্ত একটি জরিপে দেখা গেছে, প্রতি বছর ২০% করে মুসলিম বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষের

৩৮৫. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬-২১

পশ্চিমান্তে যেখানে হিন্দু ছিল ৭০% আর মুসলিম ছিল ৩০% সেখানে দ্রুত সময়ে মুসলিমের সংখ্যা বেড়ে হয় ৭০% আর হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০%।"[৩৮৬]

তাই মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণে দেশ বিভক্তির পর বৃটেন থেকে ইংরেজ গভর্নরকে শোকজ করা হয়, মুসলিমদের সংখ্যা রাতারাতি পাল্টে যাওয়ার পিছনে কি কারণ? প্রদেশের ইংরেজ গভর্নর জরিপ করে রিপোর্ট প্রেরণ করল যে, এর পিছনে একটি মাত্র ব্যক্তি কাজ করছেন। তিনি হলেন হাদীয়ে বাঙ্গাল শাহ্ কারামাত আলী জৈনপুরী (র.)। যিনি ভারতের উত্তর প্রদেশ জৌনপুর হতে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল বিধ্বস্ত ঢেউকে পারি দিয়ে সুদীর্ঘকাল গ্রামে গঞ্জে, মাঠেঘাটে, নদীর বাকে বাকে দ্বীন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অবিস্বরণীয় অবদান রাখেন। যার কারণে তাদের এত পরিশ্রম ব্যর্থ।

ভ্রাম্যমান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

মাওলানা সাহেব তার সবসময় এবং সারা বছর ভ্রমণ ও পর্যটনে অতিবাহিত করতেন। কাজেই বিশেষ আবশ্যক বিধায় নিজের সঙ্গে (বোটে) একটি ভ্রাম্যমান মাদ্রাসা কায়েম করেছেন। এ মাদ্রাসায় স্থানীয় লোকদেরকে পাঠ ও শিক্ষা দান করত আমল আকায়েদের পায়বন্দ এবং শরিয়তের আহকাম বিশেষভাবে অবগত করে পার্শ্ববর্তী স্থানে এবং চতুর্দিকে আল্লাহ তা'য়ালার কালেমাকে প্রকাশ্যে প্রচার ও দাওয়াতে হক বা হক পথের দিকে আহবান করার জন্য প্রেরণ করতেন। এ ভ্রাম্যমান মাদ্রাসার যাবতীয় খরচপত্র এবং শিক্ষার্থীদের ব্যয় ও খোরাকের ভার খোদ মাওলানা সাহেব বহন করতেন। যেহেতু তিনি বোটে সমুদ্র ভ্রমন করতেন এবং তার সাথে তার পরিবারবর্গও থাকত কাজেই উক্ত মাদ্রাসার জন্য একটি ভিন্ন বোটের ব্যবস্থা ছিল। এসকল বোটে সাধারণ শিক্ষা আমল ও আকায়েদ ঠিক করা ব্যতীত রুহানী তালিম, (মানসিক শিক্ষা) একে পবিত্র, চরিত্র সংশোধন, খাটি নিয়ত এবং আল্লাহ তা'য়ালার জিকির আজকারের নিয়ম ও মোকামাতে সুলুক (মারেফত) শিক্ষা দান করা হত। এ ভ্রাম্যমান মাদ্রাসা থেকে যে সকল আলেম বের হতেন তারা প্রত্যেকে এক এক জন মহান ধর্মপ্রচারক হিসাবে গন্য হতেন। মাওলানা সাহেবের সঙ্গলাভ প্রাপ্ত ধর্ম প্রচারকগণ তার উপদেশ ও নির্দেশিত পন্থানুযায়ী বাংলাদেশের সর্বত্র দ্বীন ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ খেদমত করেছিলেন। যার পুণ্যময় ফল আজও বর্তমান। মাওলানা সাহেবের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত ধর্মপ্রচারক বাংলাদেশে অসংখ্য ছিল। এমনকি তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে অনেক আলেম আজ পর্যন্তও দীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করছেন। তাবলিগ উপলক্ষে এ ফকির (লেখক) কে বহুস্থানে যেতে হয়েছে। প্রত্যেক স্থানের লোকে বলেছেন যে, মাওলানা কারামত আলী সাহেব অমূক বুজুর্গ ব্যক্তিকে নিজের খলিফা এবং নায়েব করে এখানে পাঠিয়েছিলেন। এ বুজর্গ ব্যক্তির দ্বারা দেশ খুব বেশি হেদায়েত হয়েছে। লোকজন তাদের দ্বারা ইসলাম শিক্ষা লাভ করেছে। মাওলানা সাহেবের খাস দোয়ার বরকতে আজ পর্যন্ত ঐ খলিফাদের বংশধরদেরকে লোকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।"[৩৮৭]

ধর্ম প্রচারক দলের জন্য বিভিন্ন বোট

মাওলানা সাহেবের বাংলাদেশে হেদায়েতকার্য দীর্ঘকাল ধরে হওয়ার দরুন তিনি তার পরিবারবর্গ সঙ্গে রাখতেন এবং তাদের জন্য একটি ভিন্ন নারীসুলভ বোট রাখতেন। মাদ্রাসার কাজ ও ছাত্রদের অবস্থানের জন্যও আলাদা বোট থাকত। এটি ব্যতীত দর্শনপ্রার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করার ও দূরবর্তী মেহমানদের জন্যও ভিন্ন বোট থাকত। এসকল

৩৮৬. তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

৩৮৭. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫০

বোটের খরচ মাওলানা সাহেব নিজেই বহন করতেন। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ভরসা করে মাওলানা সাহেব আগ্রহের সাথে এসকল খরচ বহন করতেন। তিনি অত্যধিক খরচের কথা উল্লেখ করে কোন কোন লোকের উদ্বেগহীনতা ও অসহানুভূতির বিষয় প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, "এ ফকিরের সাথে কয়েকখানা বোট আছে। বোটের দৈনিক ব্যয় ১০০ টাকা। কোন কোন স্থান থেকে লোকে ফকিরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায় এবং দশ দিনে এক সহস্র টাকা খরচ হল কিন্তু এ নাদানে একথা বুঝল না। কাজেই এ ফকির ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ল।"

ভ্রমণ ও পর্যটন উপলক্ষে মাওলানা সাহেবকে কখনো কখনো আর্থিক সঙ্কট এবং দুঃখে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়েছিল। যেহেতু তিনি নিজেই এক স্থানে লেখেছেন যে, "একবারের ভ্রমণে কিছুদিন এতই কষ্ট হয়েছিল যে, কোন কোন সঙ্গীদের মনে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে সুস্থির রেখেছিলেন।" বিদেশে আর্থিক কষ্ট, সংকট এবং বিপদাবলি দ্বিগুণভাবে প্রকটিত হয়ে থাকে। এমন পরীক্ষার সময় স্থির থাকা এবং তাবলিগের কাজে রীতিমত চেষ্টা চরিত করা কোন ওয়ারেসুল আম্বিয়া (নবিদের উত্তরাধিকারী) ব্যতীত অপরের কাজ নয়। দাওয়াতে ইসলামের ব্যাপারে এরকম বিপদের মধ্যে মাওলানা সাহেব বহুবার পতিত হয়েছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার করুণায় পদস্খলন থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এসকল কাজে কষ্টের পরে সাহায্য লাভ করা আবশ্যক। একারণেই তিনি জয়লাভ করেছিলেন। এ পথে চলার পর তার আর্থিক অনটন হয়। কিন্তু প্রাচুর্য তার পদলেহন করেছিল। কাজেই শুকর আদায় করার ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন, "অবস্থা এ যে আমি আছি এক স্থানে, আর লোকে অন্য স্থান থেকে টাকা পাঠায়। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালার শত ধন্যবাদ। এবিষয়ে আমরা আমাদের ওপর এবং আমাদের ভ্রাতাগনের ওপর পাক পবিত্র আল্লাহর ফজল ও করম দেখতে পাই।"

অপর এক স্থানে তিনি তার আর্থিক সাহায্যকারীদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দোয়া হিসাবে বলেছেন যে, "ফকিরের প্রকৃত অবস্থা এ যে, হিন্দুস্থান থেকে কলকাতা, চট্টগ্রাম এবং সন্দীপ পর্যন্ত এবং ঢাকা থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত পূর্বদেশীয় সমস্ত শহর ও গ্রাম সমূহে ভ্রমণ এবং ধর্মের হেফাজত করে ফিরতাম। এটিতে ৫০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। ফকিরের খরচ সব সময়ই অত্যধিক ছিল। কিন্তু উপরোক্ত স্থানসমূহে আমার মুরিদগণ সর্বদাই আমার খেদমত করত। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন। আমি তাদের বাড়িতে গেলে যেমন খেদমত করত অন্যত্র থাকলেও তেমনই করত।"

মাওলানা সাহেব যখন কলকাতা থেকে বোটযোগে পূর্ববঙ্গে রওয়ানা হন তখন তার সাথে কয়েকজন বিশিষ্ট ও অকপট বন্ধু সঙ্গী হলেন। তিনি যশোর ও খুলনা জেলা হয়ে যখন বরিশাল জেলায় পৌছালেন। তখন সেখানকার জাহেল লোক জানতে পারল যে এ নব আগন্তুক লোকটি সালাত, রোজার অনুসরণ এবং শরিয়তের হুকুম পালন করার আদেশ প্রদান করে থাকেন। এটিতে তারা মাওলানা সাহেবের সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করল এবং অসিদ্ধ আচরণ করতে লাগল। এমনকি জাহেল লোকজন যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত হল এবং বোটের ওপর পাথর ও ঢিল নিক্ষেপ করতে লাগল। এটিতে তিনি বোট সমুদ্রের মধ্য স্থানে নিয়ে নোঙ্গর করলেন। কিন্তু যখন কতিপয় জ্ঞানী ও উর্দু ভাষাবিজ্ঞ লোক বোটে আগমন করল তখন তিনি তাদেরকে ধর্মের হুকুম এবং আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। আল্লাহ তা'য়ালার ফজল ও করমে উক্ত কতিপয় লোক মাওলানা সাহেবের মোতারজম রূপে পরিগণিত হল এবং তার আদেশ ও কথাবার্তা বাংলা ভাষায় লোকদেরকে বুঝাতে আরম্ভ করল। এটিতে লোকদের পশুর আচরণ দুর হয়ে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার জন্ম হল এবং লোকের যাতায়াত (বোটে) আরম্ভ হল। অতঃপর লোকজন ক্রমান্বয়ে হেদায়েতের পথে আসতে লাগল। মাত্র কয়েক দিনের চেষ্টা চরিতের ফলে এ জেলা (বরিশাল) হেদায়েতর পথে আসল।"[৩৮৮]

---

৩৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০-৫৩

বিদ'আতিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এটি সত্য কথা যে, প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি সমূহের মধ্যে নিশ্চই কোন না কোন পার্থিব উদ্দেশ্য বর্তমান থাকে। বিদ'আতি পীরগণ এসকল প্রচলিত কুরীতির অন্তরালে তাদের প্রবঞ্চনার পথ প্রশস্ত করে নেয়। যখন এসকল বিষয় দূর করার চেষ্টা করা হয়, তখন স্বেচ্ছাচারী ও কুপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট লোকজন ও পেটপূজারিগণ ঐ সকল সংস্কারকদের শত্রু হয়ে দাড়ায় এবং ঐ পথে বাধা প্রদান করতে আরম্ভ করে। ঐ সময়কার আহলে হাওয়া ও বিদ'আতি আলেমগণ তাদের বিদ্যার রীতিনীতির দ্বারা মাওলানা সাহেবের সংস্কার ও তাবলিগের কাজে বাধা প্রদান করতে চেষ্টা করেছিল এবং কন্টক স্বরূপ হয়ে তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছিল। তাদের জাকজমক দ্বারা মাওলানা সাহেবকে বশীভূত ও ভীত করতে চাইল। কিন্তু যিনি মস্তক হাতে নিয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ভরসা করে ঘর হতে বের হয়ে জঙ্গল, পাহাড় এবং সমুদ্র অতিক্রম করে আল্লাহ তা'য়ালার কালেমাকে প্রচার করার মানসে বের হলেন। তখন তাকে দুনিয়ার কোন বড় হতে বড় শক্তি দাবিয়ে রাখতে অথবা ঐ কাজ হতে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ, মাওলানা সাহেব সর্বত্রই নিজের কর্ম তালিকানুসারে সাফল্য লাভ করতেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্যের দ্বারা জয়লাভ করতে লাগলেন। শিরক ও বিদ'আতের মেঘ দূর হতে লাগল এবং বেশিরভাগ হঠকারীগণ বাধ্য ও শরিয়তের অনুগত হতে লাগল। মাওলানা সাহেব যখন চট্টগ্রাম শহরে পৌছালেন তখন সেখানকার ফাতেহা বাণী ও অন্যান্য কুসংস্কার সমূহ দেখতে পেয়ে তিনি তার ওয়ায নসিহতের দ্বারা সেগুলোর সংস্কার সাধনের জন্য যথাযোগ্য ভাবে বুঝাতে এবং হেদায়েত করে যেতে লাগলেন। বিশিষ্ট ও সাধারণ লোক যখন আসল বিষয় বুঝতে পারল তখন বিদ'আত ও কুসংস্কার হতে তওবা করে বহুলোক সৎপথে আসতে লাগল। যখন হেদায়েত ও সংস্কারের ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে আরম্ভ হল এবং চট্টগ্রামের বিখ্যাত বিদ'য়াতি পীর মৌলবি মোখলেসুর রহমানের মুরিদানগণ জৌনপুর মাওলানার দিকে ঝুকে পড়তে লাগল, তখন ঐ মৌলবি সাহেবের ব্যতিব্যস্ততা ও সন্দেহের সৃষ্টি হল, যে তার মুরিদগণ (আল্লাহ না করুন) মাওলানা সাহেবের দলভুক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে না বসে। কাজেই তাকে বাচবার ও রক্ষা পাবার চিন্তা ও ভাবনা পেয়ে বসল। দুনিয়ার এমন কুচিন্তা ও দুরাশায় উক্ত মৌলবি সাহেব মাওলানা সাহেবের সাথে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন এবং প্রচলিত কুসংস্কার এবং ফাতেহা খানীর জায়েজ হওয়ার বিষয় লিখিত বাদানুবাদ আরম্ভ করল। মৌলবি সাহেব ফারসি ভাষায় এটা প্রশ্ন লেখে মাওলানা সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিল। মাওলানা সাহেব দাত ভাঙ্গা প্রমাণাদি সহ সাতটি প্রশ্নের উত্তর লেখে তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পাঠকগণ ঐ সকল প্রশ্ন ও উত্তরের প্রকৃত বর্ণনা 'জখিরায়ে কারামত' নামক কিতাবের ২য় খণ্ডের 'রেসালায়ে মাকামেউল মোবতাদেয়ীন' এর বয়ানে দেখতে পারেন। এ ঘটনা ১২৭৪ হিজরীতে ঘটেছিল। ঐ সকল প্রশ্নের মধ্যে মাওলানা শাহ ইসমাইল শহিদ, মাওলানা আব্দুল হাই দেহলবীর বিষয়ে অভদ্রভাবে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এভাবে সৈয়দ সাহেবের 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া', 'তাকবিয়াতুল ঈমান' এবং 'সিরাতুল মোস্তাকিম' নামক কিতাবগুলোর প্রতিও অশ্লীল মন্তব্য করা হয়েছিল। চট্টগ্রামের মৌলবি আবদুর রহমান মাওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশ করেছিল। ঐ বিজ্ঞাপনে জৌনপুরী মাওলানা সাহেবকে মাযহাব বিরোধী ও হানাফি মাযহাব হতে খারিজ বলে প্রকাশ করেছিল। তার মিথ্যার বাড়াবাড়িদৃষ্টে যে সকল লোক 'মেফতাহুল জান্নাত' ও 'কুয়াতুল ঈমানের' প্রণেতা জৌনপুরী মাওলানাকে জানত, এ উপরোক্ত বিজ্ঞাপনগুলোর প্রতি থুথু নিক্ষেপ করতে লাগল এবং এ কারণে মৌলবি সাহেব লোক চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে গেল। (মৌলবি সাহেব) তার এক বিজ্ঞাপনে 'সিরাতুল মোস্তাকিম', 'কুয়াতুল ঈমান', 'মাসায়েলে আরবাইন', 'মিয়াতুল মাসায়েল' ইত্যাদি কিতাবগুলোর প্রতি আমলকারীদেরকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন। অথচ তার (মৌলবি) এ বিজ্ঞাপন দেখে তৎকালীন হাক্কানী আলেমগণ তাকেই কাফের বলে ফতুয়া দিয়েছিলেন। ঐ সময় সুফি মোহাম্মদ ইদরিছ নিজামপুরী সাহেব ঐ বিজ্ঞাপনটিকে কলকাতার সিন্দুরীয়া পট্রির মসজিদে মাওলানা হাফেজ আহাম্মদ মোহাদ্দেস সাহারণপুরী, মাওলানা হাফেজ জামাল উদ্দিন মোহাদ্দেস এবং

মৌলবি মুজির উদ্দিনের খেদমতে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এ বিজ্ঞাপন লেখকের পিছনে সালাত জায়েজ হবে কি না?

এটিতে উপরোক্ত তিন জন মনীষী এক বাক্যে মত প্রকাশ করলেন যে এরকম ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়া কিছুতেই জায়েজ নয়। কেননা এ ব্যক্তি একজন মুসলিমকে কাফের বলে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের কিতাবগুলোকে কাফের ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ বলে লেখেছে বলে সে নিজেই মুসলিমী হতে বের হয়ে গিয়েছে। এ সময় মৌলবি মোখলেসুর রহমান 'জামজাহানামা' নামক একটি পত্রিকায় উর্দু ভাষায় মাওলানা সাহেবের কতগুলো অপবাদ মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছিল। এটির প্রতিবাদে মাওলানা সাহেব 'আনওয়ারে কারামত' নামক অতি মনোরম ফারসি ভাষায় একটি কিতাব প্রকাশ করেন। উক্ত কিতাবে মাওলানা সাহেব এ বিবাদ সৃষ্টিকারী পীরের ধর্মান্ধতাকে সুক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছিলেন, যাকে তার বিশ্বাসী মুরিদগণ আলেম বলে আখ্যা দান করেছিল। একজন আলেমের যদি গোমরাহির এ অবস্থা দাড়ায়, তাহলে ঐ সময়কার অশিক্ষিত মুর্খদের কি অবস্থা ছিল সেটি এ একটি মাত্র উদাহরণ দ্বারা পাঠক ঐ সময়কার অধঃপতন ধর্মহীনতার অনুমান করতে পারেন। উক্ত মৌলবি সাহেবের কুমতলবের কথা স্বয়ং মাওলানা সাহেবের নিজের লেখা হতে অনুমান করা যায়, (তিনি লেখেছেন) ঐ দলের বড় নেতা মৌলবি মুখলেসুর রহমান অজুদিয়া ছিল। সে হযরত মুসা (আ.) ও এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) ও আবু জেহেলকে একই সমান বলত 'নাউজুবিল্লাহ মিন হাযা' অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে সেটি হতে বাচিয়ে রাখুন।

ঐ বিদ'আতি পীরের কুবিশ্বাসের সীমা এ পর্যন্ত ছিল যে, সে কালেমায়ে তৈয়বকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলেছিল এবং ধোকা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা নিজের নাম কালেমার সাথে সংযোগ করে দিয়েছিল। এমনকি মূর্খ মুরিদানদেরকে নিজের নামযুক্ত কালেমা শিক্ষা দিয়ে তাদের ঈমান বরবাদ করেছিল। মাওলানা সাহেব বলেন, নিরীহ জনসাধারণ তাদের পূর্ব পুরুষগণ হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পেয়েছিল এটিও তারা ত্যাগ করল। এমনকি পুরাতন কালেমার শব্দগুলো পরিবর্তন করে মুরিদদেরকে বলতেন যে কালেমা তৈয়বের অর্থ এভাবে বুঝে নাও যে 'লা ইলাহা ইল্লা শেখুল মোখলেছ।'

বিদ'আতি মৌলবি মোখলেসুর রহমান চট্টগ্রামে মাওলানা সাহেবের সাথে তর্ক বহস করার কথা বারবার প্রকাশ করত কিন্তু যথা সময় ধোকাবাজির দ্বারা প্রাণ বাচাত। একারণে মাওলানা সাহেবের যথেষ্ট সময় অপচয় হত। এ বিষয়ে তিনি বলেন, চার পাচ বছর হল এ ফকির চট্টগ্রাম শহরে আগমন করেছে। প্রত্যেক বারই বিদ'আতি সরদার মোখলেসুর রহমান আমার সাথে বহস করার সংবাদ প্রেরণ করত। কিন্তু আমি প্রস্তুত হলেই সরে দাড়াত। অবশেষে যখন আমি বোট ছাড়তে প্রস্তুত হলাম তখন আমার নিকট এক পত্র দ্বারা জানাল যে, সমগ্র শহরে আপনার ও আমার মধ্যে বহস করার কথা প্রকাশ হয়েছিল। এখন আপনি বহস না করেই চলে যাচ্ছেন। এটি উচিত নয়। আগামী দিন ১০ টার সময় ধর্মগড়ে আপনার ও আমার মধ্যে বহস হবে। আপনি কল্য ১০ টার সময় ধর্মগড়ে উপস্থিত হবেন। সেখানে সমস্ত শহরের লোক একত্রিত হবে। তখন আমি সদরঘাটে নৌকা লাগিয়ে অবস্থান করতে লাগলাম এবং উক্ত দিনে ওয়াদা মাফিক ধর্মগড়ে উপস্থিত হলাম। চট্টগ্রামের নেতা এবং আলেমগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বড় সরদার মোখলেসুর রহমান তার বাড়ি হতে ধর্মগড়ে উপস্থিত না হয়েই জেলখানায় এসে উপস্থিত হল। এটিতে তার যখন অনেক বিলম্ব হল তখন মুন্সি ফজলুল করিম মরহুম, দারোগা করিমুল্লাহ সাহেব ও মুন্সি মোহাম্মদ ফয়েজ সাহেবগণ ঐ সরদারকে আনার জন্য গমন করলেন। নানা প্রকারে বুঝিয়েও অবশেষে উপস্থিত করান সম্ভব হল না। এটি খুবই পরিষ্কার কথা যে যদি তার নিকট সঠিক ফাতেহ রুসমীর কোন প্রমাণ থাকতো তাহলে এরকম অপমান কিছুতেই সহ্য করতেন না।

ফলত এভাবে জৌনপুরী মাওলানা সাহেবের বেশিরভাগ আলেমদের সাথে তাকলীদ, কিয়াম, মিলাদ শরিফ, বিবাহ ব্যাপারে ফাতেহা রুসমী, জুম'আর সালাত ফরয হওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মৌখিক এবং লিখিতভাবে তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাকেই বিজিত করেছিলেন। এভাবে তার সাথে খ্রিষ্টান, দাহুরী, শিয়া এবং ওহাবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাথে বহস চলেছে। তিনি তাদেরকে উপর্যপরি অপমানিত করে যেতে লাগলেন। কিয়ামের বিষয় পাটনার মৌলবি আবুল হোসেনের সাথে, ঝিঙ্গামাছ (চিংড়ি মাছ) হালাল হওয়ার বিষয়, কলকাতার মৌলবি মোহাম্মদ সিদ্দিক পাঞ্জাবীর সাথে জুম'আর সালাত জায়েজ হওয়ার বিষয় নিয়ে, বাংলার বরিশাল জেলার মৌলবি আব্দুল জব্বার এবং দুদা মিয়ার সাথে তর্কবিতর্ক ও কথা কাটাকাটি চলেছিল। তিনি তাদেরকে যুক্তিসম্মত কথা দ্বারা লা জওয়াব (নিরুত্তর) করে দিয়েছিলেন। এটি ব্যতীত কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে পাদ্রীদের সাথে মোবাহেসা হয়েছে এবং অনেকেই অক্ষম হয়ে তার হাতে তওবা করতঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।"[৩৮৯]

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস' প্রসঙ্গে

ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ফকির মজনু শাহের 'ফকির আন্দোলন' স্বাধীনতার মাইলফলক হিসেবে অভিহিত। তিতুমীর (সৈয়দ নিসার আলী) কলকাতার নারিকেলবাড়িয়ায় একটি মজবুত বাশের কেল্লা নির্মাণ করেন এবং সেখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ দখল করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইংরেজ বাহিনীর অধিনায়ক আলেকজেন্ডার তিতুমীরের কাছে পরাজিত হন এবং পালিয়ে যান। লর্ড বেন্টিংক তিতুমীরকে পরাস্ত করতে শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। তিতুমীরের লাঠিয়াল বাহিনী ইংরেজদের প্রতিরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর শহিদ হন। হাজি শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের নামে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু হয়। ফরয (অবশ্যই পালনীয়) শব্দ থেকে ফারায়েজী শব্দের উৎপত্তি। ১৮৪০ সালে হাজি শরিয়তুল্লাহ মৃত্যুর পর তার একমাত্র ছেলে মহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া) এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফারায়েজ আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন নামে শুরু হলেও পরে এটা রাজনৈতিক রূপধারণ করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, নীলচাষের বিরুদ্ধে দেশীয় চাষীদের আন্দোলন (১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ), মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা (অবশ্য পরে তাকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়। মৃত্যুর পর রেঙ্গুনেই তাকে সমাহিত করা হয়) নানা সাহেবের কানপুর বিদ্রোহ, ঝাশির রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর স্বদেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণদান এবং নাটোরের রাণী ভবাণীর বিদ্রোহ ইংরেজদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া, মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরানো ও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করতে থাকে। মুসলিমদের জাতীয় চেতনা, ঐক্য এবং জিহাদি তেজ ইংরেজদের ভাবিয়ে তোলে। একজন চতুর ইংরেজ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার মুসলিম আলেম-ওলামাদের ধর্মীয় মতভেদ ও কোন্দলের সুযোগ নিয়ে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে 'দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস" বইটি প্রণয়ন করেন । তার লেখা বইটির ১১৬ পাতার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকেই বিষয়টি সহজে বুঝা যায় :

"I propose, therefore, to scrutinize the Sunni Decisions with a view to ascertaining the effect which they will have on the more zealous Muhammadans; men with whom the sense of religious duty is the rule of life, and whose minds are

৩৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪-৭০

uninfluenced either by fear of danger or by habits of prosperous ease. For it is no use shutting our eyes to the fact that a large proportion of our Muhammadan subjects belong to this class. During a third of a century they have kept on foot a rebel army, first against Ranjit Singh, and afterwards against ourselves as his successors. In the distant Province of Bengal they have equipped band after band for the Frontier Camp. Every village, indeed almost every family, has followed their example and contributed to the cost of the war. Our prison gates have closed upon batch after batch of unhappy misguided traitors; the Courts have condemned one set of ringleaders after another to lonely islands across the sea; yet the whole country continues to furnish money and men to the Forlorn Hope of Islam on our Frontier, and persists in its bloodstained protest against Christian Rule."

মুসলিমদের মধ্যে তখন দুটি মতবাদ বিরাজ করছিল। একটি কট্টরপন্থী মতবাদ, যা হচ্ছে ইংরেজ শাসক বিধর্মী বিধায় তাদের শাসনামলে ভারতে ইসলামি অনুশাসন না মানা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজদেরকে ভারত থেকে বিতাড়ন করা। অপর মতবাদের যুক্তি ছিল যেহেতু ইংরেজ সরকার মুসলিমদের ধর্মীয় কাজে বাধা দিচ্ছে না সে সুযোগ নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নেয়া। হযরত মওলানা কারামত আলী (র.) এ মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ভারতের প্রগতিশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাদের নাম বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ আছে তাদের উদ্যোগে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে Mohammadan Literary Society Of Calcutta নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। আব্দুল লতিফ উক্ত সংগঠনের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর ঐ সমিতি প্রচুর লোক সমাগমের উপস্থিতিতে 'কলকাতা ঘোষণা' নামে একটি পেমফ্লেট প্রচার করে। উক্ত ঘোষণায় ভারতকে 'দারুল হরব' না বলে 'দারুল ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করেন। মাওলানা কারামত আলী (র.) 'দারুল ইসলাম' না বলে ভারতকে 'দারুল আমান' বলেন এবং তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে শরিয়াহ মোতাবেক মুসলিমদের চলার জন্য এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। মোহামেডান সোসাইটির ঐ সভায় মদিনা শরিফের সম্মানিত বাসিন্দা এবং নবি করিম (স.) অন্যতম সাহাবি আবু আইয়ুব আল আনসারীর বংশধর শেখ মোহাম্মদ এফেন্দা আলী আনসারী উপস্থিত থেকে ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করেন। তার বক্তৃতায় তিনি মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক, স্পেন ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তখনকার সময়ে মক্কা-মদিনা থেকে বহু আলেম অবাধে ভারতবর্ষে এসে স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন, ইংরেজদের অনুমতি ছাড়াই ভারতে অবস্থান করতেন। জনাব আলী আনসারী নিজেও পরপর চারবার ভারতবর্ষে আগমন করে দীর্ঘদিন থেকেছেন, স্থানীয় আলেম-ওলামা ও সাধারণ মুসলিমদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। জুম'আর নামায ও ঈদের নামায আদায় এবং অন্যসব ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকায় তা ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দেবার অনুকূলে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। কলকাতা মোহামেডান সোসাইটির সমাবেশে শেখ মোহাম্মদ এফেন্দা আলী আনসারীর উপস্থিতি সমিতির ভাবমূর্তি বাড়ালেও ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণায় ঐ সভায় কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওহাবীরা ভারতকে 'দারুল হরব' বা 'শত্রুর দেশ হিসেবে ঘোষণা দেবার অনুকূলে তাদের যুক্তি ছিল যে, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসক নেই, মুসলিম আইন নেই, মুসলিম বিচারক নেই। যে দেশে ইসলামি শাসন নেই সে দেশ 'দারুল ইসলাম' হতে পারে না। তাদের মতে ইংরেজগণ বহিরাগত শত্রু। তাদের ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য জিহাদ করা ফরয।

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস' বইটির ১১৬ পাতার নিম্নোক্ত উদ্বৃতাংশ থেকেই বিষয়টি সহজে বুঝা যায়-

"I am very sorry to say that the effect of the Decision of the Calcutta Society on this numerous and dangerous class will be simply nil. The pamphlet, however, exhibits two distinct lines of argument against Holy War, one of them the view of the Society itself. the other the Formal Decisions of the Law Doctors of Northern India.

এক কথায় কলকাতা ঘোষণা অমীমাংসিতই থেকে যায়। এতে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও আত্মকলহ আরো বেড়ে যায়। উইলিয়াম হান্টার তার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস' বইটিতে পরস্পরবিরোধী দুটি মতবাদকে এমনভাবে সাজিয়ে লেখেছেন যে, তাতে মনে হয় এ বাকযুদ্ধের জন্য ইংরেজদের ইন্ধন ছিল। ভারতবর্ষের মুসলিমদের কীর্তি, গৌরব ও ঐতিহ্য যা হাজারও বছর ধরে অম্লান হয়ে রয়েছে, হান্টার সাহেব তার ঐ বইতে সেগুলোর উল্লেখ করেননি। মুসলিমদের ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনায় না এনে নেতিবাচক দিকগুলোরই অবতারণা করেছেন তিনি। হযরত মাওলানা কারামত আলী (র.) ছিলেন একজন দূরদর্শী ব্যক্তি। ঐ সময়ে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা দিলে মুসলিমদের ভারত ছাড়তে হত অথবা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হত। তা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব ছিল না। এটা হলো একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, যা অগ্রসরমান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো পিছিয়ে দিত।[৩৯০]

প্রকৃতপক্ষে যদি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তার মুর্শেদের পরামর্শে সেসময় বাংলাদেশে আগমন না করতেন, আরো যে কতকাল এ অঞ্চলের মুসলিমগণ মারাত্মক সব কুসংস্কার ও কুপ্রথার অতল গহ্বওে নিমজ্জিত থাকত তা কেবল মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি তার জ্ঞান, দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত সকল ভুল ভেঙ্গে দিয়ে কুর'আন ও সুন্নাহর প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার সেই প্রচেষ্টা এখনো বাংলার মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

৩৯০. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৭

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশী মুসলিমদের মাঝে কুসংস্কার দূরীকরণে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর অবদান

তিনি পৃথিবীতে বেচে ছিলেন ৭৫ বছর। এই ৭৫ বছরের জীবনে ৫৭ বছর ব্যয় করেছেন ইসলাম প্রচার এবং সমাজ সংস্কারের কাজে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় গেড়ে বসা কুসংস্কার, শিরক এবং বিদ'আতের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার দৃপ্ত শপথে ছুটে চলেছেন গোটা বঙ্গ আসামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে সফর করেছেন বছরের পর বছর। বাড়ি ঘর কোথায়, সহায় সম্পদ কোথায়-ভুলে গেছেন সব। লিপ্ত ছিলেন একমাত্র মানুষের কল্যাণে। মানবতার কল্যাণ সাধনে কেটে গেছে তার জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়কাল। বজরা (এক ধরণের নৌকা) ভ্রমনে শুধু বঙ্গ আসাম অঞ্চলেই কেটেছে তার জীবনের প্রায় ৫২ টি বছর। বস্তুত মহান এই সংস্কারকের জীবনের গোটা সময়টাই তিনি অতিবাহিত করেছেন শিরক, বিদ'আত এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তার আপ্রাণ প্রচেষ্টায়, অবিরাম দাওয়াত ইলাল্লাহর আহবানে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহনে ধন্য হয়েছে। বাংলাদেশী মুসলিমদের সমাজে কুসংস্কার বিতাড়িত করতে তার নিরন্তর প্রচেষ্টার বর্ণনাই এ অধ্যায়ে আলোচনা করছি।

বাংলা ও আসামের বিশৃংখল অবস্থা

জনাব সৈয়দ সাহেব যে সময়ে জৌনপুরী মাওলানা সাহেবকে বাংলা ও আসামে তাবলিগ ও হেদায়েতের জন্য আদেশ প্রদান করেন, তখন বাংলা ও আসামের ধর্মীয় দুর্দশা সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। সাওম ও সালাত ত্যাগ করে লোকজন যথেচ্ছা চলাফেরা করত। ধর্মের সম্পর্ক তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। ইলমে দ্বীনের সাথে এমনকি দূরবর্তী সম্পর্কও ছিলনা। বেশরা পীরদের প্রতারণা, বাজে ফকির এবং ধোকাবাজ যোগীদের রাজত্ব সর্বসাধারনের অন্তঃকরণে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল এবং ঐসমস্ত লোকদেরকে নিজেদের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রস্থল বলে মনে করত। বিবাহ শাদিতে, অসুখে এবং বিপদাপদের সময় তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও মোনাজাত করত। আল্লাহ তা'য়ালাকে ছেড়ে আল্লাহর সৃষ্ট মানবের পূজা ও সিজদা করত। কবর, দরগাহ এবং বৃক্ষ সমূহের নামে মানত করত এবং তাদের সামনে নিজেদের আবশ্যক দরখাস্ত পেশ করত। তাদের নামে নজর করা হত। মসজিদগুলো লুপ্তাবস্থায় ছিল। আর যেগুলো অলুপ্ত ছিল সেগুলোতেও গবাদি পশু সকল বাধা হত। পর্বাদিতে হিন্দুদের রীতি-নীতি অনুসারে কাজ চলত। বেপর্দার প্রচলন আমভাবে ছিল। মোহাররম ও গায়ের মোহাররম (যে সকল স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ নাজায়েজ) এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। পুরুষ ও মেয়ে লোকের সতর ঢাকা এবং পোশাক পরিচ্ছদের কোন ভেদাভেদ ছিল না। বেশিরভাগ লোক লেংটি পরিধান করত। হিন্দুদের আকৃতি প্রকৃতি ব্যতীত এমনকি হিন্দুদের নামে নাম রাখা হত। খারেজী ফেরকা যারা আমলকে ইমানের অংশ বলে বে-আমল লোকদেরকে কাফেরের মধ্যে গন্য করে মুসলিমদেরকে কাফের বলত তারা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এরকম ২০টি ফেরকা (দল) ইসলামের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কর্তন করতে চেয়েছিল। মূলকথা, চারদিকেই গোমরাহি ও অন্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং ইসলামের সৌন্দর্য নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। দেশ নীচতা ও বিশৃঙ্খলতার শেষ সীমায় পৌছেছিল। ঠিক এরূপ একটি উচ্ছৃংখল যুগে এরূপ একজন হাদী ও সৎপথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল যিনি লোকের অন্তরে ও মস্তিষ্কে দ্রুতগতিতে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। যার পবিবর্তনের ফলে এবং মানসিক শক্তির বলে লোকের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। দেশ হেদায়েত পিপাসু ছিল ও হেদায়েতের বিশেষ আবশ্যক ছিল। এরূপ দেশে ইসলাম প্রচার ও আল্লাহ তা'য়ালার কালেমাকে উচ্চ করে ধরা জেহাদে আকবর (বৃহত্তম যুদ্ধ) ছিল। একথা হযরত সৈয়দ সাহেব, স্বয়ং জৌনপুরী

মাওলানা সাহেবকে বলেছিলেন এবং শুধু ইঙ্গিত দ্বারাই তিনি এ রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এ মহান কাজ (তাবলিগ) জৌনপুরী মাওলানার দ্বারাই সমাধা করানো আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা। এজন্য মাওলানা সাহেব বাংলাদেশ হেদায়েত করাকে জীবনের উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ কাজকে স্বীয় জীবনের একটি অংশ বিশেষে বরণ করে নিয়েছিলেন। একাজ তিনি প্রাণপণে করে গেছেন। কাজেই তিনি তার জীবনের ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে ৫৭ বছর শুধু ধর্ম সেবায় অতিবাহিত করে গিয়েছেন। তন্মধ্যে ৫১ বছর শুধু বাংলা ও আসামে ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন এবং শেষে এখানেই রয়ে গেলেন।

হযরত সৈয়দ সাহেবের এটি এক বিশেষ কারামত ছিল যে তিনি মাওলানা কারামত আলী সাহেবকে বাংলাদেশে প্রেরণ করে সেখানকার লোকদেরকে প্রকৃত মুসলমানে পরিগণিত করে দিয়েছিলেন। মাওলানা সাহেব আজমগড়, গাজীপুর, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর এবং জৌনপুরের জেলা সমূহে তাবলিগ ও ইসলাম প্রচারের কাজে এক নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করেছিলেন এবং লোকদেরকে রোজা, নামাজের এবং শরিয়তের তাবেদার করেছিলেন। জৌনপুরের জামে মসজিদকে গুণ্ডাদের হাত থেকে পাক পবিত্র করে জুম'আ, জামা'আত এবং সাপ্তাহিক ওয়ায নসিহতের প্রচলন করেন। জামে মসজিদের আবাদের পর সেখানে কুর'আন শিক্ষাকল্পে মাদ্রাসায়ে কো'রয়ানিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। ফিকাহ শিক্ষাদান কল্পে হানাফিয়া মাদ্রাসার ভিত্তি দৃঢ় করেছিলেন। অতঃপর তিনি নিজের মুর্শেদের আদেশ ও অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ ভ্রমনের ইচ্ছা করেন। জৌনপুর থেকে কলকাতা পৌছাতেই তার প্রায় এক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা ঐ সময় ভ্রমণ করা আজকালের মত এত সহজসাধ্য ছিল না। শোনা যায়, ঐ সময় কলকাতা গমনকারীকে বেনারস যেয়ে রেলগাড়ীতে আরোহণ করতে হত। জৌনপুরে কোন রেলগাড়ী ছিল না। ফলকথা, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের ভিতর দিয়ে কলকাতা উপস্থিত হন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করতঃ ইসলাম প্রচারের কাজ সমাধা করেন। তিনি যখন কলকাতা উপস্থিত হন তখন সেখানে হযরত সৈয়দ সাহেবের সহায়তাকারী ও খলিফাদের মধ্যে মাওলানা হাফেজ জামাল উদ্দিন, কলকাতা মাদ্রাসার ১ম শিক্ষক মোহাদ্দেছ মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াজিহ, কলকাতার শহরকাজী কাজী আব্দুল বারী এ মহান ব্যক্তিদের সৈয়দ সাহেবের নিকট থেকে খেলাফতের এজাজত লাভ হয়েছিল এবং অবসর মত তারা সেখান থেকে জিকির ও ধর্মপোদেশের নিয়ম প্রচলন করেন। উপরোক্ত মহামান্য ব্যক্তিগণ ব্যতীত আরও বহু মহান লোক ঐ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মাওলানা সাহেবের কলকাতা আগমনের দরুন প্রত্যেকেরই অন্তরে এক বিশেষ আনন্দেও সাড়া পড়ে যায়। মাওলানা সাহেবের কলকাতায় কিছুদিন অবস্থান এবং ওয়ায নসিহতের দরুন সর্বসাধারণ তাদের পুরাতন বিধর্মীয় কাজকর্ম, রীতিনীতি সমূহ ত্যাগ করে তওবা করতঃ তার তরিকায় ভর্তি হতে লাগল এবং ধর্মীয় আলো চতুর্দিকে প্রসারিত হতে লাগল। পূর্ব বাংলায় ধর্ম প্রচারের তালিকা তিনি কলকাতায় বসে প্রস্তুত করেন। তার সুযোগ্য পুত্র জনাব মাওলানা ফয়েজ আহম্মদ সাহেব কলকাতায়ই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (ফয়েজ আহম্মদ) তার পিতার কাজ পূর্ণভাবে সমাধা করে গেছেন।

জনাব মাওলানা জৌনপুরীর বাংলাদেশে তাবলিগকাল প্রায় ৫১ বছর যা সাধারণত প্রচারিত এবং আহসানুত তাওয়ারিখ, আকিয়াতুল মাশাহির, তাহুসিনুল হুলিয়া ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত এবং নিজ মাওলানা সাহেবের মুদ্রিত লেখা সমূহ থেকে জানা যায়। কিন্তু মাওলানা হাফেজ আহম্মদ সাহেব যে সময় কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন সেটি মাওলানা সাহেবের প্রথম সফর বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা মাওলানা ফয়েজ আহম্মদ সাহেব কলকাতায় ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর মাওলানা কারামত আলী সাহেব ১২৯৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দাড়ায় মাত্র ৪০ বছর। কিন্তু মাওলানা সাহেব বাংলাদেশে ৫১ বছর তাবলিগের কালের সাথে এটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে বুঝা যায় যে মাওলানা সাহেব এর পূর্বেও বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। তবে এর কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ এবং অবস্থা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। অনুমান এবং ধারণা

থেকে বুঝা যায়। কেননা এ ভ্রমণে মাওলানা সাহেবের সাথে তার পরিবারবর্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র সকলেই ছিলেন। একজন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে অজানা অচেনা দেশে সর্বপ্রথম স্ত্রীপুত্রগণ সহ সামুদ্রিক স্থানে ভ্রমণ করা ধারণার বাইরে। তবে এটাই মনে হয় যে তিনি ১২৫০ হি. আগে একাকীই দুই একবার বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তার পরিবার সঙ্গে রেখে তাবলিগের কাজে লিপ্ত থাকাকে ভাল মনে করেছিলেন। এমনিভাবে ১২৫০ হিজরীর ভ্রমণকালে হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা কারামত আলী সাহেব ৫১ বছরের বেশি কাল বাংলাদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। যা তার নিজের লেখনী থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেন, "ফকিরের অবস্থা এ ছিল যে হিন্দুস্থান থেকে কলকাতা, চট্টগ্রাম ও সন্দীপ পর্যন্ত এবং ঢাকা থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত সমুদয় শহর পূর্ববাংলার গ্রামসমূহে সর্বদাই ভ্রমণ করতে হত এবং ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত। এতে ৫০ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিল।"[৩৯১]

নোয়াখালী ভ্রমণ ও সেখানকার লোকদের অবস্থা

বরিশাল জেলার চতুর্দিকে যখন তাবলিগ ও হেদায়েতের আলো প্রকাশিত হল এবং মোবাল্লেগীন তার পবিত্র সঙ্গলাভ হতে অবসর গ্রহণ করে আদেশ ও সনদ গ্রহণ করতঃ হেদায়েতে ব্রতী হলেন। তখন তিনি তার পীর ভাই সৈয়দ সাহেবের অকৃত্রিম খলিফা, অলিয়ে কামেল, শেখে তরিকত হযরত মাওলানা ইমামউদ্দিন সাহেবের উৎসাহ দানের ফলে নোয়াখালী জেলার দিকে রওয়ানা হন। জনাব মাওলানা সাহেবের নোয়াখালী উপস্থিতির ফলে সেখানকার লোকজন গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসার সাথে তার সামনে উপস্থিত হল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুগত বাধ্য হয়ে পড়ল। তারা মাওলানার পক্ষে প্রকৃত আনসার রূপে পরিগণিত হল এবং পতঙ্গের ন্যায় সমবেত হতে লাগল। মাওলানা সাহেবের খেদমতকে নোয়াখালীবাসী পরকালের সম্বল রূপে গ্রহণ করল। তাদের সচ্চরিত্রের দরুন মাওলানা সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মাওলানা সাহেবের আন্তরিক সন্তুষ্টি ও দোয়ার ফল আজ পর্যন্ত নোয়াখালীতে অবশিষ্ট রয়েছে। যেহেতু শরিয়তের তাবেদার ও ইসলামি পোশাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে নোয়াখালী জেলার অধিবাসীগণ অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি অগ্রগন্য। এ জেলায় বেশি সংখ্যক মাদ্রাসা এবং নামাজির দ্বারা পরিপূর্ণ মসজিদগুলো প্রত্যেক গ্রামে দেখতে পাবেন। একজন নেহায়েত দরিদ্রের বাড়িতেও শরিয়তের পর্দা দৃষ্টিগোচর হবে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাতয়াতের জন্য পালকি ও নৌকা ব্যতীত বোরকারও প্রচলন আছে। একান্ত গরীবরাও চাদর এবং ছাতি ব্যবহার করে থাকে। নোয়াখালী জেলায় গোসল করার জন্য পুষ্করিণী প্রস্তুত করা হয়। মেয়েলোকদেরকে বেপর্দার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং পর্দাকে কায়েম রাখার জন্য বাশের বেড়া দ্বারা বিস্তৃত সুরঙ্গ তৈরি করে। এসকল বেড়া মেয়েলোকদের গোসলের পুষ্করিণীর সাথে যোগাযোগ থাকে। মেয়েলোকেরা এসকল সুরঙ্গ পথের ভিতর দিয়ে অনায়াসে পুষ্করিণীতে এসে গোসল করে যাতে কারো সাথে সাক্ষাৎ না হয়। মেয়েলোকদের গোসলের জন্য এ ব্যবস্থা দেখে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। ধর্মের গুরুত্ব ও ভালবাসা (পর্দার ন্যায়) এমন কঠিন কাজকে কেমন আরামদায়ক এবং সহজ করে দিয়েছে। নোয়াখালীর মুসলিমদের এ নিয়ম পদ্ধতি একটি আদর্শ স্বরূপ। এ জেলার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ছেলেরা 'আসসালামু আলাইকুমের' মত সুন্নতের পায়বন্দ। আলেম, ফাজেল এবং ছাত্রের সংখ্যা এ জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি। বাংলা ও আসামের জেলা সমূহে বেশিরভাগ নোয়াখালী জেলার ধর্ম প্রচারক ও শিক্ষকগণ দীনি খেদমত করে আসছে এবং জনাব মাওলানা সাহেবের হেদায়েতের উম্মুক্ত পথে লেগে আছেন। ভ্রমণ উপলক্ষে এ ফকির অনেক বার বাংলার মুমিনশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ত্রিপুরা, এবং আসামের গোয়ালপাড়া,

৩৯১. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯-৪৪

কামরূপ ও ধূবড়ী, গৌহাটী, দরং জেলা সমূহের গ্রামে গ্রামে যাতয়াত করেছি। সব জায়গায় নোয়াখালীর মৌলবি সাহেবদেরকে ধর্মের কাজে কায়োমনে চেষ্টা উদ্দ্যোগ করতে দেখতে পেয়েছি। গ্রামসমূহে তারা মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন এবং জুম'আ ও জামা'আতের দ্বারা মসজিদগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। ছেলেমেয়েদেরকে কুর'আন পাক ও ধর্মের জরুরী মাসায়েল সম্বন্ধে শিক্ষাদান এবং কুর'আন পাঠ মশক (অভ্যাস) করান। এসকল কাজ জনাব মাওলানা সাহেবের দোয়ার প্রতিফল স্বরূপ। এ জেলা সমূহের মধ্যে সন্দীপ নামে একটি দ্বীপ আছে। আমি যখন সন্দীপ যাই তখন জানতে পারলাম যে সেখানে সাত শত আলেম বর্তমান আছে। এ দ্বীপেই আমার মাননীয় পিতা মাওলানা হাফেজ আব্দুল আউয়াল সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। এ দ্বীপের আলেম এবং তাদের এলেমের উন্নতি, সর্বসাধারনের চরিত্রের উন্নতি ও অতিথি পরায়নতার বিষয় মাননীয় পিতা তার স্বরচিত 'আল-মোজাল্লাতুল-আদিব লেআজেল্লাতে সন্দ্বীপ' নামক একটি আরবি কিতাব থেকে কিছুটা জানা যায় যা শিখবার উপযোগী।"[৩৯২]

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের চতুর্দিকে মাওলানা সাহেবের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং কলকাতায় এসে মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রাপ্ত বহু আলেম তার নিকট বাই'য়াত হয়েছিল। যখন তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং লোকদেরকে হেদায়েতর গল্প শুনালেন। তখন মানুষের ভিতর বদ আমল ও অজ্ঞতার দরুন ঈমানের যে তেজ নিভে গিয়েছিল তা পুনর্বার প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ইসলামের যে আলো বিদ'আতের অন্ধকারময় পর্দার আড়ালে আবৃত ছিল, তাতে ঐ আলো প্রকাশিত হবার জন্য উকি মারতে লাগল। যে সময় মাওলানা সাহেব বাংলাদেশে শুভাগমন করেন, তখন তিনি দেখতে ও শুনতে পান যে বহু স্থানে ইসলাম অকর্মণ্য হয়ে রয়েছে এবং সেখানে তাবলিগের অত্যন্ত আবশ্যক। ঐ সময় মাওলানা সাহেব বিশেষ তৎপরতার সাথে ঐ সকল স্থানে ভ্রমণ করেন এবং এ বিষয়ে তার ওপর যত বিপদাপদ উপস্থিত হয়েছে তিনি তা বিশেষ ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে সহ্য করতঃ হেদায়েত করতে, ওয়ায গুনাতে এবং শরিয়তের আদেশ বর্ণনা করতে থাকেন। কঠিন হতে কঠিন বিপদও তাকে তার ইচ্ছা ও দৃঢ় আকাঙক্ষাকে বাধা দিতে পারেনি। পর্বত সমান কষ্ট ও বিপদ এসে তাকে বাধা দান করেছে। কিন্তু তার পবিত্র পদ নিক্ষেপ সদাই দৃঢ় ছিল। বরং ধর্মের জন্য আত্মবিস্মৃতি ভাব আরও প্রবল ভাবে ধারণ করল। মাওলানা সাহেবের পুরাতন খাদেমদের থেকে শোনা গেছে যে, কোন কোন স্থানে মাওলানা সাহেবকে কঠিন কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কোন কোন স্থানে উপবাসও থাকতে হয়েছে। আবার কোথাও একমাত্র কদু সিদ্ধ করে উপবাস ভঙ্গ করেছেন। এক জায়গায় কিছু দিন যাবত কেবল কচু খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। জনাব মাওলানা সাহেব ও তার খাস সঙ্গীগণ এ অবস্থাকে পরকালের সম্বলরূপে গ্রহন করে নিয়েছিলেন। কোন কোন স্থানে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ কারীগণ মাওলানা সাহেবকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করেছিলেন। তিনি ধর্ম বিরুদ্ধাচরণকারী শত্রুদের শত্রুতার ভয়ে সাবধানতা স্বরূপ বোট সমুদ্রের তীর হতে বহুদূরে নোঙ্গর করে থাকতেন। বাংলা অনুবাদকের সাহায্যে ধর্মীয় মাসলা মাসায়েল সমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে লোকদের মধ্যে প্রচার করতেন। অজ্ঞ ও কুরীতি পরায়ণ সর্বসাধারণ এসকল ধর্মীয় আদেশ ও মাসায়েলকে নতুন কথা এবং কুরীতির বিরুদ্ধেও নিজেদের বিশ্বাসের বিপরীত সাধন মনে করে শত্রুতা ও কষ্ট দেয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সমুদ্রের তীর হতে বোটের ওপর প্রস্তর এবং ঢিল নিক্ষেপ করত। নানা প্রকারের কষ্ট প্রদানের চেষ্টা করত। সমুদ্রে অবস্থান কালে মাওলানা সাহেবের ওপর এরকম প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে তখন তার মনে তায়েফ নগরীর ঘটনা স্মরণ করতঃ সুন্নতে নবি আদায়ের সুযোগে আনন্দিত হয়েছিলেন। হযরত নবি করিম (স.) যখন তায়েফ গমন করেন তখন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ তাদের হেজাজী বন্ধুর সমাদর তায়েফের প্রস্তর দ্বারাই করেছিল।

৩৯২. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩-৫৫

এ প্রকারের ঘটনা বাংলাদেশ ভ্রমনের প্রথমাবস্থায় বহু স্থানে ঘটেছিল। সমুদ্র তীরবাসী দুই চার দিন যখন ঐ সকল কথাবার্তা দূর হতে শ্রবণ করত এবং মাওলানা সাহেবের দৃঢ়তা ও ইসলামি শান শওকত দর্শন করে তারা বুঝতে পারল। এ ব্যক্তি বিনা লাভে আমাদেরকে যে সকল কথা শিক্ষা দেন তাতে আমাদের উপকার ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। অতঃপর লোকজন দুই একজন করে বোটে আগমন করত ও তওবা করে মাওলানা সাহেবের নিকট বাই'য়াত হত এবং বাধ্য ও শরিয়তের অনুসরণকারী হয়ে যেত। এ সময় মাওলানা সাহেব হেদায়েতের একটি মাত্র পথ অবলম্বন করেছিলেন। আর সেটি হল লোকদেরকে নম্রতার সাথে বুঝিয়ে শিরক হতে তওবা করাতেন। কালেমা পাঠ করিয়ে শ্রবণ করতেন এবং সেটি শুদ্ধ করে অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। ধর্ম বিশ্বাস ঠিক করার জন্য চেষ্টা করতেন। কেননা ধর্মের ভিত্তি সেটির উপরেই স্থাপিত। তদ্রুপ সালাত, রোজা, হজ ও যাকাত ইসলামের এ চার স্তম্ভের ওপর বাই'য়াত গ্রহণ করতেন এবং তাদের অনুসারীদের অঙ্গীকার করাতেন। এরূপ হেদায়েতর পর অজ্ঞতার দরুন রীতিনীতি এবং বিদ'য়াত সমূহের খণ্ডন করতঃ সুন্নতের প্রকৃত প্রধান পথে আনয়ন করতেন। এপর্যন্ত পৌছে ঐ ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী ও খাটি মুসলিম রূপে পরিগণিত হত। মাওলানা সাহেবের খলিফা, মুরিদান ও সঙ্গলাভ প্রাপ্ত লোকগণ যিনি দেখেছেন, তিনি তাদের তাকওয়া, পরহেজগারী, আল্লাহর উপাসনা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাক্ষ্য স্বরূপ হতে পারেন। মাওলানা সাহেবের মধ্যে একটি খাস বরকত পরিদৃষ্ট হয়। তার মুরিদান বিশ্বাসী এবং সঙ্গ লাভ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তার রং এত তাড়াতাড়ি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত যা আগে হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং মুরিদই যেন পীরের মত হয়ে যেত। মাওলানা সাহেব পাচ ওয়াক্তের সালাত সর্বদাই মসজিদে আদায় করতেন এবং নামাজের পরে মোক্তাদিদেরকে আবশ্যকীয় মাসায়েল বর্ণনা করতেন। তার উপদেশ লোকের ওপর আন্তরিকভাবে কার্যকরী হতে দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করত। কেননা তারা ভাবত অন্যান্য আলেমগণ আমাদেরকে যখন এসকল বলেন তখন আমাদের মনে পানির ওপর অঙ্কন করার মত কোনই কার্যকরী হয়না। কিন্তু এখন এমনকি হল যে তার (মাওলানা সাহেবের) মুখ হতে কথা বের হতে না হতেই লোকের মনে সেটি কার্যকরী হচ্ছে। লোকের এসকল কথার প্রতিউত্তরে মাওলানা সাহেব বলতেন, সে কথাগুলো যদিও আমার মুখ হতে নির্গত হয়। কিন্তু সেটির প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় যে, সেটি হযরত সত্য পীর মুর্শেদের শুভদৃষ্টি, খাস দোয়া এবং সঙ্গ লাভের দ্বারা। নতুবা আমি ঐ মানুষই যা হযরতের যিয়ারত লাভের আগে ছিলাম। আমার বিদ্যা, ওয়ায ও উপদেশ সমূহের মূল উৎস পূর্বেরই। কিন্তু প্রথমে শরীর মাত্র শরীরই ছিল এবং নাম কেবল নামই ছিল। এখন শরীরের সাথে প্রাণ এবং নামের সাথে কাজ যুক্ত হয়েছে। আমার এ সমুদয় গুনাবলি মুর্শেদে কামেলের সঙ্গলাভ ও দোয়ার প্রতিফল স্বরূপ।"[৩৯৩]

জুম'আর সালাত অমান্যকারীগণ

বাংলাদেশে একদল লোক জুম'আ অমান্যকারী হিসাবে বর্তমান আছে। এদেরকে দেশী লোকে 'লা-জুমআ' বলে থাকে। এরা বাংলাদেশে জুম'আর সালাত জায়েজ বলে স্বীকার করে না। যারা জুম'আ পাঠ করে তাদেরকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখে থাকে এবং তাদের সাথে হিংসা ও শত্রুতাচরণ করে থাকে। তারা জুম'আর সালাত বাদ দেয়ার জন্য এতই উত্তেজিত যে, তারা মনে করে যে জুম'আ আদায় করার মত এত বড় গুণাহের কাজ ইসলাম ধর্মে আর নেই। অনেক স্থানে এমনও শোনা গিয়েছে যে লাজুম'আর দল জুম'আ আদায়কারীদের পিছনে সালাত পড়ে না। এমনকি বিবাহ পর্যন্ত দেয়না বা করায় না। ঢাকা জেলার বহুলোক আমার নিকট বলেছে যে, লাজুম'আগণ আমাদের সাথে বিবাহের সম্বন্ধ করে না। অথচ বর্তমানে লাজুম'আদের পীর তার দুই মেয়ের বিবাহ এমন দুইজন লোকের সাথে দিয়েছেন, যারা সর্বদাই জুম'আ পড়ে থাকে। জৌনপুরী মাওলানাদের সাথে সম্পর্ক রেখে থাকে। মূলকথা এ

৩৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮-৬১

দল জুম'আ না পড়ার বিষয়ে খুব কঠিন মত পোষণ করে। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরিয়ত উল্লাহ এবং তার ছেলে দুদা মিয়া সাহেব ছিলেন। এজন্য তাদের দলকে 'দুদাই' দলও বলা হয়ে থাকে। হাজি শরিয়ত উল্লাহ এবং দুদা মিঞা দুজনই মাওলানা জৌনপুরীর সমসাময়িক ছিলেন। লা-জুম'আ, জুম'আ অমান্যকারীদের ধর্মবিশ্বাস হল :

- বাংলাদেশ দারুল হরব অর্থাৎ কাফেরের রাজ্য।
- বাংলাদেশে জুম'আ ও ঈদের সালাত পড়া জায়েজ নেই,
- আমল করা ইমানের অংশ বিশেষ, কাজেই কালেমা পাঠকারী কোন মুমিন যদি সালাত না পড়ে তবে সে ব্যক্তি কাফের এবং তার জানাজা পাঠ করা জায়েজ নয়।
- এ দলের নেতাগণ তাদের দলের মোকদ্দমা মীমাংসা করে জরিমানার টাকা কাফফারা নাম দিয়ে আদায় করে তা নিজেরাই ভক্ষণ করে থাকে।
- তাযির বিল জেসেম অর্থাৎ অপরাধকারীকে লাঠি, জুতা মেরে বিচার করে থাকে। জরিমানা ও তাজির (শারীরিক শাস্তি) এ দুই প্রকারের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা বাদশাহের।
- তাদের মতে পতঙ্গ খাওয়া হালাল। তারা আরবি 'জারাদ' শব্দের অনুবাদ বাংলা ভাষায় ফড়িং বলে থাকে। সেটির অর্থ পতঙ্গ। বরঞ্চ জারাদ অর্থ পঙ্গপাল যা পতঙ্গ ফড়িং হতে অনেক বড় এক দল বেধে বাস করে।
- তরিকার পীরদের হাতে মুরিদ হতে নিষেধ করে।
- তরিকত ও অলী আল্লাহদের বংশ পরম্পরাকে অমান্য করে থাকে।
- এ দলের ওস্তাদ ও খলিফাগণ ধনী হওয়া স্বত্ত্বেও সদকা, ফেতরা আদায় করতঃ নিজেরাই ভক্ষণ করে থাকে।

হিজরী ১২৭২ সালে আষাঢ় মাসের ১৯শে তারিখ রোজ রবিবার বরিশাল শহরে সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকজন ও সরকারি কর্মচারীগণ যেমন খান বাহাদুর মৌলবি আব্দুল করিম, কাজী সিরাজুল ইসলাম, শহর কোতওয়াল, মৌলবি মোহাম্মদ ফাজেল প্রমুখদের সামনে লাজুম'আদের বড় খলিফা মৌলবি আব্দুল জব্বার এবং জৌনপুরী মাওলানা সাহেবের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা কালে মৌলবি আব্দুল জব্বার নিরুত্তর হয়ে জুম'আ পড়তে স্বীকার করে। জৌনপুরী মাওলানা সাহেবের মতামত মেনে নিয়ে নিজের ভুলকে সংশোধন করতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত মৌলবি সাহেব অঙ্গীকার ভঙ্গ করতঃ মত পরিবর্তন করেন। এ দল মাওলানা সাহেবকে বহু কষ্ট দিয়েছে এবং ইসলাম প্রচারের কাজে সর্বদাই বাধা প্রদান করেছে। তাদের ধোকা ও প্রবঞ্চনার ফলে মাওলানা সাহেবের এক এক স্থানে চার মাস পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়েছে। বরিশাল, ঝালকাঠি এবং অন্যান্য স্থানে লাজুম'আগণ বহস করার তারিখ ছিন্ন করার পর পলায়ন করে। লাজুম'আদের পীর দুদা মিঞা বরিশাল শহরে দলিল প্রমাণাদি দিতে অক্ষম হয়ে জুম'আ পড়তে অঙ্গীকার করে, কিন্তু সুযোগ পেয়ে জুম'আর রাতেই অদৃশ্য হয়ে যান। এ ঘটনা ১২৭২ হিজরীতে ঘটেছিল। মাওলানা সাহেব তার নিজের লেখার মধ্য দিয়ে এ ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন- "বরিশালে হাজি শরিয়ত উল্লাহর পুত্র দুদা মিয়া বৃহস্পতিবার দিন জনাব কাজী শফিউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে অপদস্ত হওয়ার পর স্বীকার করল 'আমি আগামীকল্য এখানে আপনাদের সাথে জুম'আর সালাত পড়ব এবং মাসয়ালার বিষয় অনুসন্ধান করব'। কিন্তু রাতেই পলায়ন করে। ঝালকাঠিতে মৌলবি আব্দুল জব্বার ওয়াদা করেছিল যে, আমি আগামীকল্য জুম'আ জায়েজ হওয়ার বিষয় মক্কা শরীফের ফতোয়ায় দস্তখত করব। কিন্তু রাতেই পলায়ন করে। অতঃপর মাদারীপুর আমার সাথে বহস করবে বলে বাজিতপুর গিয়ে স্বীকার করেছিল। বাজিতপুরে গিয়ে সেখানকার গ্রাম্য লোকদের নিকট পত্র লিখল যে, আমি কল্য বহস করব, তোমরা ভোরে সেখানে উপস্থিত হবে। কিন্তু সেখান

থেকেও রাতে পলায়ন করে। এ তিনজন লোকের চারবার পলায়নের সাক্ষ্য যদি শত শত লোকে না দেয় তবে আমি মিথ্যাবাদী আর এ সংবাদ সত্য হলে নিঃসন্দেহে তারা ধোকাবাজ।

তদ্রুপভাবে ১২৮২ হিজরীর সফর মাসের ৮ তারিখ রবিবার দিন বরিশাল শহরে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এ সভা জনসাধারণের সামনে সে মৌলবি আব্দুল জব্বার (হাজি শরিয়ত উল্লাহ সাহেবের খলিফা) নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে ভ্রষ্ট বলে প্রকাশ করে এবং বাংলাদেশে জুম'আ জায়েজ বলে স্বীকার করে। কিন্তু পরে নিজের স্বভাব সুলভ অভ্যাসানুসারে পুনরায় ফিরে গেল এবং জুম'আ পড়ল না। এ দল জুম'আর বিষয়ে খুব কঠিন মনোভাব পোষণ করে এবং তাদের পীরের পক্ষ হতে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়। কিন্তু মাওলানা সাহেবের খাটি নিয়তের ফলে এ দল ঐ সময় হতে আজ পর্যন্ত দিন দিন কমতেছে। ঐ দলের লোকজন ক্রমশ: জুম'আর সালাত পড়তে আরম্ভ করেছে। দলে দলে লোক জুম'আ জায়েজ বলে স্বীকার করে এবং জুম'আ পড়তে আরম্ভ করেছে। জুম'আ অমান্যকারীদের গ্রামে গ্রামে ক্রমশ মসজিদ প্রস্তুত হতে চলেছে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা যে, জুম'আর বরকতে তাদের স্বভাব ও অভ্যাসগুলো পরিবর্তন হতে চলেছে এবং তাদের মধ্যে হেদায়েতের অন্তরদৃষ্টির আলো প্রতিফলিত ও ইলমের চর্চা হতে আরম্ভ করছে।"[৩৯৪]

খারেজিদের বিবাদ এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস

হাজি শরিয়তুল্লাহ ও দুদা মিয়ার দল জনাব মাওলানা সাহেবের তাবলিগ কাজে বহু বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা বাংলাদেশে এক মহা অনিষ্টের সূত্রপাত করেছিল। যার ফলে মাওলানা সাহেবকে এসকল বিবাদ, ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার বিনাশ করতে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এসকল কাজে তার বহু মূল্যবান সময় ব্যয় হয়েছিল। এসকল দলকে মাওলানা সাহেব তার নিজের লেখনীতে খারেজি বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের (ভ্রান্ত) বিশ্বাসের কথা স্থানে স্থানে ফিকাহ এবং উসুলের দ্বারা খণ্ডন করেন। মাওলানা সাহেবের নিজের লেখনী হতে তাদের বিশ্বাস ও বিবাদ সৃষ্টির কথা পাঠক অবগত হোন। সালাম আদায়ের পর ফকির আলী জৌনপুরী (যিনি কারামত আলী নামে প্রসিদ্ধ) বিশেষ বিশেষ সম্মানিত ও জনসাধারণের খেদমতে খারেজি ধোকাবাজির একটি সত্য ঘটনার বিষয় সংবাদ দিচ্ছে। যাতে বিশিষ্ট লোকজন সাধারণ লোকদেরকে খারেজিদের ধোকাবাজী এবং কৃত্রিমতার বিষয় অবগত করাতে পারে এবং সাধারণ লোকদেরকে উক্ত খারেজিদের সংশ্রব হতে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। সংবাদটি এমন, যেহেতু বাংলাদেশের জনসাধারণ বিশেষত ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল শহরের এবং পার্শবর্তী জনসাধারণ তাদের ধর্ম ও মাযহাব এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অজ্ঞতার দরুন এবং ঈমান ও আমলের পার্থক্য না জানার কারণে খারেজিদের জালে আবদ্ধ হয়ে কালেমা পাঠকারী মুমিনকে সালাত না পড়ার দরুন কাফের বলে, তাদের জানাজার সালাত পাঠ করত না, তাফসিরে আহাম্মদী ইত্যাদি কিতাবসমূহের মতানুসারে জুম'আর সালাত যা ইসলামের কার্যাবলির মধ্যে একটি বিশেষ কাজ এবং ঈদের সালাতকে এ দেশে নিষেধ করে। মাশায়েখদের তরিকার মধ্যে দাখিল হওয়া ও বাই'য়াত হতে নিষেধ করে এবং এ বাই'য়াত হওয়াকে কঠোর ভাবে অগন্য করে। ভাঙ্গু যাকে আরবিতে ফরাশ এবং বাংলা ভাষায় ফড়িং বলে সেটিকে জারাদ মনে করে, যাকে হিন্দি ভাষায় টিড্ডি এবং বাংলায় পঙ্গপাল মনে করে খেত। তাদের দলের নেতারা নিজেরা ধনী হওয়া সত্ত্বেও সদকা ফেতরা গ্রহণ করত। কোন সময় কোন দোষত্রুটি ও পাপের কাজ করলে তাদেরকে জুতা মারত, জরিমানা করত এবং জরিমানার টাকা নিজেরাই খেত। জরিমানার টাকা কখনও ফিরিয়ে দিত না। নিজের দল ব্যতীত অন্য কাউকেও মুসলিম বলে

৩৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৭১-৭৫

বিশ্বাস করত না। তাদের জবেহ করা পশু খেত না। তাদের পিছনে সালাত পড়ত না, সালাম করত না, তাদের মসজিদেও যেত না। বরং আহলে সুন্নাতুল জামা'আতের মসজিদ সমূহের মিম্বার খোদাই করে ফেলেছিল যেন সেটিতে কেউ জুম'আর নামাজের খোতবা পড়তে না পারে। এ ফকির হাজি শরিয়ত উল্লাহ এবং দুদা মিয়াকে এসকল বিষয়গুলোকে কোন দীনি কিতাব দ্বারা প্রমাণ করে দেয়ার জন্য শক্তভাবে ধরেছিলাম। কিন্তু কখনও দেখাতে পারেনি। অবশেষে তাদের খলিফা আব্দুল জব্বার নামক এক ব্যক্তিকে ঝালকাঠিতে ঐ সকল মাসয়ালাগুলো কোন দীনি কিতাব দ্বারা প্রমাণ করে দেয়ার জন্য শক্ত করে ধরেছিলাম। কিন্তু সেও দেখাতে সক্ষম হয়নি।

খারেজিদের ধোকা থেকে সাবধান হওয়ার জন্য লোকদেরকে শরিয়তের আদেশ অনুযায়ী অন্যত্র বলতেছেন যে, বাংলার খারেজি জামা'আত আহলে সুন্নাতুল জামা'আত ভুক্ত নয়। তারা নবি করিম (স.) এর ওয়ারেস ও আলেম নয়। খারেজি লোকদের আমলকে ইমানের অংশ হিসাবে গন্য করার দরুন বেনামাজিদেরকে কাফের বলে থাকে এবং তাদের জানাজা পাঠ করে না। কাজেই এ মতবাদকে 'শরহে আকায়েদে নসফি' নামক কিতাবে খারেজিদের মতবাদ এবং এ লোকদেরকে ইজমা হতে খারিজ (বহিস্কৃত) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশে বিপথগামী দলের অভাব ছিল না। কিন্তু ঐ সময়ে বিশেষতঃ দুইটি দল খুবই ভয়ানক ও বিষবৎ ছিল। মাওলানা সাহেব তাদের উল্লেখ নিম্নলিখিত ভাবে করেছেন। যথাঃ- বাংলাদেশে দুইটি দল। একটি লামাজহাবী ও দ্বিতীয়টি খারেজি দল। তারা লোকদেরকে নানা রকম ধোকা দিয়ে এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা গোমরাহ করে দিয়েছিল।

মাওলানা সাহেবের প্রণীত কিতাবসমূহে যাবতীয় গোমরাহ দলের বিশেষত খারেজি ও লামাজহাবীদের উল্লেখ স্থানে স্থানে পাঠক দেখতে পাবেন। হুজ্জাতে কাতেয়া, মুরাদুল মুরীদিন,কাওলুচ্ছাবেত, তাজকিয়াতুল আকায়েদ, এতমিনানুল কুলুব, নাসিমুল হারামাইন, কেরামাতুল হারামাইন ইত্যাদি কিতাব পাঠ করলে সেসব বিষয় বিস্তৃত ভাবে দর্শনীয়।"[৩৯৫]

উলঙ্গ আসামবাসীদেরকে কাপড় দান

মাওলানা আবুল বাসার সাহেব বলেন যে, বাংলাদেশে জনাব মাওলানা হাফেজ আহম্মদ সাহেবের একজন মুরিদ ছিল। জেলা বরিশালের অন্তর্গত মুলাদী বাজারের নিকটবর্তী স্থানে তার বাড়ি। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন আমার দাদা মাওলানা কারামত আলী সাহেবের একজন বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন। মাওলানা সাহেব যখন আসাম গমন করেন তখন আমার দাদাও তার সাথে সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি বলতেন যে, মাওলানা সাহেবের বোট যখন আসামে উপস্থিত হল। তখন সেখানকার অবস্থা এতই বিশ্রী ও খারাপ ছিল যে, সেখানকার লোকদের বাহ্যিক চালচলন ও ছবি সুরত দেখে মুসলিম বলে বুঝবার কোন উপায় ছিল না। শরিয়তানুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ থাকা তো দূরের কথা এমনকি লজ্জাস্থান ঢাকাও আবশ্যক মনে করত না। বেশিরভাগ লোক উলঙ্গ এবং কেউ কেউ লেংটি পরে কাল কাটাত। মাওলানা সাহেব সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং কতিপয় উপযুক্ত লোকের দ্বারা লোকদেরকে ডেকে প্রত্যেককে একটি করে কাপড় সতর ঢাকার জন্য এবং একটি টুপি মাথা ঢাকার জন্য প্রদান করেন। এর ফলে লোকজন হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দিত হয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হল। অতঃপর মাওলানা সাহেব ঢাকা হতে লোক মারফত চার হাজার লুঙ্গী ও কিছু পরিমাণ থান কাপড় এনে লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

৩৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫-৮৭

এতে পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল লোকদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসার সৃষ্টি হল। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে উপরোক্ত বর্ণনাকারী একটি ইংরেজি পুস্তক বের করে আমাকে পড়ে শুনালেন এবং বললেন, কোন একজন ইংরেজ লেখেছেন- জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলা ও আসামের লোকদেরকে শুধু মুসলমানে পরিণত করে ক্ষান্ত হননি। ওপরন্তু কাপড় ও পোশাক প্রদানে অমুসলিমদেরকে মুসলমানে পরিণত করেন। কাজেই লোকজন তাদের নিজেকে আদম সন্তান এবং মানুষ বলে পরিচয় দেয়ার উপযুক্ত বলে মনে করে। এটি সত্য কথা যে, মাওলানা সাহেবের সৎ স্বভাব ও সৎ উপদেশ শ্রবণে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলামকে সত্য স্বীকার করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। জনাব সৈয়দ আহাম্মদ শহিদ সাহেবের জীবনী লেখক মাওলানা কারামত আলী সাহেবের ইসলাম সেবাকাজ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করেছেন। যথা: "জনাব সৈয়দ আহাম্মদ সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ খলিফা জৌনপুরের মৌলানা কারামত আলী সাহেবের চেষ্টায় বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। আজ আমাদের চোখের সামনে এ যে পাকিস্তান। তার ভিত্তি মূলে রয়েছে মাওলানা সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অদম্য প্রেরণা। বলতে গেলে পূর্ব পাকিস্থান তো তারই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। যেহেতু যে জাতির জন্য পাকিস্তান, সে জাতিকে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত করে এবং লক্ষ লক্ষ অমুসলিমকে হেদায়েতপূর্বক মুসলিম জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাকিস্তান হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছেন। মাওলানা সাহেবের বিরামহীন চেষ্টার ফলে আজকাল বাংলা ও আসামের প্রতি ঘরে ঘরে হাজার হাজার নতুন মুসলিম। বর্তমান বাংলাদেশে মুসলিমের সংখ্যাধিক্য হওয়ার কারণও এটিই। বিশেষতঃ পূর্ব বঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ার প্রকৃত কারণ মাওলানা সাহেবের উদারতা ও বরকতের ফল স্বরূপ।"[৩৯৬]

মাওলানা সাহেবের প্রথম ভ্রমণ বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে আঠার বছর পর্যন্ত ছিল

মাওলানা সাহেবের বাংলাদেশের প্রথম ভ্রমণ ক্রমান্বয়ে আঠার বছর পর্যন্ত চলেছিল। প্রথম ভ্রমণেই মাওলানা সাহেব পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রতিটি জেলায় তাবলিগ করতে করতে আসাম প্রদেশ পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত হতেন সেখানে তাবলিগ ও প্রচারের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে এবং মৃত সমাজ দেহে ইসলামি তেজ প্রবেশ করে দিতেন। স্থানে স্থানে ধর্ম প্রচারকারী নিযুক্ত করেন। মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। লোকের মধ্যে শরিয়তের আদেশাবলির অনুগত হওয়ার প্রেরণা জাগরিত করেন। ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে দুই চার বছর পরে আত্মীয়স্বজনের নিকট হতে বাড়িতে ফিরার জন্য তাগাদা আসতেছিল। এমনকি তার সঙ্গী ও সেবকগণ পর্যন্ত অনুরোধ করতেন। জৌনপুরে ক্ষুদ্র ঘর বাড়ি দেখে পুনরায় ফিরে এসে তাবলিগের কাজ সম্পন্ন করেন। উত্তরে মাওলানা সাহেব বলতেন যে, আমার ১৮ দিন মুর্শেদে কামেলের দরবারে উপস্থিত থাকার পর, বিদায়কালে তিনি যেসকল শান্তিদায়ক কথাবার্তা, হেদায়েতের নিয়ম ও সেটি প্রচার করার বিষয় যে সকল সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন ঐ সমুদয় সর্বদাই প্রকাশিত হয়ে চলেছে এবং সেটির প্রতিফলকারী কামেলের বর্ণানুযায়ী প্রকাশিত হয়ে চলছে। এখনও অনেক কিছু বাকি রয়েছে। যার প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য বলে মনে হয়। কাজেই এ অবস্থায় ভ্রমণ কার্য ত্যাগ করে হেদায়েত ও তাবলিগের কাজ বন্ধ করে দেয়া এ ফকিরের ধারণার বাইরে। এটি এমনই কার্য যে বাংলাদেশের কোন স্থানে এ ফকির অপেক্ষা বড় বড় সম্মানিত ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পীর বরহক এ হতভাগাকে হিন্দুস্তানে ভ্রমণ করার এবং বাংলাদেশে তাবলিগের কাজ সমাধা করার মহান কাজের ভার প্রদান করেছেন। এমনকি এ ভ্রমণে আমার সাথে স্ত্রী-পুত্রদেরকে রাখার হুকম প্রদান করেছেন। এটিতে নিশ্চই কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। এ আদেশ ও অনুমতির মধ্যে নিশ্চই বিশেষ ভাব ও রহস্য আছে। একারণেই কলকাতায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার তরীকত

৩৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯-৯১

পন্থিদের মত ও তাবলিগ প্রাণ দেখতে পেলাম এবং অনেকেই নিজ নিজ দেশে তাবলিগ ও প্রচারের কাজে খুব সাহায্য করেছে। এসকল শান্তিদায়ক কথাবার্তায় মাওলানা সাহেবের প্রিয় অনুচরবৃন্দ শান্তি লাভ করত। অবশেষে আসাম প্রদেশে উপস্থিত হয়ে সৈয়দ সাহেবের সমুদয় সুসংবাদের পূর্ণ প্রকাশে শান্তি লাভ করলেন।"[৩৯৭]

"বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ জীবনে নানাবিধ সংস্কার সাধনের কাজে মাওলানা জৌনপুরীর পরিশ্রম ও সাধনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কর্মতৎপরতার ফলে অনুন্নত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু মুসলিম তার প্রচারিত সত্য গ্রহন করেন। তিনি আসামে ধর্মপ্রচার ও ধর্মসংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে গমন করে দেখতে পেলেন যে, সেখানকার মুসলিম প্রায় নগ্ন অবস্থায় কাল যাপন করছে। হযরত জৌনপুরী তাদের এ অবস্থা দর্শন করে তাদের মধ্যে বিনা পয়সায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও টুপি বিতরণ করেন এবং তাদের ইসলামি নীতি ও আদর্শ শিক্ষাদান করেন। বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের সময় তিনি যে শুধু মৃতপ্রায় ইসলামকে নব বলে সঞ্জীবিত করেছেন তা নয়, তিনি বহু অমুসলিমকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদান করেছেন।"[৩৯৮]

সুফিবাদ

ইসলাম বাংলাদেশে প্রচার লাভ করেছিলেন প্রধানত সুফি সাধকদের ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে। তাদের খানকাহ ও মক্তব সমূহ ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্র। সেখানে হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল ধর্মাবলম্বীর আনাগোনা হতো। তাদের দ্বার সকলের জন্য ছিল অবারিত। ফলে অমুসলিমরাও ইসলামকে জানার ও বোঝার সুযোগ লাভ করে। ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। সুফি সাধকগণ ছিলেন উদারপন্থী। তারা তাওহিদ স্বীকার ও আল্লাহ প্রেম লাভের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্বভাবতই তারা ইসলামের সনাতন রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে অধিকতর সহনশীল ও উদার মনোভাব পোষণ করতেন। সুফি সাধকগণ জোর জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেননি। উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধর্মের অন্তহীন কুসংস্কার এবং অজস্র শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ যেমন সতীদাহ, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ইত্যাদি কুসংস্কার এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সামন্তবাদ এবং শ্রেণীবাদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়। সুফি সাধকগণের ত্যাগ, সাধনা ও উদার নীতির ফলে এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। তবে অন্যান্য ধর্মের কিছু আচার আচরণ ও সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে।

সৈয়দ মুরতাজা আলী তার লিখিত বই Saints of Bangladesh পাতা ৭ এ সুফিবাদের উদারনীতির ওপর লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে-

It was necessary to him over the support of the local people either by converting them or by pacifying them. This implied some sort of compromise with the local costoms and beliefs. These converts retained their long inherited costoms, beliefs and love for the old epics.

সৈয়দ মুরতাজা আলী তার লিখিত বই 'বাংলাদেশে ইসলামি বিপ্লব' পাতা ১২ উল্লেখ করেছেন যে- "সতের শতক থেকে স্বাধীনচেতা মোগল সুবাদারদের উদারতার ফলে বাংলাদেশে বিদেশী মুসলিম আগমনের জোয়ার আসতে

৩৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮-৮৯

৩৯৮. ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফীসাধক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রি.) পৃ.৭০

থাকে। মোগল শাহজাদাদের অনেকেই এখানে সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সুবাদারদের ছত্রছায়ায় অনেক ইরানি এ দেশে এলেন তাদের আদব কায়দা কৃষ্টি সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। এমনিভাবে সতের শতক থেকে মোগল শাসনের অবসান পর্যন্ত সুফি সাধকদের ধর্ম প্রচারের ফলে বাংলাদেশ তথা গোটা উপমহাদেশে আর্য সংস্কৃতি এবং আরব তথা ইসলামি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে এবং এ সংমিশ্রণের ফলে প্রচলিত ইসলামে অনেক গায়রে ইসলামি আচার ও বিশ্বাস তথা শিরক ও বিদ'আত অনুপ্রবেশ করে"।

মোহাম্মদ এনামুল হক তার লিখিত বই A History of Sufi-ism in Bengal পাতা ২৯৪ এ উল্লেখ করেছেন যে,

Islam Being chiefly a missionary religion and its propagation in the east being mainly depended on the sufi missionaries… had to bring whthin its fold a large number of people already affiliated to a culture and civilization almost different from those of the Arabs, i.e. Semites. The amalgamation of these two sets of culture and civilization, viz Aryan (including non Aryan) and Semitic produced many new things in the different spheres of our Bengali Muslim life.

সুফি সাধকগণ বিভিন্ন তরিকা যেমন-চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নাখশেবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার মাধ্যমে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। মাওলানা কারামত আলী এসকল তরিকার সাথে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া সম্পৃক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তার পীর হযরত শহিদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (র.) কর্তৃক প্রচলিত তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া এর অনুসারী এবং প্রথম প্রচারক ছিলেন। হেদায়েতকালে তিনি বাংলা ও আসামে এ তরিকা প্রচলন করেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তার প্রণীত ইলমে মারেফাত বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ নূরুন আলা নূর এ তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তার প্রণীত কিতাব 'যাদুত তাকওয়া' এ ইলমে মারেফাত এবং চার তরিকার কার্যাবলির বিষয়ে আলোচনা করেন। পবিত্র কুর'আনের সূরা হাশর এর ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, "রাসূল যা করতে বলেছেন তা কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করো না"।

পবিত্র কুর'আনের এ নির্দেশ অনুসরণ করাই তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া এর মূল লক্ষ্য। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশে তৎকালীন পীর পূজা, কবর পূজা, পীরের দরগাহ এ গান বাজনা চর্চা ইত্যাদির প্রচলন শরিয়ত বিরোধী ছিল। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) কঠোর শরিয়তপন্থী ছিলেন। পবিত্র কুর'আন এবং হাদিসের আলোকে ফিকাহ ও তাকলীদ অনুযায়ী তিনি এদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। পরবর্তী কাল থেকে তার বংশধরগণ ও খলিফাগণ তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া অনুসরণ করে এখনো হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত আছেন।[৩৯৯]

বাংলাদেশের মুসশিদের অন্তরে কুসংসাকারের সকল ধারনা দূরীভূত করে ইসলামের সঠিক মাহাত্ম স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)। বেশরা, ভন্ড পীর ফকিরদের ছড়িয়ে দেয়া বিষবাষ্প নিমিষেই বিলীন করে দিতেন কুর'আন ও সুন্নআহর অমীয় বাণী দ্বারা।

৩৯৯. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.২১-২৩

অষ্টম অধ্যায়

ওয়ায-নসীহত ও লেখালেখিতে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)

যুগের অন্যতম সেরা মনীষী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বহস করে দ্বীন ইসলামের যথার্থতা প্রমাণ করেন। মসজিদগুলোতে ওয়ায নসিহতের প্রচলন করেন। তাছাড়া ইসলামের প্রচার, প্রসার ও কুসংস্কার দূরীকরণের ব্যাপারে তার লেখায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে মুসলিম জাতির জন্য। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রেখে গেছেন যেগুলো বর্তমান সময়েও সমানভাবে সমাদৃত। তার কলমের শব্দ এবং ভাষা কিভাবে কোটি মানুষের মনে নাড়া দিয়েছিল এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে নিম্নে সেসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর লেখনী শক্তি

মাওলানা সাহেব বাংলাদেশ ভ্রমণ উপলক্ষে তার বহু বেদ্বীন ও গোমরাহ লোকদের সাথে মোকাবিলা হয়েছিল। এসকল দলের নাম ও তাদের শত্রুতাচরণের বিষয় মাওলানা সাহেবের লিখিত কিতাবগুলো পাঠ করলে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। মাওলানা সাহেব বাংলাদেশে তাবলিগের সঙ্গে সঙ্গে একই সময় অনেক কাজ সমাধা করতে বাধ্য হতেন। যেমন, ওয়ায নসিহতের দ্বারা সাধারণ মুসলিমদেরকে প্রকৃত মুসলমানে পরিণত করা, বেশরাহ ফকির ও বিদ'আতি পীরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ওয়াহদাত অজুদীদের মতবাদ খণ্ডন, খারেজীদের কুমতবাদে প্রতিবন্ধক এবং তাদের আকায়েদ বা মতবাদকে ভ্রান্ত বলে মাসয়ালা প্রকাশ করা, ধর্মীয় আবশ্যকাবলি পুস্তক সমূহ লিখন ও সংকলন, ফতওয়া সমূহের উত্তর প্রদান, ভ্রান্ত এবং ভ্রান্তকারী ফতওয়া ও কিতাবসমূহের খণ্ডনলিপি লেখা এবং শিক্ষার্থীদেরকে জিকির আজকার ও সেটির রীতিনীতি শিক্ষা দেয়া। মারেফাত বিষয়ক কিতাব সংকলন ও প্রকাশ করা, ছাত্রদেরকে কাওয়ায়েদসহ কুর'আন শিক্ষা দেয়া, ধর্ম প্রচারকারীদেরকে বিশেষ উপদেশ সহকারে বাংলা ও আসামের স্থানে স্থানে প্রেরণ করা, তাদের পর্যবেক্ষণ করা। আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য লোকদেরকে প্রস্তুত ও উত্তেজিত করা। মেয়েলোক, ছেলেমেয়ে, ছাত্র, মেহমান, তরজমাকারী, মাঝি, খাদেম বিশিষ্ট কাফেলার দেখাশুনা করা ও তাদের দাবি ও শান্তির প্রতি দৃষ্টি রাখা। নিজের আন্তরিক কাজকর্ম রীতিমত আদায় করা ইত্যাদি কাজ মাওলানা সাহেবকে আদায় করতে হত। প্রকৃতপক্ষে মাওলানা সাহেব এমন একজন মুজাহিদ ছিলেন, যার সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ধর্ম ও লোকদের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করা ছিল এবং কলের মত কাজ করে যেত। মন ও প্রাণ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজ নিজ আবশ্যকীয় কাজ করার জন্য ব্যস্ত ছিল। যে কাজ সমাধা করার জন্য এমনকি একটি স্বতন্ত্র দপ্তরের আবশ্যক ছিল ঐ সকল কাজ তিনি একাকিই সমাধা করতেন। আপন তাওয়াক্কুলের (ভরসার) ভাণ্ডার হতে যাবতীয় খরচ পত্রের জিম্মাদার তিনি নিজেই ছিলেন।

মাওলানা সাহেবের প্রণীত কিতাবগুলো পাঠ করলে তার দ্বীনি খেদমত ও ধর্ম উন্মত্ততার প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিপথগামী দল সমূহের বিষয়ে তিনি যতগুলো বিষয় লেখেছেন পাঠক সেগুলোতে বিশেষ করে এ বিষয়ই লক্ষ্য করবেন যে, তিনি বিপথগামী দলসমূহের নাম নিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাদের বিশ্বাস ও প্রচার সমূহ খণ্ডন করতেন। ইশারা ইঙ্গিতের দ্বারা মুখোমুখি হওয়ার অভ্যাস মাওলানা সাহেবের ছিল না। তিনি পীড়িতদের পীড়া এবং রোগ বিস্তারকারী জীবানুকে বের করে সেটির চিকিৎসা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। যেন দুনিয়ার রোগ, রোগ বিস্তারকারী বিষয়সমূহ অবগত হয়ে সেটি হতে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। মাওলানা সাহেব তার এ অভ্যাসের কারণ

নিজের লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করেছেন, যে সকল বিপথগামী দল হাজার হাজার লোকের ধর্মকে বরবাদ করে এবং কোটি কোটি কালেমা পাঠকারী মুসলিমকে জানাজার সালাত ব্যতীত দাফন করেছে আমি হযরত নবি করিমের (স.) এরশাদ অনুযায়ী তাদের নাম প্রকাশ করে দেই। যাতে লোকজন খারাবী হতে রক্ষা পেতে পারে। রাসুলুল্লাহ (স.) এর হুকুম এ, তিনি বলেছেন যে, তোমরা কি বদকারদের নাম প্রকাশ করতে বিরত থাক? অর্থাৎ এমন না করাই শ্রেয়। বরং পাপিকে তার দোষ জানিয়ে দাও। যাতে লোকজন তাদের অপকাজ হতে বেচে থাকতে পারে।[৪০০]

"উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষায় তার পান্ডিত্য ছিল অতি গভীর। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কারামত আলী বিভিন্ন ভাষায় ৪৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ৪২টির নাম পাওয়া যায়, যার বেশিরভাগ উর্দু ভাষায় রচিত। এগুলো হাদিস, ফিকাহ, শরিয়াহ, মাসলা-মাসায়েল এবং তাসাউফ বিষয়ক। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্বারী ও নিপুণ হস্তলিপি বিশারদ। আরবি কিতাব ও কুর'আন তিনি নিজ হাতে লেখতেন। তার লিখিত অনেক পান্ডুলিপি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট তার্কিক। যখনই ধর্মীয় কোন জটিল বিষয়ে আলেম ওলামাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত, তখনই যুক্তি তর্ক বা বাহাস এর মাধ্যমে তার ভিন্ন মতাবলম্বীদের মোকাবেলা করতেন এবং আল্লাহর রহমতে প্রতিবারই জয়ী হতেন।"[৪০১]

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহ

"মাওলানা কারামত আলী (র.) এর মতবাদের যথাযথ ধারণা নিতে হলে তার রচিত বইগুলো পড়া দরকার। রাহমান আলী প্রণীত 'তাস্ কিরা-ই-উলামা-ই-হিন্দ' (পাতা ১৭১, লাখনৌ, ১৮৯৪খ্রি.) এ মাওলানা কারামত আলীর কিতাবসমূহের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেয়া হয়েছে। এতে ৪৬টি বিভিন্ন কিতাবের নাম উল্লেখ করা আছে। তন্মধ্যে ৪২টি বইয়ের নাম সংগ্রহ করা গেছে, তার তালিকা নিচে পেশ করা হলো :-

ক্রমিক নং	কিতাবসমূহের নাম	যে ভাষায় রচিত	বিষয় সমূহ
০১	মেফতাহুল জান্নাত	উর্দু	ইলমে ফিকাহ
০২	যিনাতুল মুসল্লি	উর্দু	নামাযীদের ফিকাহের মাসয়ালা
০৩	মোখরেজুল হরূফ	উর্দু	ইলমে কেরাত বিষয়ক
০৪	যীনাতুল ক্বারী	উর্দু	ইলমে কেরাত বিষয়ক
০৫	শরেহ হিন্দি জজরী	উর্দু	ইলমে কিরাতের বিস্তৃত বিবরণ
০৬	কাওকাবে দুররি	উর্দু	আল কুর'আন বিষয়ক
০৭	তারজুমায়ে শামায়েলে তিরমিযি	উর্দু	তিরমিযি শরীফের (হাদিসের) অনুবাদ
০৮	তারজুমায়ে মিশকাত	উর্দু	মিশকাত শরীফের (হাদিসের) অনুবাদ
০৯	আকায়েদে হাক্কা	উর্দু	প্রশ্নোত্তরে আকায়েদের পুস্তক

৪০০. মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২-৮৪

৪০১. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

১০	তাজকিরাতুল আকায়েদ	উর্দু	খারেজীদের আকায়েদ খন্ডন
১১	কাওলুসসাবেত	উর্দু	শিরক, বিদ'আত ও শরিয়াহ বিরোধী কাজ
১২	মোকামেউল মেবতাদেইন	উর্দু	বিদ'আতিতের সাথে প্রশ্নোত্তর
১৩	হাক্কুল ইয়াকিন	উর্দু	ওয়ায নসীহত ও আদেশ বিষয়ক
১৪	বাই'য়াত ও তওবা	উর্দু	পীরগণের নিকট বাই'য়াত ও তওবা
১৫	কাওলুল আমীন	উর্দু	জুম'আর নামায বিরোধীদের প্রতিবাদ
১৬	মোরাদুল মুরীদিন	উর্দু	খারেজীদের মতবাদ খন্ডন ও মিলাদ বিষয়ক
১৭	কাওলুল হক	উর্দু	মিলাদ জায়েজ বিষয়ক
১৮	মেরাতুল হক	উর্দু	ইসলামে বিরোধ সৃষ্টিকারীদের স্বরূপ উদঘাটন
১৯	ইতমিনানুল কুলুব	উর্দু	বিদ'আত ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিবাদের উত্তর
২০	মোলখখাস	আরবি	মিলাদ ও কেয়াম বিষয়ক
২১	মোকাশিফাতে রহমত	উর্দু	বহু প্রয়োজনীয় মাসায়ালা
২২	ফায়েজে আম	উর্দু	ইলমে মারেফাত
২৩	হুজ্জাতে কাতেয়া	উর্দু	খারেজী ও লা-জুম'আ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং জুম'আ যায়েজ-এর বিষয়ে ফতুয়া
২৪	নূরুল হুদা	উর্দু	ইলমে তাসাওউফ
২৫	এস্তেকামাত	উর্দু	সুন্নত ও ধর্মের ওপর দৃঢ় থাকা
২৬	নূরুন আলা নুর	উর্দু	ইলমে মারেফাত
২৭	যাদুত তাকওয়া	উর্দু	ইলমে মারেফাত
২৮	রাহাতে রুহ	উর্দু	ইলমে মারেফাত
২৯	কুউয়াতুল ঈমান	উর্দু	ইলমে মারেফাত
৩০	এহকাকুল হক	উর্দু	জিকির ও মোরাকাবার শিক্ষা
৩১	রফিকুস সালেকীন	উর্দু	জিকির ও মোরাকাবার শিক্ষা
৩২	তানবিরুল কুলুব	উর্দু	ইলমে মারেফাত বিষয়ক
৩৩	তাজকিয়াতুন্নেসওয়ান	উর্দু	মহিলাদের পর্দা বিষক
৩৪	নাসিমুল হারামাইন	আরবি	বিদ'আত খন্ডন
৩৫	বারাহিনে কাতেয়া	আরবি	বিদ'আত খন্ডন
৩৬	মৌলুদে খায়রুল শারিয়াহ	উর্দু, আরবি	মিলাদ শরিফ

৩৭	কেরামাতুল হারামাইন	উর্দু	মিলাদ শরিফ
৩৮	কোরবাতুল উইউয়ুন	উর্দু	মক্কা ও মদিনা শরীফের ফজীলত
৩৯	রেসালিয়ে ফায়সেলা	উর্দু	মক্কা ও মদিনা শরীফের ফজীলত
৪০	ওক্কাজাতুল মুমিনীন	উর্দু	মক্কা ও মদিনা শরীফের ফজীলত
৪১	ফতহে বাবে সবিয়ান	ফারসি	ফারসি ব্যাকরণ
৪২	দাওয়াতে মাসনুনা	উর্দু, আরবি	হাদিস শরীফের দোয়াসমূহ

পুস্তক প্রকাশকগণ পাঠকদের পড়ার ও বুঝার সুবিধার্থে মাওলানা সাহেবের বিভিন্ন কিতাবসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সমন্বিত আকারে তিন খন্ড যখীরায়ে কারামত ছাপিয়েছেন।

যখীরায়ে কারামত-১ম খন্ডে ৮ খানা কিতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :

১। মোকাশেফাতে রহমত ২। ফায়েজে আম ৩। তাজকিরাতুল আকায়েদ ৪। হুজ্জাতে কাতেয়া ৫। নূরুল হুদা ৬। কিতাবে এস্তেকামাত ৭। যীনাতুল মুসল্লী ৮। আকায়েদে হাক্কা

যখীরায়ে কারামত-২য় খন্ডে ৬ খানা কিতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :

১। কাওলুসসাবেত ২। দাওয়াতে মাসনুনা ৩। মোকামেউল মোবতাদীন ৪। হাক্কুল ইয়াকিন ৫। বাইয়াত ও তাওবা ৬। কাওলুল আমীন

যখীরায়ে কারামত-৩য় খন্ডে ৫ খানা কিতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :

১। মুরাদুল মুরীদিন ২। মোলাখখাস ৩। কাওলুল হক ৪। মেরাতুল হক ৫। ইতমিনানুল কুলুব

মাওলানা সাহেব হাদিস শাস্ত্রে একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন। আরবিতে লেখা হাদিসের দুখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: মিশকাতুল মাসাবিহ্ ও শামাইলে তিরমিযি এর উর্দু অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ তিনি প্রকাশ করেন। মাওলানা সাহেব ফিকাহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তার হাদিসের শিক্ষক আহমাদুল্লাহ সাহেব 'তাকলিদ' সমর্থন করতেন। এজন্য তিনি ফিকাহ্র অত্যন্ত তাকিদ দিতেন। যারা ফিকাহ্র বিধান মানতেন না তাদেরকে মাওলানা সাহেব লামাযহাবী বা ওহাবী বলতেন। ফিকাহ্র ওপর তিনি ৩টি কিতাব রচনা করেন:

১। মিফতাহুল জান্নাত ২। যীনাতুল মুসল্লী ৩। তাযকিয়াতুন নেসওয়ান।

চারটি আরবিতে ও একটি ফার্সী ভাষায় ছাড়া তার অন্যান্য রচনাবলি উর্দুতে রচিত হয়েছে। তার রচিত অন্যতম গ্রন্থ মিফতাহুল জান্নাত বহু ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। উপ-মহাদেশে এটা ইসলামি বিধি বিধানের নির্ভুল বিবরণ বলে গৃহীত হয়েছে। তার লেখাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

১। কুর'আন ও হাদিসের আলোকে মাসালা-মাসায়েলা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি।
২। কুর'আন এর পাঠন ও শাব্দিক ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থাবলি।

৩। পীর মুরিদী ও তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থাবলি।
৪। শিরক, বিদ'আত ও শরিয়াহ বিরোধী কাজের সমালোচনা এবং ফারায়েজি ও আহলে হাদিস মতবাদের যুক্তিখন্ডন বিষয়ক গ্রন্থাবলি।

মাওলানা কারামত আলী সাহেবের প্রণীত অসংখ্য পান্ডুলিপি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। লক্ষ্মীপুর দায়রাবাড়ির মরহুম মনসুর আব্দুল হক সাহেব থেকে গৃহীত কিছু পান্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগের প্রফেসর ডঃ উম্মে সালমা ১৯৯০ সালে তার প্রণীত থিসিস Source Material of History in persian and Urdu Literature of 19th Century Bangladesh এ মাওলানা কারামত আলীর প্রণীত চারটি কিতাব যথা: 'কাওলুল আমীন', 'মেরাতুল হক', 'ইতমিনানুল কুলুব', 'মুরাদুল মুরিদীন' অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং উর্দু ও ফার্সি ভাষায় মাওলানা সাহেবের পান্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের জন্য মাওলানা কারামত আলী সাহেবের ঘটনাবহুল জীবনী সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মক্কা শরীফের বিভিন্ন শিক্ষালয়ের সিলেবাসে মাওলানা সাহেবের রচিত কিতাব সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মর্মে প্রফেসর রুহুল আমীন তার থিসিসে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা জাফর আহম্মদ জৌনপুরী (র.) এর মৌখিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জার্মান ভাষায় মাওলানা কারামত আলী (র.) এর জীবনী ছাপা হয়েছে যা জার্মান ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। তার রচিত ও প্রকাশিত কিতাবগুলো বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা হলে তা সহজে বুঝা যেত এবং তার চিন্তা ও মতামত সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা করার সুযোগ হতো। মরহুম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী কর্তৃক রচিত ইউরোপীয় নবজাগরণে গ্রীক ও আরবদের প্রভাব বিস্তার নামক লিখিত উর্দু প্রবন্ধ স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান কর্তৃক ঘোষিত নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রাথমিক ভাবে মনোনীত হলেও তা ইংরেজিতে অনূদিত না হওয়ায় পরবর্তীতে বিবেচিত হয়নি।[৪০২]

"তিনি নিজে ছিলেন গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী; আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় তার দখল ছিল অসাধারণ। মাত্র বিশ বছর বয়সে উর্দু ভাষায় তিনি রচনা করেন 'মিফতাহুল জান্নাত' (বেহেশত চাবি)। এ বইয়ের মর্যাদা চারদিকে বিস্তার লাভ করে এবং তা ১৮টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিয়াল্লিশখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"[৪০৩]

অজিফা সমূহ

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর রচিত 'জখিরায়ে কারামত' এর প্রথম খন্ডে যীনাতুল মুসল্লি কিতাবের শেষ অংশে যে অজিফা বর্ণিত হয়েছে তা তাবারুক হিসেবে নিম্নে দেয়া হলো-

- দৈনিক ফজরের নামায ও মাগরিবের নামাযের পর ৭ বার 'আল্লাহুম্মা আজেরনী মিনান্নার' (হে আল্লাহ আমাকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিন) পাঠ করবে। কোন ব্যক্তি উক্ত দোয়া ফজর নামাযের পর ৭ বার পাঠ করে যদি ঐ দিন মারা যান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

৪০২. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮-৩৩
৪০৩. ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

অনুরূপভাবে মাগরিবের নামাযের পর উক্ত দোয়া ৭ বার পাঠ করলে পাঠকারী ব্যক্তি ঐ রাতে মারা গেলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

- প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী ১ বার এবং চারকুল ১ বার পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা দোযখ হতে নাজাত দেবেন। এক ওয়াক্ত থেকে আরেক ওয়াক্ত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এ দোয়া পাঠকারীর যদি মৃত্যু হয় তাহলে তিনি জান্নাতী হবেন।

দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামাযের পর করণীয় কিছু আমল :-

- ফজরের পর লা-ইলাহা ইল্লাহু মালেকুল হাক্কুল মুবিন (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি প্রকাশ্য সত্য) ১০০ বার পাঠ করলে পরকালীন আযাব থেকে মুক্তি এবং দুনিয়াতে রিযিখ বৃদ্ধি পাবে।
- জোহরের পর হাসবুনাল্লাহ ওয়া নে'মাল ওয়াকিল (আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট তিনিই আমার উপযুক্ত উকিল) ৫০০ বার, যদি সময় কম থাকে ২৫ বার পাঠ করবেন।
- আসরের পর তাসবীহে ফাতেমী নিম্নরূপ পড়তে হবে-

  সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পাক ও পবিত্রময়) ----------৩৩ বার
  আলহামদুল্লিাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) ------৩৩ বার
  আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান) ----------৩৪ বার

(উল্লেখ্য যে, রাসুল (স.) তার প্রিয় কন্যা বিবি ফাতেমাকে এ তাসবীহ পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে একে তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়)

- মাগরিবের পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল) ১০০ বার পাঠ করতে হবে।
- এশার পর দরুদ শরীফের মধ্যে যে কোন দরুদ শরিফ ১০০ বার পাঠ করবেন। মনে চাইলে নামাযে বসা অবস্থায় পঠিত দুরুদ পাঠ করা যায়। দরুদ পাঠের পর সুরা মুলক (পবিত্র কোরআনের ২৯ পারা, ৬৭ তম সুরা) পাঠ করতে হবে।[৪০৪]

নসীহত সমূহ

মওলানা নূরুর রহমান তার রচিত 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' (ষষ্ঠ খন্ড) এর ১২-১৫ পাতায় মাওলানা কারামত আলী (র.) এর ১৯ টি নসীহত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তাবারুক হিসাবে কিছু নিম্নে দেয়া হলো-

- নেককারদের সোহবতে থাকা নেক কাজ করার চেয়েও উত্তম। আর পাপাচারীদের সোহবতে থাকা পাপ কাজ করার চেয়ে খারাপ।
- কাফেরের সোহবতের চেয়ে বিদ'আতী লোকের সোহবত বেশি মন্দ।
- দুনিয়া ছায়ার তুল্য আর আখেরাত সূর্যের ন্যায়। ছায়ার দিকে যতই ধাবিত হবে, কখনও ছায়াকে ধরতে পারবে না। কিন্তু সূর্যের দিকে যতই যেতে থাকবে ছায়াও সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

৪০৪. এম ইউ এ কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২-৪৩

- আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যদি কেউ দুনিয়া অবলম্বন করে থাকেন, তা মানুষের উপকারের জন্যই করেছেন।
- আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মুরশেদের উসিলায় হেদায়েত করেন। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে গোমরাহ করেন, সে কোন মুরশেদের সন্ধান পায় না।
- মানুষের নফসের পরিচ্ছন্নতা সাধন এবং নফসের দোষসমূহের সংশোধনই তরীকতের উদ্দেশ্য।
- তরীকতপন্থীর কর্তব্য-দিন ও রাতের মধ্য হতে কুর'আন শরিফ তেলাওয়াতের জন্য একটু সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া।
- হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (র.) আমাকে বলেছেন, 'উত্তম খাদ্য খাইও, উত্তম পোশাক পরিও, উত্তম যানবাহনে আরোহন করিও, এটিই তোমার জন্য রিয়াযত এবং মুজাহাদা। ঈদের দিন সেমাই খাওয়া সমন্ধে আমি হযরত পীর সাহেব কেবলাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মাওলানা পানাহারের মধ্যে বিদআ'ত নাই। ঈদের দিন মিষ্টান্ন খাওয়া সুন্নত। সেমাইও তো মিষ্টান্ন বটে।
- নামায না পড়লে নফস কখনও দুরস্ত হবে না। সে অন্যান্য নেক আমল এবং সদকা খয়রাত যতই করুক না কেন।
- নামায মুমিনের জন্য মে'রাজ, নামাযের দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে পৌছে যায়।[৪০৫]

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) একজন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ ছিলেন। দ্বীন ইসলাম প্রচার, প্রসারে তার অন্যান্য পদক্ষেপ যেমন দৃঢ়চেতা ছিল, তেমনি তার লেখনী, অজিফা এবং নসিহতসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাতির অন্তর কলুষমুক্ত করার ক্ষেত্রে এক অনন্য মহৌষধ হিসাবে কাজ করবে। তার প্রণীত বইয়ের বিষয়বস্তুর পূর্ণ অনুসরণ, অজিফা পাঠ এবং নসিহত প্রতিপালনের মাধ্যমে যেকোন মুসলিম ব্যক্তি ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৪০৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪-৪৫

উপসংহার

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ছিলেন ভিন্নতর উচ্চতার অনন্য জীবনের অধিকারী এক মহান পুরুষ। বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচার ও হিদায়াতে তিনি তার সম্পূর্ন জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি ছিলেন তার কালে অন্যতম সংস্কারক। বাংলায় মুসলমানগণ যখন নানা কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অন্ধকারে নিপতিত, তখন তার আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি এসেছিলেন মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে এতদঞ্চলের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ এক নিয়ামত হিসেবে। মানুষকে তিনি আলোকের পথে ডেকেছেন। প্রেরণা যুগিয়েছেন ইহ-পারলৌকিক মুক্তির পথে চলতে। এমন একটি সময়ে তার এদেশে আগমন, যখন এখানকার মুসলমানগণ অধ:পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। দেখতে দেখতে কালক্রমে এমন একটা সময় এল যে, শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে পড়তে পড়তে মুসলিমগণ নিজেদের স্বকীয়তা, মর্যাদা এবং আভিজাত্য সকল কিছুই বিস্মৃত হতে থাকে। এমনকি গ্রাম-গঞ্জের মুসলমানগণ তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকেও ভুলে যেতে থাকে। ভুলে যেতে থাকে ইসলামী শরীয়ত ও জীবন বিধান। তাদের আচার-আচরণে এসে যায় হিন্দুয়ানী প্রথা। চাল-চলন ও পোশাক-পরিচ্ছদে আসে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক এবং ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বাংলার মুসলমানরা এভাবেই পিছিয়ে পড়েছিল।

এ সময় অনেক ভণ্ড পীরের উদ্ভবও তাদের বিপথগামী করে। তারা ইসলামের মূল বিষয় তথা কুরআন হাদিসের আলোকে উদ্ভাবিত শরীয়ত ভুলে গিয়ে নানা কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে। অনেক মসজিদে আযান বন্ধ হয়ে যায়। নিয়মিত পাচ ওয়াক্ত নামায ও রোযার কথাও ভুলে যান অনেকে। গ্রাম-লোকালয়ে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি মুসলমানদের জীবন-যাত্রায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমান পুরুষেরা শুরু করেছিলেন হিন্দুদের ধুতি ও নেংটি পরা। গ্রাম-বাংলায় হিন্দুদের পূজা-পার্বণে অনেক মুসলমান ঘরেও দেখা যেত উৎসব।

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও হিদায়েত কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলার গ্রামে গ্রামে। মুসলমানদের ফিরিয়ে এনেছেন সঠিক পথে। এ দেশের মসজিদে মসজিদে শুরু হয়েছিল আবার আযান। রোযা-নামায ও শরীয়ত মোতাবেক শুরু হয়েছিল মুসলমানদের জীবন যাপন। নেংটি-ধুতির বদলে আবার চালু হয়েছিল ইসলামী পোশাক। শুরু হয়েছিল সর্বত্র ঈদ এবং জুম'আর নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত আমল। তৎকালীন সময় এভাবে বাংলায় ইসলামের এই পুনর্জাগরণে যেসব পীর, মাশায়েখ অলি-আউলিয়াগণ ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)। মুসলিমদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে, তাদেরকে ইসলামী আদর্শ ও নিয়ম নীতির বাস্তবভিত্তিক দিশা দিতে তিনি একাধিক পন্থায় কাজ করার সংকল্প করেন। এর জন্য তিনি শুরু করেছিলেন দুই পদ্ধতির সংগ্রাম। প্রথমত: তিনি বঙ্গ ও আসামের গ্রামে গ্রামে গিয়ে ইসলামের প্রচার কাজ চালাতে থাকেন। তিনি তার যুক্তি ও ব্যাখ্যা দ্বারা মুসলিমদের ভুল-ভ্রান্তি দূর করার উদ্যোগ নেন। দ্বিতীয়ত: তিনি মুসলিমদের কুসংস্কার নির্মূলে এবং তাদেরকে ইসলামের সঠিক পথে নিয়ে আসতে রচনা করেছিলেন প্রায় অর্ধ শত ইসলামী গ্রন্থ। যেগুলো মুসলমানদের সেই দুরবস্থা থেকে উত্তরণে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।

বঙ্গ ও আসামে ইসলামের তাবলীগ তথা প্রচার ও প্রসারে বিখ্যাত পীর মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তার জবান ও কলম দ্বারা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, এ দেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তা এক স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে পরিগণিত। বিশেষত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে সফর করেন এবং শিরক-বিদআত প্রভৃতি অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার হাতে দলে দলে লোক বাই'য়াত হয়ে সঠিক পথের অনুসরণ করতে থাকেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সংস্কারের কাজ করেছেন সবার মাঝে। দীর্ঘ দুশো বছরের ব্রিটিশ দুঃশাসনের নাগপাশ ছিন্ন করার দাবিতে সোচ্চার হওয়ার অপরাধে নানাভাবে

নিগৃহীত, নিষ্পেষিত ও পিছিয়ে পড়া এতদঞ্চলের ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলিমদের বস্ত্র পরিধান করা পর্যন্ত তিনি শিখিয়েছেন। মুসলিমরা নিজেদের ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নির্দেশনা ভুলে গিয়ে অন্য জাতির অনুকরণে ভিন্ন ধর্মের বিশেষ পোশাক আশাক পরিধান করতে পর্যন্ত ইতস্তত করত না। এসবের অপনোদনে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও। সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে নগরে নগরে, গঞ্জে গঞ্জে তিনি অসংখ্য মাদ্রাসা-মসজিদ এবং শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

আসলে সব দিক বিচারে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে একটা সর্বাত্বক ইসলামী সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই সংস্কার ও বিপ্লবের দায়িত্বই পালন করেছিলেন মাওলানা কারামত আলী (র.)। মানুষ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছিল। তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তিনি শুধু আধ্যাত্বিক পুরুষই ছিলেন না। ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতা, যার নেতৃত্বে এদেশের মুসলমানদের সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে একটি যুগ সন্ধিক্ষণে ইসলাম ও মানবতার ঝান্ডা হাতে নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন, গোটা মুসলিম সমাজের নিকট তিনি একটি মহান প্রতিষ্ঠান। তার মহৎ কর্মজীবন চিরকালই প্রতিটি মুসলিমের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরনীয়। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার এবং ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণে এ মহান মনীষীর অসামান্য অবদান আমি বিভিন্ন উৎস থেকে যথাসাধ্য আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যেটুকু অংশ তুলে আনতে পেরেছি, তার জন্য আমি আমার রব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কেননা তিনিই আমার মত অধম বান্দাকে এ কাজটি করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। আশা করি এ মহান ব্যক্তির জীবনী ও কর্ম সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ সহজেই জানতে পারবে। তার মত, পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারবে। উনার ব্যক্তিত্ব, সৌজন্যতা, বদান্যতা, দয়া-দানশীলতা, পরোপকারিতা, ধৈর্য, ত্যাগ-তিতীক্ষার গল্পগুলো একেবারেই অজানা ছিল। আমার এ গবেষণার মাধ্যমে তার জীবনীর সেসব দিকগুলো কিছুটা হলেও উন্মোচিত হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলিম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলি এবং মহৎ কর্মগুলোর অনুসরণ করে ইসলাম ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে এক অনন্য উচ্চতায় পৌছাবে সে কামনা রাখি। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের সকল সীমাবদ্ধতা এবং ভুলত্রুটির জন্য আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। আল-কুর'আনুল কারীম
২। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিযবাহ আল-বুখারী (র.), সহিহ আল-বুখারী, অনু. হুসাইন ইবন সোহরাব (ঢাকা : আল-মাদানী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০১১ খ্রি.)
৩। আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুরাইশী আন-নিশাপুরী, সহিহ মুসলিম, অনু. আ.স.ম নূরুজ্জামান (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-জানুয়ারী-২০১১ খ্রি.)
৪। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খ্রি.)
৫। আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস সাজিস্তানী, সুনান আবু দাউদ, অনুবাদঃ ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রি.)
৬। ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ, সুনান আন-নাসাঈ, অনুবাদঃ আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রি.)
৭। আবু আব্দুল্লাহ ইবন মাজা, সুনান ইবন মাজা, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.)
৮। শায়খ অলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-খতীব (র.), মিশকাতুল মাসাবীহ, অনু.মুহাম্মদ হাদিসুর রহমান (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল : ২০০৬খ্রি.)
৯। মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন্-নববী (র.), রিয়াদুস সালিহীন, অনু. হুসাইন ইবন সোহরাব (ঢাকা : আল-মাদানী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১১ খ্রি.)
১০। আবুল ফিদা হাফিয ইমামুদ্দিন ইবন কাসীর, তাফসির ইবন কাসীর, অনু. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকা : আল মাদানী প্রকাশনী, দ্বাদশ মুদ্রণঃ ২০১২ খ্রি.)
১১। আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, অনু-মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৯ খ্রি.)
১২। ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলিম ও স্বাধীনতা আন্দোলন (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ১৯৯৩ খ্রি.)
১৩। বাংলা পিডিয়া (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকালঃ মার্চ-২০০৩ খ্রি.)
১৪। ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৪ খ্রি.)
১৫। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান,আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকাঃরিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.)
১৬। ড. আব্দুল খালিক, আহাম্মিয়াতুদ-দা'ওয়াত ওয়াত তাবলিগ ফিল ইসলাম (কায়রো : মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৩ খ্রি.)
১৭। ইসলামি বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকালঃ জুন-১৯৯৭ খ্রি.)
১৮। শায়খুল হাদিস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রঃ), আর-রাহীকুল মাখতুম (ঢাকা : তাওহিদ পাবলিকেশন্স, চতুর্থ প্রকাশ-২০১৩ খ্রি.)
১৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, রাসূলুল্লাহর (স.) শিক্ষাদান পদ্ধতি (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ মে-২০১১ খ্রি.)
২০। সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ, আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র (ঢাকা : পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল আগস্ট-২০০৯ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

২১। ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ত্রয়োদশ প্রকাশ-২০০৯ খ্রি.)
২২। মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা: ইয়াহইয়া, দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান (ঢাকা : আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, চতুর্থ প্রকাশ ২০১১ খ্রি.)
২৩। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলা ও বাঙ্গালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা (বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্রগ্রাম-ঢাকা, জুলাই-২০০৬ খ্রি.)
২৪। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা (ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই-২০০৮ খ্রি.)
২৫। আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০২ খ্রি.)
২৬। এ. কে. এম. আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, চতুর্থ মুদ্রণ: জুন ১৯৯০ খ্রি.)
২৭। আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলিমদের ইতিহাস (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৫ খ্রি.)
২৮। মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক খাঁ, সিপাহী বিদ্রোহ ও চিত্রের অপর দিক (১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪ হতে মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, দিলওয়ার হোসেন কর্তৃক সংগ্রহ ও সম্পাদনা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রি.)
২৯। ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ইসলামি দাওয়াহ ও তাবলিগ জামায়াত প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-জানুয়ারী-২০০৬ খ্রি.)
৩০। মুহিবুর রহমান লিটন, বাংলাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য (ঢাকা : মাসুম বুক ডিপো, প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রি.)
৩১। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলিম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল-জুলাই ১৯৯৭ খ্রি.)
৩২। ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলিমদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০০৫ খ্রি.)
৩৩। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), আহকামে তাবলিগ, অনু-মুফতি মুহাম্মদ নূরুয্যামান (ঢাকা : হক লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ-২০০৫ খ্রি.)
৩৪। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, সুন্নাত ও বিদয়াত (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, সপ্তম প্রকাশ-১৯৯৭ খ্রি.)
৩৫। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, অনু-মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০১০ খ্রি.)
৩৬। শাহ ইসমাঈল শহিদ, তাকবিয়াতুল ঈমান, অনু-মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০০২ খ্রি.)
৩৭। ডা. মরিচ বুকাইলি, বাইবেল কুর'আন ও বিজ্ঞান, অনু-ওসমান গনি (ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৪ খ্রি.)
৩৮। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৩৯। সম্পাদনা পরিষদ, আল-কুর'আনুল করিম বাংলা তরজমা (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০১৪ খ্রি)
৪০। ইমাম আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান লিল-বায়হাকী (দেওবন্দ : আল্-মাকতাবাতুর রহিমিয়া, ১৩৮০ হি.)
৪১। আব্দুল গাফফার হাসান নদভী, এন্তেখাবে হাদিস, অনুবাদ-আব্দুস শহিদ নাসিম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.)
৪২। মৌঃ মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, মারেফাতের ভেদতত্ত্ব (ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। আল্লামা আলাহ ইয়ার খান, ইসলামি তাসাউফের স্বরূপ, অনু-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা : সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ২০০২ খ্রি.)
৪৪। এম.এ.বাকি, উপমহাদেশে কাওমী মাদরাসা (কলকাতা : হেলমান্দ প্রকাশনী, ৫৬, মানিক তলা, ১৯৬৯ খ্রি.)
৪৫। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম, অনু-ড.রশীদুল আলম (কলিকাতা : মলিক ব্রাদার্স, ১৯৯১ খ্রি.)
৪৬। সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.)
৪৭। সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামি বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.)
৪৮। সংকলক, আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.)
৪৯। গাওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী সাহেব (র.), সিররুল আসরার, অনু-মাওলানা আবদুল জলিল (র.) (ঢাকা : হক লাইব্রেরী, ১৯৮৬খ্রি.)
৫০। সাযয়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী, তাযকিয়া ওয়া ইহসান, অনু-মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.)
৫১। ড. আ. ন. ম রইছ উদ্দিন, সূফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় (ঢাকা : ২০০১খ্রি.)
৫২। মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (ঢাকা : আজাদ অফিস, ১৯৬৫খ্রি.)
৫৩। আব্দুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮খ্রি.)
৫৪। আনিসুজ্জামান (সম্পা.), বাংলার ধর্মজীবন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭খ্রি. খ.১)
৫৫। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৪০২বাংলা)
৫৬। ড. এম. আব্দুলাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রি.)
৫৭। ড. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি. প্রথম খন্ড)
৫৮। ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩খ্রি.), ২য় এবং ৩য় খন্ড
৫৯। মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী,পবিত্র কুর'আনুল করিম, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (মদিনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)
৫৯। সাইয়েদ কুতুব শহিদ, তাফসির ফী যিলালিল কুর'আন, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ (লান্ডন : আল-কুর'আন একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.)
৬০। সম্পাদনা পরিষদ: আল-কুর'আনুল করিম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.)
৬১। আব্দুল মান্নান তালিব, ইসলামি জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি.)
৬২। খান মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, মহানবি (স.) এর সীরাত কোষ (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি.)
৬৩। অধ্যাপক মফিজুর রহমান, কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসূল (স.) (চট্টগ্রাম : মদিনা একাডেমী,২০০৪ খ্রি.)
৬৪। নঈম সিদ্দিকী, মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.)
৬৫। আব্দুল হক ফরিদী, আ.ফ.ম. সম্পা, বিস্তারিত ইসলামি বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.)
৬৬। মাওলানা নূরুর রহমান, তাজকিরাতুল আউলিয়া (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৯২ খ্রি.)
৬৭। আ. ক. ম. আলীম, ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস (ঢাকা : হোসাইনিয়া কুতুবখানা, ১৯৮১ খ্রি.)

৬৮। মহিউদ্দীন খান, দরবারে আউলিয়া (ঢাকা : নেসারিয়া কুতুবখানা, ২০০৮ খ্রি.)
৬৯। আল্লামা ইব্রাহীম হোসেন তর্কবাগীশ, উত্তর বাংলার আউলিয়া প্রসঙ্গ (রংপুর : মুহাম্মদী কুর'আন মহল, ২০০১) খ্রি.
৭০। এম. ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ (ফেনী : মুজাদ্দিদে আলফে সানী লাইব্রেরি, ১৯৬৯ খ্রি.)
৭১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামার ভূমিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.)
৭২। ড. এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব (ঢাকা : আফতাবিয়া খানকাহ শরিফ, ১৪২০ হি.)
৭৩। খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামি আকিদা (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.)
৭৪। খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়েত (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.)
৭৫। এ. কে. এম. নাজির আহমদ, আল্লাহর দিকে আহবান (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.)
৭৬। জুলফিকার আলী কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ (কলকাতা : মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরি, ২০০৬ খ্রি.)
৭৭। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ (চট্টগ্রাম : মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা, ১৩৯২ বাংলা)
৭৮। ইবন বতুতা, আজায়েবুল আসফার, অনুবাদঃ খান বাহাদুর হোসাইন এম.এ (দিল্লী : সুলতানিয়া কুতুবখানা, ১৯১৩ খ্রি.)
৭৯। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, ২য় খন্ড (কলকাতা : ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ১৩৭৩ বাংলা)
৮০। গোলাম আহমদ মোর্তাজা, ইতিহাসের ইতিহাস (ভারত : বিশ্ব-বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৭৮ খ্রি.)
৮১। খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.)
৮২। আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.)
৮৩। ড. আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম (চট্টগ্রাম : মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা, ১৯৮০ খ্রি.)
৮৪। ড. এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (কলকাতা : আশরাফিয়া লাইব্রেরি, ১৯৭৫ খ্রি.)
৮৫। ড. আব্দুল করিম ও ড. এনামুল হক, আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য (কলকাতা : ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ১৯৭৮ খ্রি.)
৮৬। আ. ন. ম. বজলুর রহমান, পাকিস্তানের সূফি সাধক (কলকাতা : আশরাফিয়া লাইব্রেরি, ১৯৮৮ খ্রি.)
৮৭। চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো (বশিরঘাট : আল্লাহর ওয়ালা লাইব্রেরি, ১৯৭১ খ্রি.)
৮৮। ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ (ঢাকা : ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৬৩ খ্রি.)
৮৯। আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ খ্রি.)
৯০। খোন্দকার ফজলে রাব্বী, বাংলার মুসলিম (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬ মুদ্রণ)
৯১। আকবর আলি খান, বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঐতিহাসিক প্রশ্নসমূহের পুনর্বিবেচনা, জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাক, গুণীজন বক্তৃতা, ঢাকা, ২৮ জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৩
92. The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic World, New York Oxford, Oxford University Press-1995
93. J. Milton Cowan, A Dictionary of Modern Written Arabic, Third Printing-1974
94. JN Sarkar, Islam in Bengal, Calcutta, 1972

95. A Karim, Social History of the Muslims in Bengal, 2nd edition, Chittagong, 1985
96. M Titus, Indian Islam, London, 1930
97. Richard M Eaton,The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, OUP, 1994
98. James Wise, The Muhammadans of Eastern Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 63, 1894, pp. 28-63
99. Abdul Momin Chowdhury, Conversion to Islam in Bengal: An Exploration, Islam in Bangladesh (ed. Rafiuddin Ahmad), Dhaka 1983
100. M Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, vol. I, Karachi, 1963
101. Asim Ray, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, 1983
102. Akbar Ali Khan, Discovery of Bangladesh: An Explorations i.o the Dynamics of a Hidden nation, 1997.
103. Dr.muhammad Mohor Ali: History of the Muslims of Bangal, (Riyadh, Ibn Soud Islamic University, 1985)
104. Sir Zadhunath Sarkar, History of Bengal, Kalkatta, 1972
105. D. Enamul Haque, History of Sufism in Bengal, 1955